ফুটবলের কাঞ্চনজঙ্ঘা

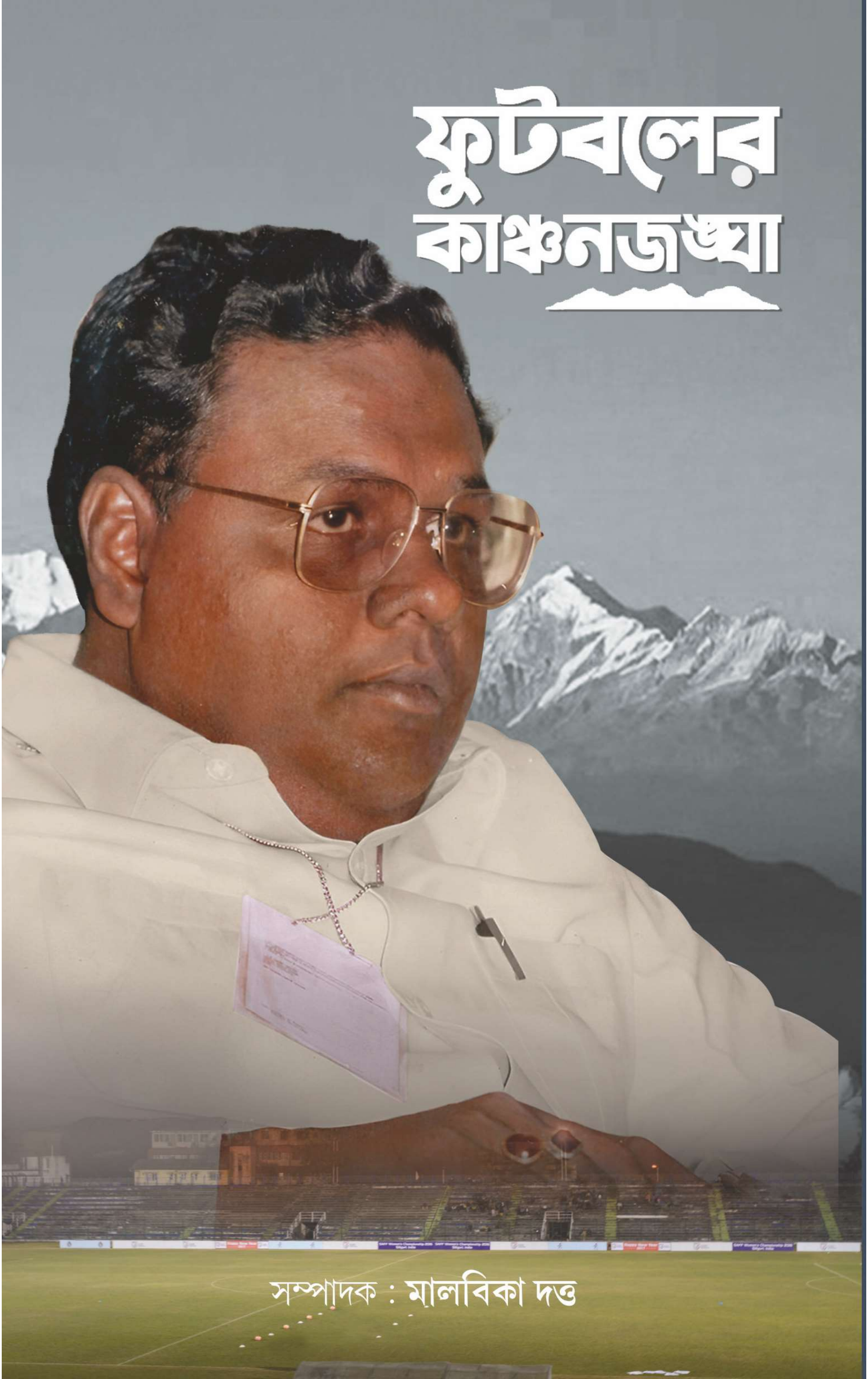

সম্পাদক : মালবিকা দত্ত

ফুটবলের কাঞ্চনজঙ্ঘা

সম্পাদক

মালবিকা দত্ত

প্রকাশক

অনির্বাণ দত্ত ও অনিন্দ্য দত্ত

ফুটবলের কাঞ্চনজঙ্ঘা
প্রদ্যুত দত্তর স্মৃতির উদ্দেশ্যে
সম্পাদনায় : মালবিকা দত্ত

গ্রন্থস্বত্ব : মালবিকা দত্ত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশক : অনির্বাণ দত্ত ও অনিন্দ্য দত্ত

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : বিপ্লব দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : সৌমিক চ্যাটার্জী

অলঙ্করণ : শান্তনু ব্যানার্জী

কৃতজ্ঞতা : সন্দীপ দে, নীলাদ্রী নাথ চক্রবর্তী, অলকেশ কুণ্ডু

অক্ষর বিন্যাস : অরুণ মজুমদার - ৯১৪৩১৬৯৩৬৮

মুদ্রণ: বিশাখা আর্ট প্রেস
২০/এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রয়াত প্রদ্যুত দত্তর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

স্মরণে

প্রদ্যুত দত্ত

জন্ম: ১৮ জুন, ১৯৪০

মৃত্যু: ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৪

সূচিপত্র

বর্ণময় জীবন	মালবিকা দত্ত	৯
এবং প্রদ্যুতদা	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
প্রদ্যুতবাবুই প্রথম বাংলা দলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন	পদ্মশ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
মেরুদণ্ড ছিল	অশোক দাশগুপ্ত	১৭
পথপ্রদর্শক	রূপক সাহা	২০
দুষ্টুমিটা পরিণত বয়সেও বদলায়নি	অর্চনা বোস	২৫
ছোড়দা	তাপসী গুহ	২৭
টেবল টেনিসে কেউ হারাতে পারত না	লীনা গুহ	৩১
ছোটকাকা	সুব্রত দত্ত	৩৩
কালজয়ী	অনির্বান দত্ত	৩৬
কর্মযোগী	অনিন্দ্য দত্ত	৩৮
জর্জ টেলিগ্রাফের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ছোট কাকা	গোরা দত্ত	৪০
জর্জ জিতলে রোল খাওয়াতেন	অতীন দত্ত	৪২
মুশকিল আসান	সুব্রত পাল	৪৩
দুঃসাহসী এক প্রশাসক	সৌগত রায়	৫৮
অনেকের থেকেই ব্যতিক্রম	পূর্ণেন্দু বসু	৬১
অনির্বাণ শিখা	রমলা চক্রবর্তী	৬৩
ভারতীয় ফুটবলে দরকার ছিল	তাপস রায়	৬৭
সবার আগে ছিল আই এফ এ-র সম্মান	ডঃ নীলিমেশ রায়চৌধুরী	৬৯
ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেন	সুভাষ ভৌমিক	৭১
কোচিং জীবনে প্রথম সাফল্য তাঁর জন্যই	শ্যাম থাপা	৭৩
আমাকে স্নেহ করতেন, তবু তাঁকে ভয় পেতাম	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	৭৫
হাল ধরবেন কে?	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
অসম্ভব কথাটা অভিধানে লেখা ছিল না	গৌতম সরকার	৮২
আইএফএ'র সেরা সচিব	সুব্রত ভট্টাচার্য	৮৫
টার্নিং পয়েন্ট জর্জ টেলিগ্রাফ	সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়	৮৮
স্নেহ করতেন, আবার শাসনও করতেন	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০
একবারই প্রদ্যুতদার কথা শুনিনি	শিশির ঘোষ	৯২
পিতৃতুল্য	মহম্মদ মুকিম	৯৬

ফুটবলাররা সমীহ করতেন	প্রদীপ দত্ত	৯৮
সাহসী প্রদ্যুতদা	স্বপনসাধন বোস (টুটু)	১০০
প্রদ্যুতদা নেই ভাবতেই পারি না	বলরাম চৌধুরী	১০৩
অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেননি	প্রদীপ বসু	১০৬
স্বপ্নবিলাসী ছিলেন	মানস চক্রবর্তী	১১১
আপসহীন	জয়ন্ত চক্রবর্তী	১১৬
প্রদ্যুত দত্ত-র মতো দাপুটে প্রশাসক আর পাবে না	রাতুল ঘোষ	১১৯
শিলিগুড়ির স্টেডিয়ামের নাম হোক ‘প্রদ্যুত দত্ত ক্রীড়াঙ্গন’	প্রদীপ নাগ	১২২
রেফারিরা ভরসা পেতেন	চিত্তদাস মজুমদার	১২৫
শূন্যতা আজও পূরণ হয়নি	দেবু মুখার্জি	১২৭
প্রদ্যুত পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক দত্ত	জি সি দাস	১৩০
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে প্রদ্যুতদা	অলোক মুখোপাধ্যায়	১৩৩
প্রতিদান দিতে পারিনি	বিপ্লব মজুমদার	১৩৫
আন্তরিকতায় কোনও ফাঁক ছিল না	জগদীশ ঘোষ	১৩৮
এক পায়ের খেলোয়াড়	অরূপ বসু	১৪১
যথার্থই একজন টিমম্যান	শতদল গুপ্ত	১৪৯
বদলে গেল শিলিগুড়ি	বিশ্বজিৎ দাস	১৫১
নেপথ্যের নায়ক	পরিতোষ ভৌমিক	১৫৩
রাজীব গান্ধি কাল হয়েছিলেন এআইএফ সচিব হওয়ার পথে	পার্থসারথি ঘোষ	১৫৬
চিৎকার শুনে বউদি ছুটে এসেছিলেন	আলোকেশ কুন্ডু	১৫৯
বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম	দেবব্রত সরকার (নীতু)	১৬১
প্রদ্যুতদার কাছে আমি কৃতজ্ঞ	সুনীল মুখোপাধ্যায়	১৬৩
আস্থা অর্জন করেছিলাম	দিলীপ নারায়ণ সাহা	১৬৫
স্বল্প জীবন, উজ্জ্বল নক্ষত্র	হারাধন চট্টোপাধ্যায়	১৬৭
প্রদ্যুতদার জন্যই আইএফএ আসা শুরু করেছিলাম	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
তিন প্রধানকে ‘তেল’ দিয়ে আই এফ এ-র সচিব থাকতে চাননি প্রদ্যুতদা	সরোজ চক্রবর্তী	১৭৪
তাঁর হাত ধরে জর্জ টেলিগ্রাফ ঘুরে দাঁড়াল		১৭৬
কেমন দিলাম	বিপ্লব দাশগুপ্ত	১৮০
প্রথমা (প্রদ্যুত দত্তর রচিত কবিতা)		১৯১-২৩৪

বর্ণময় জীবন

মালবিকা দত্ত (সহধর্মিণী)

১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি আমাদের বিয়ে হয়েছিল। যাদবপুরে বাপের বাড়িতে আমরা সদস্য ছিলাম চার জন। বাবা, মা, দিদি এবং আমি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বউ হিসাবে এলাম সম্ভ্রান্তশালী দত্ত পরিবারে। প্রথমেই জানিয়ে রাখছি এখানে একান্নবর্তী পরিবারে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। শাশুড়ি মাতা এবং দাদা বউদিদের স্নেহভাজন হতে পেরেছিলাম।

প্রদ্যুত দত্তরা পাঁচ ভাই এবং সাত বোন। বাবা হরিপদ দত্ত এবং মা শান্তিলতা দেবী। প্রদ্যুত ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট। কিন্তু সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন সবার আগে। ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৩-র আশেপাশে। এককথায় অকালপ্রয়াণ। আমাদের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র অনির্বাণের (জয়) বয়স তখন মাত্র সাড়ে ১৬, কনিষ্ঠ অনিন্দ্য (জিৎ) মাত্র ৯ বছর। এরকম একটা গভীর সঙ্কটের মধ্যে চার দাদা, দিদি, বউদি, বোনেরা আমাদের পাশে থেকেছেন। তাঁদের সহযোগিতায় অতবড় সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম বলে আজ প্রদ্যুত দত্ত সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি।

আমাদের দাম্পত্যজীবন মাত্র সাড়ে ১৯ বছরের। সেই নিরিখে বলতে পারি তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী। আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ একেবারেই হত না। আমাকে এতটাই বিশ্বাস করতেন যে, সাংসারিক দায়দায়িত্ব সবকিছু আমার উপরেই ছেড়ে রেখেছিলেন।

যখন সহধর্মিণী হিসাবে এই বাড়িতে এলাম তখন তিনি ছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের সচিব। ভবানীপুরে ৩১-এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের বিশাল বাড়িতে নীচের তলার একটা ঘর ছিল মিনি জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব। সবসময়ই ফুটবলারদের জমায়েত সেখানে লেগেই থাকত। অনেক সময়ে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত। অনেক সময়ে নিজের হাতে রান্না করে ফুটবলারদের খাওয়াতেন।

বাড়িতে ফুটবলারদের সমাগম আমার খুবই ভালো লাগত। কারণ ছোটবেলা থেকে কলেজ জীবন পর্যন্ত আমিও খেলাধুলো করতাম। কলেজ-জীবনে বেশ কয়েকবার অ্যাথলেটিক্সে প্রাইজও পেয়েছি। তবে খেলার ব্যাপারে খুব বেশি সময় দিতে পারিনি। বাবা খুব কঠোর ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধের আগে ঘরে ঢুকতে হত।

আমার স্বামী ছিলেন যথার্থই একজন 'ফ্যামিলি ম্যান'। বাইরের জগতের হরেক-রকম ঝক্কি-ঝামেলা সামলে সন্ধ্যায় ঘরে ঢোকার পরই থাকতেন ফুরফুরে মেজাজে। বাড়িতে সবসময়ই একটা আনন্দের পরিবেশ বজায় থাকত। গান-বাজনা হই-হুল্লোড়ে মেতে থাকত গোটা বাড়ি। সংগীত প্রিয় ছিলেন। নিজে গান গাইতেন, গান, কবিতা, ছড়া লিখতেন। সেই সঙ্গে তবলা, খোল বাজাতে পারতেন। তবলার হাতটা তো খুব ভালোই ছিল। একবার একটা অনুষ্ঠানে তবলা বাজিয়েছিলেন। আমারও গান বাজনার প্রতি অনুরাগ বরাবরই। সংগীত চর্চার জন্য আমাকে একটা সিন্থেসাইজার কিনে দিয়েছিলেন। সময় পেলেই এল পি রেকর্ডপ্লেয়ারে গান শুনতেন। তাঁর প্রিয় সংগীতশিল্পী ছিলেন নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দুজনেরই লতা মঙ্গেশ্বর, মহম্মদ রফি, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান শুনতে ভালো লাগত। তাঁদের মধ্যে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'একটা গান লিখো আমার জন্য' তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। খুব 'মুডে' থাকলে জিৎকে পাশে বসিয়ে উচ্চস্বরে গাইতেন সেই বিখ্যাত গান— 'বোম্বাইসে আয়া মেরা দোস্ত, দোস্তকো সেলাম করো।' খুবই আমুদে ছিলেন। তাই ছোট কাকা বা ছোট মামা হিসাবে সবারই মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

বোন, ভগ্নিপতিদের নিয়ে আনন্দে মেতে থাকতে ভালোবাসতেন। মাঝেমধ্যে আমরা সপরিবারে বেরিয়ে পড়তাম। যেমন ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ দেখতে গিয়েছিলাম। বোন, ভগ্নিপতির সঙ্গে জয়-জিৎ এবং আমিও সেই দলে ছিলাম। পুজোর সময়েও বেরিয়ে পড়তাম। সারা বছরের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে একটু বিশ্রাম পেতেন তখন। তবে তাঁর পছন্দের জায়গা ছিল শিমুলতলা।

ফুটবলারদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তবে মাঝেমধ্যে তারা কোনও ভুল করলে ধমক দিতেন। আবার পরক্ষণেই ঘরে ডেকে খাওয়াতেন। এই ব্যাপারে আমিও অনেক সময় ওদের ঘরে ডেকে নিয়েছি। বাড়িতে অবাধ বিচরণ ছিল ফুটবলারদের। সেই সূত্রে আমিও কখন যেন ময়দানের প্রিয় বউদি হয়ে গিয়েছিলাম।

ভোজন রসিক ছিলেন। নিজে যেমন খেতে ভালোবাসতেন সেরকম খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। মাছের মধ্যে তাঁর খুব প্রিয় ছিল ইলিশ মাছ ও চিতল মাছের মুইঠ্যা। নিজে রান্না করতেন। আমাকে অনেক সময় সহযোগিতা করেছেন। রান্নার হাতটাও ছিল দারুণ।

তাঁর মস্ত বড় গুণ ছিল যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারতেন। ভবানীপুরের বাড়ি সংস্কারের সময় বিশাল অট্টালিকা ছেড়ে আমরা বেশ কয়েকটা বছর ভাড়া বাড়িতে থেকেছি। প্রথমে বিবেকানন্দ পার্কে কমলা গার্লস স্কুলের পাশে। পরবর্তীতে যোধপুর পার্কে, পূর্ণদাস রোড এবং অপূর্ব মিত্র রোডে। অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হলেও তিনি মানিয়ে নিয়েছিলেন।

অনেকেই ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন। তাতে তিনি কখনও বিরক্ত হতেন না। সবার সঙ্গেই কথা বলতেন। পাশে দাঁড়াতেন। আসলে তিনি সবাইকে নিয়ে চলতে সক্ষম ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে। বিশেষ করে জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রক্তচক্ষু, শাসানি অনেক কিছুর মোকাবিলা করে মাথা উঁচু করে চলেছেন। তাঁকে কখনও বিচলিত হতে দেখিনি। বলতেন সব মিটে যাবে। এতটাই আত্মবিশ্বাস ছিল সেই সময়েও।

জীবনে একদিনই তাঁকে বিচলিত হতে দেখেছিলাম। সেদিন পুত্র জয় যখন সাইকেল চালিয়ে আসছিল তখন একটা প্রাইভেট গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল। খবরটা কানে আসতেই ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। আমি তখনই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলাম। দেখলাম তেমন কোনও আঘাত লাগেনি। ঘরে ফিরে খবরটা দেওয়ার পর স্বস্তি বোধ করেছিলেন। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে বিশাল দুর্ঘটনার তিক্ত স্মৃতি সবসময়ই তাঁকে যন্ত্রণা দিত।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন ছোট ভগ্নিপতি বিজিত গুহ। বিজিতদার অকালপ্রয়াণে খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন। আর ছায়াসঙ্গী ছিল আমার ভাগ্নে দীপু (সুব্রত পাল)। আমার দিদির জ্যেষ্ঠ পুত্র দীপু সবসময়ই তাঁর সঙ্গে থাকত। দীপুকে বিশ্বাস করতেন। এই দীপুও কয়েকদিন আগে অকালে হারিয়ে গেল। দীপুর আঘাতটা অবশ্য তাঁকে দেখতে হয়নি।

ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ রাম ঠাকুরের দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন।

আর একজনের কথা না বললে আমার লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। মমতাও শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। দু-জনের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল একেবারে ভাই-বোনের মতো। মমতা সময় পেলেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। যখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল তখন মমতা তাঁর এম পি কোয়ার্টারের বেশ কয়েকটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

অকালেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। তবে যে ক-বছর থেকেছেন, খেলার পাশাপাশি, গান-বাজনা, হাসি ঠাট্টা, মজা, হই-হুল্লোড়েই জীবনটা উপভোগ করেছেন। সবমিলিয়ে বর্ণময়, ব্যতিক্রমী একজন মানুষ। তাঁর সহধর্মিণী হিসাবে আমি সবসময়ই গর্ববোধ করি।

এবং প্রদ্যুতদা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

"Our life is but a winter's day:
Some only breakfast and away;
Others to dinner stay and are full fed;
The oldest man but sups and goes to bed;
He that goes soonest has the least to pay."

প্রদ্যুতদা চলে গেলেন। আইএফএ'র কর্ণধার প্রদ্যুত দত্ত, আমাদের প্রদ্যুতদা চলে গেলেন 'মরণসাগর পারে'। সবার কাছে তাঁর পরিচয়—তিনি ছিলেন খেলার মাঠের একজন দক্ষ সংগঠক। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন একান্ত আপনার জন; রক্তের সম্পর্কে আমি হয়তো তাঁর নিজের বোন নই, কিন্তু প্রদ্যুতদা ছিলেন আমার কাছে নিজের দাদা, তিনিও আমাকে নিজের বোনের মতোই স্নেহ করতেন। ১৬ নভেম্বর '৯৪-এর সেই অভিশপ্ত রাতটা প্রদ্যুতদাকে যেন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। একটা দুঃসহ আঘাত এসে মনটাকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। অন্তরের অন্তস্থলটা গুমরে উঠল বোবা কান্নায়, ভাষাহীন বেদনায়।

প্রদ্যুতদাকে আমি দেখেছি একজন শক্ত, সবল, দক্ষ মনের মানুষ হিসাবে। তিনি ছিলেন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো বটগাছের মতো। কত মানুষ যে সে ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছেন তার কোনও হিসেব নেই। তিনি কখনও কাউকে ভয় পাননি, লড়াই করতেন শেষ পর্যন্ত। মৃত্যুর সঙ্গেও লড়াই করেছিলেন রীতিমতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এ লড়াইয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন।

যখনই সময় পেতাম, পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও ছুটে যেতাম প্রদ্যুতদার কাছে। বরাবরই একটু বেপরোয়া ছিলেন। কার কার কথায় আমল দিতেন জানি না কিন্তু আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যখন রীতিমতো ধমকের সুরে বলতাম, 'না, এটা ঠিক হচ্ছে না' প্রদ্যুতদা সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, তুমি যা বলছ তাই হবে'।—এতটাই স্নেহ করতেন আমাকে। রবীন্দ্র সরোবরের 'সবুজ বাঁচাও' আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র সরোবরের সবুজ যতদিন থাকবে প্রদ্যুত দত্তও ততদিন থাকবেন মানুষের স্মরণে, মননে।

মাঝেমাঝে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তাম ছুটে যেতাম প্রদ্যুতদার বাড়িতে।

হয়তো তখন তিনি বাড়িতে কোনও মিটিং করছেন। আমি যাওয়া মাত্র খুশি হয়ে বলতেন, 'মিটিং শেষ, সবাই চলে যান, আমি এখন গল্প করব।' গল্পের সঙ্গে স্পেশাল কফির আয়োজন তো থাকতই। আমি অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু প্রদ্যুতদার মতো এত উদার এবং বড় মনের মানুষ খুব কমই দেখেছি। প্রদ্যুতদার অকাল প্রয়াণে ক্রীড়াজগতের তো একটা বড় ক্ষতি হলোই, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে, আত্মিক দিক থেকে কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম।

অনাময় নার্সিংহোমে আমি তখন অসুস্থ হয়ে শয্যাবন্দি। সেদিন রাখি পূর্ণিমা। সকাল ৯টায় নতুন সিল্কের পাঞ্জাবি পরে প্রদ্যুতদা এলেন—প্রথম মানুষ, যিনি সেদিন বোনের কাছে রাখি পরতে ছুটে গিয়েছিলেন নার্সিংহোমে। নার্সিংহোমে শুয়ে শুয়ে প্রায় হাজার লোকের হাতে আমি রাখি বেঁধে দিয়েছি। কিন্তু রাখি পূর্ণিমার দিনটা যতবার ঘুরে ঘুরে আসবে, মনে পড়বে প্রদ্যুতদার কথা, নার্সিংহোমে আমার ঘরের দরজা খুলে যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মমতা, কেমন আছ?'

রাখি পূর্ণিমার দিনেই শেষ দেখা প্রদ্যুতদার সঙ্গে। মানসিক দিক থেকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। 'মন খারাপ কেন'—জিজ্ঞেস করতে, বললেন, 'আইএফএ ছেড়ে দেব, অনেক ঝামেলা, আর ভালো লাগছে না।' অনেক বোঝালাম, ধমকের সুরে বললাম, 'আপনি এত শক্ত মনের মানুষ আর আপনি ভয়ে পালিয়ে যাবেন?' জানতাম প্রদ্যুতদা কাউকে ভয় পেতে শেখেননি। বললেন, 'ঠিক আছে, এখনই কিছু ছাড়ছি না। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো তারপর আলোচনা করা যাবে।' সেদিন প্রায় দেড় ঘন্টা বসেছিলেন আমার ঘরে, একটা অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ার ব্যাপারেও অনেক কথা হল। তখনও জানতাম না প্রদ্যুতদার সঙ্গে এ দেখাই আমার শেষ দেখা!

নার্সিংহোম থেকেই খবর পেলাম প্রদ্যুতদা অসুস্থ হয়ে দিল্লিতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিঠি পাঠালাম—মন ভাঙবেন না, অসুখ মানুষমাত্রেই হয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। উনিও উত্তর পাঠালেন—'আমি সুস্থ হয়ে গেছি, চিন্তা কোরো না।' অনেকটাই সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর শরীরটাকে এত অবহেলা করতে আরম্ভ করলেন যে আর বাঁচানো গেল না।

অনেকে বলেন, মৃত্যুর আগে মানুষ তার প্রিয়জনকে জানিয়ে দিয়ে যান। যে রাত্রে প্রদ্যুতদা চলে গেলেন, ১৬ নভেম্বর, সেদিন সন্ধ্যায় আমার বহরমপুর রওনা হওয়ার কথা। দুপুরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ কেমন যেন একটা তন্দ্রা মতো এসে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি না জানি না, ঘুমের মধ্যেই যেন দেখলাম, প্রদ্যুতদা আমাকে কিছু বলতে চাইছেন। ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হল, তবে কি প্রদ্যুতদা আর নেই? সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম প্রদ্যুতদার বিশেষ বন্ধু আনন্দবাজারের শ্যামল চক্রবর্তীকে। শ্যামলদা আর বউদির সঙ্গে প্রদ্যুতদার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

শ্যামলদা বললেন, 'ভালো নেই। হয়তো বেঁচে যাবেন কিন্তু শরীরের একটা দিক অবশ হয়ে যেতে পারে।' আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, আগে প্রাণটা তো বাঁচুক পরে অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করব। কিন্তু অত শক্ত মনের নির্ভীক একজন মানুষকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না। তাঁর অনেক স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা ছিল—যা আমি জানি। একদিন হয়তো তাঁর সেই স্বপ্ন আমরা সফল করব কিন্তু সেদিন প্রদ্যুতদাকে তো আর পাব না। এ দুঃখ চিরকাল আমাদের বুকে বাজবে।

বহরমপুরে বসেই পেয়েছিলাম সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। ফেরার পথে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকেই সোজা চলে গিয়েছিলাম প্রদ্যুতদার বাড়ি। যেখানে প্রদ্যুতদা শুয়ে আছেন তাঁর অন্তিম শয্যায়, ফুল, মালা আর ধুপের ধোঁয়ায়। প্রদ্যুতদাকে এভাবে তো কোনওদিন দেখতে চাইনি।

সৌজন্য : উপলব্ধি

প্রদ্যুতবাবুই প্রথম বাংলা দলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন

পদ্মশ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

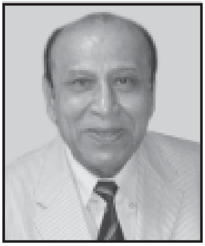

শিয়ালদা কাইজার স্ট্রিটের রেল কোয়ার্টার থেকে বৌবাজার সার্পেনটাইন লেন যেতে হেঁটে বড়জোর ১০ মিনিট লাগে। রেল কোয়ার্টার ছিল আমাদের ঠিকানা। আর সার্পেনটাইন লেন হল প্রদ্যুত দত্ত - বিশ্বনাথ দত্তর বাড়ি। বেশ কয়েকটা বছর প্রদ্যুত দত্তরা সার্পেনটাইন লেনে থেকেছেন। স্বভাবতই আমার নিকট প্রতিবেশী বলতে হবে।

বাংলার ক্রীড়াজগতে বিশেষ করে ফুটবলে জর্জ টেলিগ্রাফ দীর্ঘদিন (৭০ থেকে ৮০ বছর) ধরে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সেই ক্লাবের একটা সময় কর্ণধার ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান, হাঁটাচলা এবং কথাবার্তায় ছিল প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। নিজের হাতে দল গড়তেন। সিনিয়র, জুনিয়র সমন্বয়ে গড়তেন সংগঠিত একটা দল। জুনিয়রদের সঙ্গে রাখতেন তরুণ প্রতিভাবানদের। সিনিয়র বলতে টার্গেট করতেন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের বাতিল ফুটবলারদের। পুরনো দল বাতিল করার জন্য যাদের মধ্যে একটা জবাব দেওয়ার তাগিদ থাকত। সেই পোড়খাওয়াদের সঙ্গে দলে রাখতেন তরুণ প্রতিভাবানদের। এই কম্বিনেশনে তরুণরা উজ্জীবিত হত। সেই দল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিত বড় তিন দলের সামনে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ — এই চারটি বছর জর্জ টেলিগ্রাফ আমাদের ভীষণ বিব্রত করেছে। তারমধ্যে ১৯৭৫ সালে আমি ছিলাম ইস্টবেঙ্গলে। লিগ ম্যাচের প্রথমার্ধে জর্জ টেলিগ্রাফের ফুটবলাররা আমাদের ভারতখ্যাত রক্ষণভাগকে নাকানিচোবানি খাইয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য আমরা তিন গোলে জিতেছিলাম।

সেদিন আমার বড় মেয়ে পলা গুরুতর অসুস্থ ছিল। ভেবেছিলাম খেলা শুরু হওয়ার পর গোল পেলেই চলে আসব। কিন্তু জর্জের আক্রমণের চাপ এতটাই প্রবল ছিল যেজন্য মাঠে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর মোহনবাগানে তো তিনবার জর্জের প্রবল বাধার সামনে পড়েছিলাম। ১৯৭৬-এর লিগে দীর্ঘ ৬ বছর বাদে যখন মোহনবাগান লিগ জিততে যাচ্ছে সেই সময় শেষ দিকে জর্জের বিপক্ষে গোল করতে সুভাষ, আকবর, হাবিবের কালঘাম ছুটেছিল। একইভাবে ওরা চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছিল আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে। ১৯৭৮ সালে সব ম্যাচ জিতে

কলকাতা লিগ খেতাবের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ।

এতগুলো তথ্য তুলে ধরার কারণ হল এই দলটাকে গঠন করেছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। যে কোনও দলেরই সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সেই দলের ফুটবলারদের। দলটাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা থাকে দলের প্রশিক্ষকের। কিন্তু এক্ষেত্রে আসল কৃতিত্ব হল ক্লাব কর্তৃপক্ষের। তাঁরাই বুদ্ধি খাটিয়ে দল গঠন করে কোচের হাতে তুলে দেন। ভালো, লড়াকু ফুটবলারদের দলে না পেলে কোনও কোচই সাফল্য এনে দিতে পারেন না।

এ বারে তাঁর আইএফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃঢ়তার কথা বলছি। এ ব্যাপারে তিনি বরাবরই ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ। কলকাতা তথা বাংলার ফুটবল যাতে ভবিষ্যতেও মাথা উঁচু করে চলতে পারে এই ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তিনি যখন প্রথম সচিব পদে এলেন তখনও কিন্তু ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্তরা চুটিয়ে খেলছে। উঠে এসেছে তরুণ দে, কৃষ্ণেন্দু, অলোক, বিকাশ পাঁজি, কৃশানু দে, শিশির ঘোষ প্রমুখ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তখনও বাংলার ফুটবলারদের দাপট। জুনিয়র ন্যাশনালেও সাফল্য পাচ্ছে বাংলার তরুণ ফুটবলাররা। তবু প্রদ্যুতবাবুর যেন মন ভরছিল না। আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল ফুটবল অ্যাকাডেমি। ঠিক টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমির মতো। অ্যাকাডেমির অর্থ হল এক ছাতার তলায় থাকা, খাওয়া, খেলা, লেখাপড়া। এই ব্যাপারে তিনি অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। রাজারহাট-কাদিহাটীতে জমি দেখেছিলেন। সেখানকার স্কুলের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এগোতে পারেননি। হয়তো আই এফ এ-র আর্থিক অবস্থা তখন খুব একটা ভালো ছিল না বলেই ইচ্ছে থাকলেও পিছিয়ে এসেছেন। সে যাইহোক, ভালো কিছু করার জন্য তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। এখানেই তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন।

সন্তোষ ট্রফিতে আমি বাংলা দলের জার্সি গায়ে খেলেছি। ট্রফি জয়ের স্বাদও পেয়েছি একাধিকবার। তার মধ্যে ১৯৫৯ সালে চ্যাম্পিয়ন দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। বাংলা দলের কোচ হিসাবেও ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু ঘটনা হল রেলওয়েতে চাকরি করতাম বলে বরাবরই রেলওয়ে দলের দায়িত্বে থাকতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে একবারই ব্যতিক্রম হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। প্রদ্যুতবাবুই সেবার আমার হাতে বাংলা দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। দলটাও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হল কুইলনে নোংরামির শিকার হয়েছিল বাংলা। গট-আপ খেলে আমাদের ছিটকে দেওয়া হয়েছিল।

মেরুদণ্ড ছিল

অশোক দাশগুপ্ত

(সম্পাদক, আজকাল)

এদিক-ওদিক খেলার লেখা শুরু হয়ে গেছে। সওদাগরি কোম্পানিতে মোটামুটি ভালো চাকরির সূত্রে যেতে হয় দেশের নানা শহরে, তাই পুরোদস্তুর স্পোর্টস জার্নালিজম-এ আসার কথা ভাবিনি। লিখছি খেলার আসর-এ, আনন্দমেলায় ঘনঘন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বললেন, আসা উচিত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, ফুলটাইম। বলে যাচ্ছি, লেখা তো আটকাচ্ছে না। এই সময়ে একটা ফোন আসে অফিসে। নাম শুনেছি, আলাপ ছিল না। প্রদ্যুত (হ্যাঁ, এই বানানেই অনড় ছিলেন তিনি) দত্ত। বললেন, 'কবে আসবেন বলুন, কথা আছে।' জিজ্ঞেস করলাম, কেন? হাসি-জড়ানো গলায় জবাব, 'গোপন ব্যাপার'!

ক্যামাক স্ট্রিটে শান্তিনিকেতন বিল্ডিংয়ের সেই দপ্তর। চা আসার আগেই বললেন, 'জীবনে অনেক গল্প করা যাবে, আপনার সঙ্গে অনেক দেখা হবে। আগে কাজের কথাটা বলি। একটা ভালো স্পোর্টস ম্যাগাজিন করতে চাই। আপনি না এলে করব না।' জানালাম, ভাবতে হবে। প্রদ্যুতদা — 'বেশি ভাবতে নেই। জব স্যাটিসফ্যাকশন আছে আপনার? বিলিতি সিগারেট খেলেই কি সব হয়ে গেল? সময় নিন না। তিন দিন।'

সেদিনই নীরেনদার কাছে গেলাম। এমনিতে প্রায়ই বলতেন, ফুলটাইম স্পোর্টস জার্নালিজম-এ এসে যা। সেদিন একটু সময় নিলেন। বেশি নয়, মিনিট দেড়েক। বললেন, 'বেশি ভাবলে নতুন কিছু করতে পারবি না। তিনদিন ভেবে লাভ নেই। আজই বলে দে, রাজি।' ভাবছি, তিন দিন সময় নিয়েছি, তার আগেই বলে দেব? কী আশ্চর্য, দ্বিতীয় দিন সকালে আবার প্রদ্যুত দত্ত — 'আমার ধারণা, আসছেন। দেরি করে কী হবে? আজ বিকেলে আসুন, ফাইনাল করি। ভাবছেন যে রোজগার অনেক কমে যাবে। একটু কমবে। অনেকটা সামলে দেব। চলে আসুন।' বিকেলেই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। 'আপনি' থেকে 'তুমি'। টাকার কথা উঠতেই বললাম, যা পাই ম্যাচ করাতে পারবেন না। উচিতও নয়। কত পাচ্ছি, প্রথম স্যালারির সময় দেখে নেব।

নাম — 'খেলার কথা'। যিনি 'খেলার আসর'-এ পরপর লিখিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, সেই চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (চিরঞ্জীব) শুনে বললেন, 'তুমি পারবে। শুভেচ্ছা

থাকবে।' অনেক শুভেচ্ছার সঙ্গে পেলাম আরও এক সম্পদকে। বিপ্লব। বিপ্লব দাশগুপ্ত। সর্বার্থে লেফটেন্যান্ট। প্রদ্যুতদার প্রিয়, ধারাভাষ্যকার, খেলার মাঠে অবাধ যাতায়াত। অফুরন্ত পরিশ্রম করে গেল। সঙ্গে আর্টিস্ট হরিমোহন বাগলি। যার ভাই সেই ১৬ আগস্টের শোচনীয় কাণ্ডে ইডেনে প্রাণ হারিয়েছিল। ছাপার ব্যবস্থা উল্টোডাঙায় দীপ্তি প্রিন্টিং-এ। পেয়ে গেলাম প্রেসে দক্ষ নিতাই কুণ্ডুকে, যিনি আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে গেলেন। তাড়া দিতেন, আজ কিন্তু আরও এক ফর্মা ছাড়তে হবে। ছবিটা কিন্তু এখনও পাইনি। কভারে সুরজিতের ছবিটা আরেকটু ভালো পাওয়া যাবে? আর এল পূর্বপরিচিত রতন ভট্টাচার্য ও সরোজ চক্রবর্তী (দ্য গ্রেট)। ফোটোগ্রাফার প্রদীপ (বাবু) সোম, প্রদ্যুতদা যাকে বলতেন আমার 'বাঁয়া তবলা'।

সেই রাতটা ভোলার নয়। পরদিন সকালে পত্রিকা প্রকাশিত হবে। আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। প্রথম বিজ্ঞাপনের পরেই নানা জায়গা থেকে অর্ডার। এত চাই, এত চাই। কিন্তু, রাত দেড়টায় লোডশেডিং। ইলেকট্রিসিটি লাইন ফেরাতে হবে, ছুটলাম আমি আর বিপ্লব। যখন আশা ছেড়ে দিয়েছি প্রায়, এল। সে এল। বিদ্যুৎ। ভোর পাঁচটা সতেরো মিনিটে ছাপা শেষ। প্রথম কপি নিয়ে আমরা ছুটে গেলাম প্রদ্যুতদার বাড়িতে। পত্রিকায় হাত বোলাতে বোলাতে তিনি বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশনস। লুচি তো খাওয়াতেই হবে!'

লুচি-পর্বের পর শ্রীচন্দ্র পারিজার কাছে। তিনি তখন আনন্দবাজার-এর ডিস্ট্রিবিউটার। আমাদেরটাও নিয়েছেন। ঢুকতেই বললেন, 'দশ হাজার বেরিয়ে গেছে, আজই ছাপুন, কাল সকালে আরও দশ হাজার চাই।' উড়তে উড়তে শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এ। প্রদুতদা বিস্তর মিষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এবং আমার জন্য এক প্যাকেট স্পেশ্যাল সিগারেট। এলেন সুকুমার সমাজপতি। ফ্লুরিজ-এর কেক নিয়ে। মুকুল দত্ত, মতি নন্দী, শান্ত মিত্র, শ্যাম থাপা, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, প্রসূন ব্যানার্জির ফোন। আরও দশ নয়, পনেরো হাজার কপি ছাপার কথা বলে, অভিনন্দন ও কাজ সামলে অফিস থেকে বেরোলাম সন্ধেয়। বিপ্লব ফিরল প্রিয় বেলঘরিয়ায়। আমি বালিগঞ্জের আস্তানায় নয়, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। গোলপার্কেও প্রথম স্টলে গিয়ে 'খেলার কথা' কিনতে চাইলাম। জবাব – শেষ! জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হয়েছে? 'ফাটাফাটি। কালই পাবেন।' গড়িয়াহাটের স্টলে কিনতে চাইতেই অন্য অভিজ্ঞতা। 'নিন, লাস্ট কপি।' কিনলাম! গোলপার্কে শুনলাম, 'কারা করেছে? এত ভালো জিনিস, বেশি ছাপাতে পারেনি? কাল অবশ্য আসবে।'

প্রদ্যুতদার স্মরণে 'খেলার কথা' নিয়েই এত কথা কেন? মনে করি বাংলার খেলার পত্রিকার জগতে বিরাট ভূমিকা ছিল তাঁর। ব্রডওয়ে পাবলিসিটি-র কর্ণধার। জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট। জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব। ময়দানে আরও ব্যস্ততা। কখনও

অন্য অফিসের, অন্য জগতের কাউকে পত্রিকা অফিসে আসতে বলেননি। সব আলাদা কম্পার্টমেন্ট। কীভাবে পারতেন, ভেবে অবাক হতাম। এখনও হই।

তারপর, জল গড়াল। ক্রমে আজকাল-এর স্পোর্টস এডিটর। তারপর সম্পাদক। কয়েক বছর দেখা হয়নি প্রদ্যুতদার সঙ্গে। নার্সিংহোমে দেখতে গেছি উদীয়মান নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। মিনিটখানেক পরেই ঘরের কোণ থেকে একটা আওয়াজ, 'অশোক, আমি আছি।' চেনা গলা, প্রিয় গলা। হাত ধরে বললেন, 'কবে বাড়িতে আসবে বলো?'

বুদ্ধিমান। সহৃদয়। তবু সব কিছু ছাড়িয়ে যা বলতে ইচ্ছা করে, ছিল মেরুদণ্ড। সে তো সবারই আছে। আসলে থাকে না। চাপের মধ্যেও দেখেছি অনড়। তাঁকে নোয়ানো কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমন মানুষকে ভালো না বেসে পারা যায়?

পথপ্রদর্শক

রূপক সাহা

(বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক)

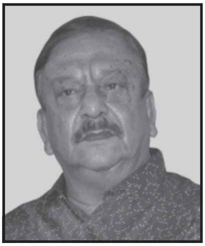

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। অশোক ঘোষের পর আই এফ এ-র সচিব হয়ে এলেন এরিয়ানের অশোক মিত্র। অনেকে বলতে শুরু করলেন, যাক...এম দত্তরায়ের পর এমন একজন দায়িত্ব পেলেন, যিনি নিজে ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলেছেন। অশোক মিত্র উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের সন্তান, ভালোমানুষ। এতটাই কাছের, যখন-তখন তাঁর চেম্বারে ঢোকা যায়। কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পেরে গেলাম, এরিয়ান ক্লাব সামলানো যতটা সহজ, আই এফ এ ততটা নয়। ময়দানে রাজনীতির আবর্তে পড়ে অশোক মিত্র হাঁসফাঁস করতে লাগলেন। যেন অব্যাহতি পেলে তিনি বেঁচে যাবেন।

জল্পনা শুরু হল, কী চান ময়দানের কিং মেকার বিশ্বনাথ দত্ত? কে হতে পারেন, তাঁর মনোনীত প্রার্থী? কে-ই বা এমন আছেন, যাঁকে তিন বড় ক্লাব মেনে নেবে? অথবা যিনি তিন বড় ক্লাবের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবেন? জগমোহন ডালমিয়া প্রথম পছন্দ হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সুতারকিন স্ট্রিটের থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিলেন ইডেন গার্ডেন্সকে। হঠাৎ রটে গেল, বিশ্বনাথ দত্ত চান বা না চান, আই এফ এ-তে নির্বাচন হবেই। তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রদ্যুত দত্ত। জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের কর্তা। চিনতে পারলাম, ভদ্রলোক 'খেলার কথা' বলে একটা ম্যাগাজিন চালাতেন। তখনও জানতাম না, উনি বিশ্বনাথ দত্তের আপন ছোটভাই।

সেবার আইএফএ-র নির্বাচনের দিন, কার মুখে যেন শুনলাম, জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব তাঁবুতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আদিত্য বলে একজন বোমা তৈরি করার সময় মারা গেছে। হার-জিত নিয়ে গড়ের মাঠে ভাঙচুর, মারপিট, বোতল ছোড়াছুড়ির অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণে ক্লাবকর্মীর মৃত্যু, অভূতপূর্ব। অফিসে ফিরে শুনলাম, আই এফ এ-র নতুন সচিব হয়েছেন প্রদ্যুত দত্ত। দু'চারদিন পর পরিচয় হতেই বুঝতে পারলাম, একগুঁয়ে মানুষ। এম দত্তরায়কে অনেকে বেচুদা বলে ডাকতেন। বিশ্বনাথ দত্তকে বিশুদা। অশোক ঘোষ ছিলেন অশোকদা, অশোক মিত্তির নন্তুদা। কিন্তু প্রদ্যুত দত্ত আলাদা টাইপের। ওঁকে 'দুলুদা' বলা যাবে না। উনি প্রদ্যুতবাবু হয়েই থাকতে চান।

খুব শিগগির আমার ভুল ভেঙে গেল। ওই সময় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান

ম্যাচের টিকিটের প্রচণ্ড চাহিদা হত। সচিব হওয়ার পর প্রদ্যুতবাবুর আমলে প্রথম বড় ম্যাচ। লোক মারফত উনি আমার কাছে কিছু টিকিট পাঠিয়ে দিলেন। আমি টিকিট না-চাওয়া সত্ত্বেও। সত্যি বলতে কী, সাংবাদিকদের বশে রাখার এই উদ্যোগটা তখন আমার পছন্দ হয়নি। ওটা ইডেনের ক্লাব হাউস থেকে উদ্ভূত ক্রিকেটীয় সংস্কৃতি বলে আমার মনে হত। আইএফএ অফিসে গিয়ে টিকিটগুলো আমি নিজে ফেরত দিয়েছিলাম। প্রদ্যুতবাবুকে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, 'আমার পরিবারের কেউ খেলা দেখে না। আপনাকে দল চালাতে হয়, টিকিটগুলো রেখে দিন। আপনার কাজে লাগবে।' ওই একটি ঘটনাতেই পরস্পর পরস্পরকে বুঝে গেছিলাম আমরা। প্রায় এক দশকের সম্পর্কটা টিঁকে ছিল ওই মূল্যবোধের উপরই।

পাঁচটা ডিভিশনে অন্তত শ'দুয়েক ক্লাব। সিজনে হাজারেরও বেশি ম্যাচ। কলকাতার ফুটবলে তখন ভরা কোটাল। ট্রফির পর ট্রফি আনছে বড় ক্লাব। এই পরিস্থিতিতে হাল ধরেছিলেন প্রদ্যুতবাবু। আইএফএ অফিস ফুটবল মরশুমে তখন গমগম করত। মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করতেন প্রদ্যুতবাবু। পরনে সাদা শার্ট ও ট্রাউজার্স। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। শুনেছিলাম, অল্প বয়সে ময়দানে খেলা দেখতে গিয়ে তিনি ট্রাম দুর্ঘটনায় পড়েন। ডান পায়ের কিছু অংশ বাদ চলে যাওয়ায় কৃত্রিম পা লাগাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাতে আইএফএ চালাতে কোনও অসুবিধা হয়নি। লিডারশিপের গুণে অন্যদের তিনি দৌড় করাতেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক কিছু করতে চান। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আখেরে ফুটবলেরই উন্নতি হবে।

সত্যিই, কলকাতা ফুটবলের সংস্কারে নেমেছিলেন প্রদ্যুতবাবু। সারা দুনিয়ায় ম্যাচ খেলা হত নব্বই মিনিট। কলকাতায় মাত্র সত্তর মিনিট। বাংলার ফুটবলাররা যখন ইন্ডিয়া টিমের হয়ে কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলতে যেত, তখন ম্যাচের শেষ কুড়ি মিনিট বেদম হয়ে পড়ত। বিদেশি কোচদের এই বিশ্লেষণ শুনে প্রদ্যুতবাবু নব্বই মিনিটের খেলা চালু করেছিলেন। ওঁর পরবর্তী পদক্ষেপ, কলকাতার ফুটবল মরশুম বদলানোর চেষ্টা। সিজন চলত গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। জুন-জুলাই মাসে তীব্র দাবদাহে ফুটবলারদের শারীরিক কষ্ট হত। লিগের মাঝে সাত-দশদিন খেলাও বন্ধ রাখতে হত তখন। প্রদ্যুতবাবু পরীক্ষামূলকভাবে লিগ চালুর চেষ্টা করেছিলেন শীতকালে। কিন্তু সক্ষম হননি। শীতকালে ময়দানের মাঠ চলে যেত হকি সংস্থার দখলে। হকি কর্তাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য একটা সিজনের পর ফুটবল ফের ফিরিয়ে আনতে হয় গরমকালে। প্রদ্যুতবাবুর আরেকটা কৃতিত্ব, স্বচ্ছতার জন্য পুরো মরশুমের লিগ ম্যাচের সূচি একসঙ্গে প্রকাশ করা। তাঁর পূর্বসূরিরা যা কখনও করেননি।

প্রদ্যুতবাবু যখন দক্ষিণ কলকাতার অপূর্ব মিত্র লেনের ভাড়া বাড়িতে থাকতেন,

তখন ফুটবলার, সাংবাদিক, ক্লাবকর্তা সবার জন্য অবারিত দ্বার সেখানে। ছুটির দিন সেই ফুটবল আড্ডায় প্রায়ই যেতাম। উনি ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনতেন। সুইডেনে ইউরো কাপ খেলা কভার করতে গিয়ে দেখেছিলাম, ওখানে বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট খুব জনপ্রিয়। আট-দশ বছর বয়সিদের জন্যও ওখানে লিগ আছে। আড্ডায় একদিন আলোচনা হচ্ছিল, কলকাতায় নার্সারি লিগ চালু করলে কেমন হয়। কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন, মেয়েদের লিগেরও। কলকাতার নানা প্রান্তে তখন ছোটদের ফুটবল ক্যাম্প চলত। মূলত আন্ডার হাইটের টুর্নামেন্টেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের খেলা। ফুটবলারদের সাপ্লাই লাইনটা যাতে ঠিক থাকে, সেই কারণে প্রদ্যুতবাবু পরের বছরই শুরু করে দিয়েছিলেন নার্সারি ডিভিশন।

কলকাতার ফুটবলে প্রদ্যুতবাবুর সবথেকে বড় অবদান, স্পনসরশিপ সম্পর্কে ভুল ভেঙে দেওয়া। একবার ঢাকায় প্রেসিডেন্টস কাপ ফুটবল কভার করতে গিয়ে দেখেছিলাম, ওখানকার ক্লাবগুলো জার্সিতে স্পনসর কোম্পানির লোগো ব্যবহার করছে। কলকাতায় তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল, অপেশাদার কাঠামোয় ক্লাব এইভাবে অর্থসংগ্রহ করতে পারে না। আনন্দবাজার পত্রিকায় লোগো ব্যবহার নিয়ে একটা রিপোর্ট লিখেছিলাম। সেইসময় আইএফএ-র প্রেসিডেন্ট বিচারপতি অজিত সেনগুপ্ত। আমি কলকাতায় ফেরার পর উনি আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন, কাগজে যা লিখেছি ঠিক কি না? সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ওঁকে সেদিন আমি ফিফার মিডিয়া ইনচার্জের ইমেল ঠিকানাটা দিয়েছিলাম। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফিফা থেকে প্রদ্যুতবাবুর কাছে উত্তর এসেছিল। ফিফা বলেছিল ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্লাব অবশ্যই স্পনসর নিতে পারে। আর্থিক অনটনে ধুঁকতে থাকা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বেঁচে গেছিল তারপর থেকে।

সংস্কারকদের চলার পথে সবসময়েই কাঁটা বিছানো থাকে। প্রদ্যুতবাবুকেও হাঁটতে হয়েছে তার উপর দিয়ে। অনেকের অপছন্দের কারণ হয়ে গেছিলেন তিনি। অশোক ঘোষ অনেকের দাদাগিরি সহ্য করেছিলেন বামফ্রন্টের আমলে। শুনেছি, তাঁর হাজার বিঘে ভেড়ি রাতারাতি লুঠ হয়ে গেছিল সেই সময়। 'মাই ডিয়ার' হতে গিয়ে নিজের সর্বনাশটি ডেকে এনেছিলেন অশোকদা। প্রদ্যুতবাবু কিন্তু কারও বশংবদ হয়ে থাকতে চাননি। এমনিতেই খানিকটা বামবিরোধী মনোভাবের ছিলেন। ফলে একটা সময় বিরাগভাজন হয়ে গেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর। দফায় দফায় বড় ম্যাচ আয়োজন করা নিয়ে সমস্যা, টিকিটের দাম বাড়ানো নিয়ে মনোমালিন্য। একবার রাইটার্স বিল্ডিংসের রোটান্ডায় সুভাষবাবুর সঙ্গে মিটিং করতে গিয়ে মেজাজ দেখিয়ে চলে এলেন প্রদ্যুতবাবু। সেই মিটিং কভার করতে আমিও গেছিলাম। কেন জানি না, সেদিন মনে হয়েছিল, প্রদ্যুতবাবু ঠিক করলেন না। পরে অনেক ঘটনায় বুঝতে পারি, দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা বাইরে থেকে তেতো মনে হলেও,

আসলে মধুর।

প্লেয়ারদের কখনও মাথায় চড়তে দেননি প্রদ্যুত দত্ত। আবার কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেও দেখিনি। দু'টি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একবার সবুজ-মেরুনের শিশির ঘোষের সঙ্গে মারপিটের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে লাল-হলুদের চিমা ওকোরি সাসপেন্ড হয়ে গেলেন। আরেকবার রেফারি প্রদীপ নাগকে আক্রমণ করে সুব্রত ভট্টাচার্য শাস্তির কবলে, দু'জনেই ক্রাউড পুলার। মাঠে দর্শকসংখ্যা কমে যেতে থাকায় আমরাই প্রদ্যুতবাবুকে বোঝালাম, মাথা গরম করে প্লেয়াররা অপরাধ করে ফেলেছে। মাঠে দর্শক ফিরিয়ে আনার জন্য ওঁদের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হোক। প্রদ্যুতবাবু আমাদের অনুরোধ রেখেছিলেন। ওঁর দূরদর্শিতা নিয়ে আমার মনে কখনও কোনও সন্দেহ জাগেনি। সবসময় দেখেছি, রেফারিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইচ্ছে করলে, সচিব হিসেবে নিজের ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা নিতে পারতেন। কিন্তু কখনও কোনও অনৈতিক কাজে ক্লাবকে জড়াতে দেননি। শুনেছি, একবার জর্জের বিরুদ্ধে গটআপ ম্যাচ খেলার অভিযোগ শুনে তিনি মারাত্মক চটে গেছিলেন। টিমের ভারপ্রাপ্ত কর্তাকে তিনি পেপারওয়েট ছুড়ে মেরেছিলেন।

প্রদ্যুতবাবু দাদাগিরি করতেন বলে আমার মনে হত না। তবে স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, কারও দাদাগিরি সহ্য করার মানুষ তিনি নন। কেউ হয়তো ওঁর মাথায় ঢুকিয়েছিলেন, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে নেমে পড়ুন। খলিফা জিয়াউদ্দিনের সমর্থন পাবেন। তখন এআইএফএফ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। তিনি এআইএফএফের প্রেসিডেন্ট হতে ইচ্ছুক। আমরা শুনলাম, প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে প্রদ্যুতবাবু নির্বাচনে লড়বেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবকে সামনে রেখে। দুই হেভিওয়েট মন্ত্রীর লড়াই। নির্বাচন স্থল মুম্বাই। কার থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন জানি না, প্রদ্যুতবাবু আমাদের ধারণা দিয়েছিলেন, হারার কোনও প্রশ্নই নেই। দলবল নিয়ে তিনি গিয়ে উঠলেন, তাজ হোটেলে। কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল হয়েছিল। নির্বাচনের আগের রাতে আমরা হঠাৎ শুনলাম, সন্তোষমোহন দেব নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি না কি চাননি, তাঁর ক্যাবিনেটের দুই মন্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ুন।

মুম্বাইয়ের ওই নির্বাচনের আগে আমি আনন্দবাজারে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, প্রদ্যুতবাবুর এআইএফএফ সচিব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লেখার ভিতরে একটা কার্টুন আঁকা ছিল, প্রদ্যুতবাবুর ট্যাকলে প্রিয় দাসমুন্সি ধরাশায়ী হয়ে গেছেন। ওই কার্টুনটার জন্য আমাকে পরে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। তখন ভেবে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম, কার ভরসায় প্রদ্যুতবাবু লড়তে গেছিলেন? সর্বভারতীয় স্তরে মাত্র চার বছরের অভিজ্ঞতা। কোন কোন কর্তা বিশ্বাসঘাতকতা

করেছিলেন ওঁর সঙ্গে? শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ ফুটবলের আয়োজন করতে যাওয়া আরেকটা ভুল হয়েছিল। এ বার অসহযোগিতা করেছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী।

জেলা শহরে কাপ ফুটবল আয়োজন করার পিছনে প্রদ্যুতবাবুর একটাই উদ্দেশ্য ছিল। এই সুযোগে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে একটা স্টেডিয়াম তৈরি করে ফেলা। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হওয়ার সময় সুভাষবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সমিতি থেকে আর্থিক সাহায্যের। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে প্রদ্যুতবাবুর একটা বিতর্কিত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তাতে না কি সুভাষবাবুর সমালোচনা করেছিলেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি পড়ে সেইসময় আমার মনে হয়েছিল, প্রদ্যুতবাবু ওইরকম স্থুল কথা বলতেই পারেন না। সুভাষবাবু দাবি করেছিলেন, তা হলে রিজয়য়েন্ডার দিন। কিন্তু প্রদ্যুতবাবু তাতে রাজি হননি। যে রিপোর্টার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, সে না কি কান্নাকাটি করেছিল, প্রতিবাদপত্র দিলে তাঁর চাকরি চলে যাবে। অর্বাচীন সেই রিপোর্টারকে বাঁচানোর জন্য প্রদ্যুতবাবু কেন যে নিজের এবং আইএফএ-র সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন, কে জানে?

সুভাষবাবু কোনও সাহায্য করেননি। মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিল আইএফএ। প্রায় তিরিশ লাখ টাকার মতো। দেনার দায়ে আইএফএ-তে আসা কমিয়ে দিয়েছিলেন প্রদ্যুতবাবু। শেষে একটা সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর দিল্লির হাসপাতালে মারা যান। প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেছে। এখনও ভাবার চেষ্টা করি, ফেডারেশনের সেই নির্বাচনে যদি প্রদ্যুতবাবু জিততেন, তা হলে কী হতে পারত? সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টগুলো (ডুরান্ড, রোভার্স, আইএফএ শিল্ড, বরদলুই ট্রফি, স্ট্যাফোর্ড কাপ, কলিঙ্গ কাপ, বান্দোদকর কাপ) উঠে যেত না। আই লিগ নমঃ নমঃ করে শুরু হত না। অনেক বেশি রাজ্যের ক্লাব টিম জাতীয় লিগে অংশ নিত। প্রিয় দাসমুন্সির মতো, ললিত মোদিকে প্রদ্যুতবাবু ফিরিয়ে দিতেন না। ক্রিকেটের আইপিএলের বদলে অনেক জাঁকজমক করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হত। ফুটবলের প্রসারের জন্য ফিফা যে বিরাট পরিমাণের অনুদান দিত, তার সদ্ব্যবহার হত। ক্রিকেটের কাছে ফুটবল কৌলীন্য হারাত না।

দুষ্টুমিটা পরিণত বয়সেও বদলায়নি

অর্চনা বোস (সেজদি)

দেখতে দেখতে ২৯টা বছর কেটে গেল। প্রদ্যুত আমাদের সঙ্গে নেই। আমরা পাঁচ ভাই বোন। ভাইদের মধ্যে প্রদ্যুত ছিল সবার ছোট। ওর ডাকনাম ছিল দুলাল। সত্যিই বাবা মা-র আদরের দুলাল। জ্যোতিষী বলেছিলেন মাত্র ৮ বছর বয়সেই হারিয়ে যাবে। বয়সের সেই ফাঁড়া কেটে গেল ১৬ বছর বয়সে। ঈশ্বরের অসীম করুণায় প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা পা বাদ দিতে হয়েছিল। নীলরতন সরকার হাসপাতালের সামনে ট্রামের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। ডা. এস আর চন্দ্রর নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিল। কিন্তু এতটাই জখম হয়েছিল যে জন্য পুণেতে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হয়েছিল। সেখানে জখম পা-টি বাদ দিয়ে কৃত্রিম পা লাগানো হয়। সেই ১৬ বছর বয়স থেকে যতদিন বেঁচে ছিল এক পায়েই দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ডানপিটে ছিল। অসীম সাহসী। মনের জোর ছিল প্রবল। তাই এক পায়েই অনেক অসাধ্যসাধন করেছে।

লেখাপড়ার ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিল সে। তাই বলে সারাক্ষণ বইয়ের সামনে বসে থাকা মোটেই পছন্দ করত না। এ ব্যাপারে নানারকম বায়নাক্কা ছিল। আমাদের সার্পেন্টাইন লেনের বাড়িতে একতলায় জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের কয়েকজন ফুটবলার থাকতেন। সেখানেই ওঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রদ্যুতকে পড়াবার জন্য তাঁদের মধ্যে একজনকে বাবা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ওকে পড়তে বসানোর কাজটা যে কত কঠিন ছিল ব্যাপারটা সেই ফুটবলারটির বুঝতে দেরি হয়নি। যেমন একদিন বলেছিল কাঁধে বসিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে ঘুরিয়ে আনলে তবেই পড়তে বসবে। এরকম আরও অনেক আবদার মিটিয়ে পড়তে বসানো যেত।

আমাদের বাড়ির উঠান অনেকটা বড় ছিল। সেই উঠানে অন্যান্য ভাই এবং পাড়ার ছোটরা খেলত। প্রদ্যুত এক পায়েই সেই খেলায় অংশগ্রহণ করত। ৮ বছরের ফাঁড়া অতিক্রম করার পর ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়। অবশ্য দুষ্টুমি কিছুটা কমলেও সারাদিন একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে ঘরে বসে থাকত না। তবে রাতে পড়ার সময়ে অত্যন্ত সচেতন থাকত। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ত। তাই সকালে একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙত। আমরা যখন পড়তে বসে যেতাম তখন ও ঘুমিয়ে থাকত। টিউটর এসে ঘুম ভাঙাতেন।

আমার বিয়ের তিন মাস আগে মারাত্মক দুর্ঘটনা হয়েছিল। স্বভাবতই গোটা বাড়িতেই ছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। তাই আমার বিয়েতে সবাই প্রাণখুলে আনন্দ করতে পারেননি। তবে ঘটনা হল সবাই ভেঙে পড়লেও প্রদ্যুত কিন্তু প্রায় স্বাভাবিক ছিল, অতবড় একটা দুর্ঘটনার পরেও।

দুষ্টুমি করা যার অভ্যাস সেটা কি সহজে ছেড়ে যায়? কোনও সুযোগ পেলেই বড়দা-র পিছনে লাগত। এই ব্যাপারটা নাকি প্রদ্যুতের বড় ছেলে জয়ের মধ্যেও আছে। নিজে যেমন সবসময় বই খাতা নিয়ে বসতে পছন্দ করত না, সেরকম জয়কেও সবসময় পড়তে দেখলে রেগে যেত। একদিন তো জয়ের বই-খাতা ছিঁড়েই ফেলেছিল।

বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেশি ছিল ভোলার সঙ্গে। সেই ভোলার পিছনেও লেগেছিল। ভোলা বেছে বেছে ওর পড়ার সময়েই আসত। সেই কারণে একদিন চায়ের সঙ্গে চিনির বদলে সোডা মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই চা পান করে ভোলার তো কাহিল অবস্থা। পেটে গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। তার আগেই অবশ্য প্রতিষেধক হিসাবে ওষুধও মজুত রেখেছিল। হ্যাঁ দুষ্টুমি করলেও ওর মনটা ছিল শিশুর মতো সরল।

ছোড়দা

তাপসী গুহ

(কনিষ্ঠা ভগ্নী)

ছোড়দা (প্রদ্যুত দত্ত) আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন ২৯ বছর আগে। আজও কিছুতেই ছোড়দাকে ভুলতে পারছি না, ভোলার কথাও নয়। ছোড়দার বর্ণময় জীবনের অনেক ঘটনা মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে। তাই যখন শুনলাম তাঁর দুই পুত্র জয় (অনির্বাণ) এবং জিত (অনিন্দ্য) ছোড়দাকে নিয়ে একটা বই প্রকাশ করতে চলেছে তখন অবশ্যই খুব ভালো লেগেছে। সেই বইয়ে আমাকেও ছোড়দা সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে জেনে মনে হয় কিছুটা হালকা হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। হালকা হওয়ার কারণ, আমরা অনেকেই তো তাঁর সম্পর্কে জানি। কিন্তু সেই সব টুকরো ঘটনা মাঝেমধ্যে মনে পড়লেও সবাইকে বলার সুযোগ তো হয় না। জয়-জিৎ সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য ওদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি।

আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবার কাছে প্রিয় ছিল ছোড়দা। কারণ যে কোনও সমস্যাতেই ছোড়দা ছিলেন ত্রাণকর্তা।

নানাবিধ গুণের সমন্বয় ছিল ছোড়দার মধ্যে। খেলা এবং সংগীতের অনুরাগী ছিলেন ছোড়দা। খেলার ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন। আমি তাঁর সংগীতে অনুরাগের কিছু কথা বলছি। তিনি যেমন নিজে সংগীত অনুরাগী ছিলেন, পাশাপাশি নিজেও এই ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন। মাউথ অর্গানে গানের সুর তুলে সবার মন জয় করেছেন। পাশাপাশি তবলাও বাজাতে পারতেন, গিটার বাজাতেন এমনকি ভাড়া করে এনে পিয়ানোও বাজাতেন।

আমাদের শিয়ালদা সার্পেনটাইন লেনের বাড়িতে ছিল খেলাধুলার পরিবেশ। বাড়িতে ব্যাডমিন্টন কোর্ট ছিল। ছোড়দা এই খেলাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খেলাতে তিনি হারতে চাইতেন না। বাড়িতে টেবল টেনিস বোর্ড ছিল। এই খেলাতেও ছোড়দার হাত ছিল চমৎকার।

সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতে ভালোবাসতেন। বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গেছি। সব সময়ই তিনি আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। দেওঘরে গিয়ে নিজেই টাঙ্গা গাড়ি চালিয়েছেন। টাঙ্গাওয়ালা তখন ছোড়দার পাশে বসতেন। এইভাবে আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। কালীপূজার সময়ে আমাদের গোটা বাড়ি

আনন্দে গমগম করত। সেই সময়ে বাজি পোড়ানো, তুবড়ি প্রতিযোগিতাতে সব কিছুতেই অগ্রণী ভূমিকায় থাকতেন ছোড়দা।

সবসময়ই আনন্দের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন। ছোড়দা অবসর সময়ে সিনেমা দেখতেন। কিন্তু দুঃখের ছবি দেখতেন না। বলতেন দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ আমাদের তো সবসময়ই লেগে থাকে। সেক্ষেত্রে সিনেমাতেও দুঃখ বেদনার ছবি দেখতে যাব কেন?

জীবনে কোনও কাজেই তিনি হারতে চাইতেন না। ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস খেলাতে যদি কখনও হারতে থাকতেন তখন গোলমাল পাকিয়ে দিতেন। খেলা ছেড়ে চলে যেতেন।

ছোড়দা ভীষণ অভিমানী ছিলেন। কোনও কারণে যদি মনমতো না হত তাহলে লেবুতলা পার্কে গিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু এই অভিমানই ছোড়দার জীবনে একটা বিরাট বিপদ ডেকে এনেছিল। সেদিন বড় কোনও এক দলের সঙ্গে জর্জ টেলিগ্রাফের খেলা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ দেখার জন্য মানসিক দিক থেকে এতটাই উৎসাহী ছিলেন যে সেদিন দুই বন্ধু ভোলাদা এবং টুনুদাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু গাড়িতে জায়গা না পাওয়ায় তখন বন্ধুদের নিয়ে ট্রামে যাবেন ঠিক করলেন। ফুটবলারদের মাঠে নামিয়ে গাড়ি আবার আসবে জেনেও দেরি হবে ভেবে অভিমানী ছোড়দা অপেক্ষা করতে চাননি। আসলে বিপদ যখন ঘটে তখন মানুষ এরকমই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। ছোড়দাও সেদিন এরকমই একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপদ ডেকে এনেছিলেন। সেদিন আবার ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত ছিলেন। এই পোশাকও তাঁর বিপদ ডেকে এনেছিল। সেদিন শিয়ালদা থেকে প্রচুর দর্শক খেলা দেখার জন্য ট্রামে উঠছিলেন। ভিড় হয়েছিল বলে তাড়হুড়ো করে ছোড়দা ট্রামে ওঠার সময় ধুতির খুট ট্রামের চাকায় বেধে যাওয়ায় ট্রাম থেকে পড়ে গেলেন। নীলরতন সরকার হাসপাতালের সামনে রাস্তায় পড়ে গেলেন। ট্রামের চাকা একটা পায়ের উপর দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে একটা পা মারাত্মক জখম হয়েছিল। ডা. এস আর চন্দ্রের চিকিৎসাধীন ছিলেন। জখম পায়ের নীচের দিক থেকে কাটতে কাটতে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি বাদ দিতে হয়েছিল। ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে বন্ধুরা তখন বিধ্বস্ত হলেও তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন দুর্ঘটনার খবর যেন বাড়িতে জানতে না পারে। পরবর্তীতে পুণেতে চিকিৎসা হয়েছিল। সেখানে কৃত্রিম পা লাগানো হয়েছিল। তারপর থেকে বলতে গেলে এক পায়েই ছোড়দা দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছেন এবং সর্বক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছেন।

সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর মা সবসময়ই কাঁদতেন। দু-চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। বাবা মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত হলেও তাঁর আরাধ্য গুরুদেব কৈবল্যনাথ শ্রী রামঠাকুরের উপর ভরসা রেখে মাকে বলেছিলেন, 'ঠাকুর যা করে

মঙ্গলের জন্যই। দেখবে তোমার দুই ছেলে বিশ্বনাথ এবং প্রদ্যুত জীবনে অনেক সাফল্য পাবে, নাম যশ হবে।

দুর্ঘটনার পরে পরিজনদের মধ্যে অনেকেই ছোড়দাকে দেখতে এসেছেন। ভালোমন্দ খাবার হাতখরচ বাবদ টাকাপয়সা দিয়েছিলেন। ভাইদের মধ্যে দাদামণি চতুর্থ দাদা প্রশান্ত দত্ত-র সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল ছোড়দার। তবে ছোড়দাকে দেখভালের দায়িত্ব সামলাতেন মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত। যেমন কোনও ব্যাপারে মতের অমিল হলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেত লেবুতলা পার্কে। সেই সময় ছোড়দাকে খুঁজে আনতেন মেজদাদা (বিশ্বনাথ দত্ত)। মেজদার কথা খুবই মানতেন ছোড়দা।

ঘরে তাঁর মন টিকত না বলে বাবা বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করেছিলেন। ভেবেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ধরাবাধা নিয়মে ছোড়দা বাড়ির বাইরে বেরবার সুযোগ পাবেন না। কিন্তু মিশনের ধরাবাধা নিয়মে থাকা ছোড়দার পক্ষে তাড়াতাড়ি মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না, সেটা আন্দাজ করে বাবা প্রতি সপ্তাহে মেজাদাকে পাঠাতেন। মেজদার কাছে ছোড়দা সবসময়ই বলতেন, মিশনে সব কাজই নিজেদের করতে হত। খাবার পরে নিজের বাসন মাজতে হত। বিচক্ষণ মেজদাদা তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিশন থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। তাই বলে ছোড়দার শিক্ষাজীবন ব্যর্থ হয়নি।

এম কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শেখার আগ্রহ প্রবল ছিল। ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দখল ছিল। ইংরেজি অভিধান (ডিকশনারি) থেকে প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করেছিলেন।

ভাইদের মধ্যে সবার ছোট হলেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল বড় ভাইয়ের মতো। মানসিক দৃঢ়তার জন্য জেষ্ঠ্য চার দাদা ছোড়দাকে ভরসা করতেন। মনের জোর ছিল প্রবল। কঠিন বিপদের মুখেও শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে পারতেন। তাঁর মানসিক দৃঢ়তার জন্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিউট আজ গোটা দেশে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৯ সালে আমাদের পারিবারিক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কয়েকজন কর্মচারীর অসহযোগিতায় উঠে যেতেই বসেছিল। কর্মচারীরা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যে কারণে ইনস্টিটিউটে যেতে ভয় পেতেন। বেশ কিছুদিন জর্জ টেলিগ্রাফ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সেই কঠিন সময়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ছোড়দা।

সেই সময় আমার স্বামী বিজিত গুহ ছোড়দার পাশে থেকেছেন। ইনস্টিটিউটের সরঞ্জাম যাতে কেউ চুরি করতে না পারে সেক্ষেত্রে বিজিতদা-র মামা রাতে পাহাড়া দিতেন। মামলা হয়েছিল, আমরাই জিতেছিলাম। তবু সেই দুর্বিসহ দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

ছোড়দাকে তারপর থেকেই বলা হয় 'সেকেন্ড ফাউন্ডার'। জর্জ টেলিগ্রাফের

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমাদের বাবা হরিপদ দত্ত। ১৯২০ সালে তিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই ১৯৭৯ সালে ছোড়দা রুখে না দাঁড়ালে বাবার স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠান উঠেই যেত। ছোড়দা জর্জ টেলিগ্রাফকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। পাশাপাশি উত্তরোত্তর উন্নতি করেছেন। স্বভাবতই ছোড়দাকে 'সেকেন্ড ফাউন্ডার' বললে ভুল হবে না।

ভীষণ ভোজন-রসিক ছিলেন। তেল-ঝালের সুস্বাদু রান্না খেতে ভালোবাসতেন। কেউ যদি নিষেধ করতেন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, 'কতদিন বা বাঁচা, এত বাছ-বিচার করে খাওয়া যায় নাকি?'

এ বারে আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলছি। ১৯৯০ সালের ঘটনা। একদিন থিয়েটার রোডের ক্রসিংয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি পিছন থেকে আমার পায়ে আঘাত করেছিল। খবরটা শোনার পরে আমাদের বাড়ি থেকে বিজিতদা এবং আরও সবাই ছুটে এসেছিলেন। ছোড়দাও হাজির হলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই আমার পা থেকে মোজা খুললেন। জর্জ স্পোর্টস ক্লাবের অর্থোপেডিক ডাক্তার সুনীল ঠাকুরকে খবর দিলেন। পায়ে তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু জানালেন 'পায়ে চিড় ধরে গেছে'। বিজিতদার কাছে তখন টাকা ছিল না।

ছোড়দা জানতে পেরে বললেন, 'অফিসে যাও, এদিকটা আমি দেখছি।' মজা করে ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, 'দেখলেন তো, টাকাটা এখন আমাকেই দিতে হবে।' ছোড়দা মজা করছেন ডাক্তারবাবু বুঝতে পেরেছিলেন। না, তিনি কোনও টাকা নেননি।

১৯৯২ সালে আমার স্বামী বিজিত গুহ প্রয়াত হন। দূরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুস্থ করে তোলার জন্য ছোড়দা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সময়ে ছোড়দা ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি সবসময়ই ছোড়দার পাশে থাকতেন। ভাগ্য বিপর্যয়ের পর আমি ছোড়দার সামনে দাঁড়াতে পারতাম না। আমাকে দেখলেই অঝোরে কাঁদতেন। অভয় দিয়ে বলেছিলেন 'যত অসুবিধাই হোক গহনায় হাত দিবি না।

বিজিতদা প্রয়াণের পরে আমি তাঁর অফিসে চাকরি পেয়েছিলাম। এজন্য অবশ্য অন্য কোথাও যোগাযোগ করতে হয়নি। কারণ অফিসে বিজিতদা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। দিল্লিতে অফিসের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনিই করতেন। স্বভাবতই স্ত্রী হিসাবে চাকরিটা আমার প্রাপ্য ছিল। আমাকে চাকরি করতে হবে শুনে মেজদা একটু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু ছোড়দা বলেছিলেন, চাকরি করতেই হবে। এতটাই বাস্তববাদী ছিলেন তিনি। সেই অর্থে ছোড়দা নিজের জন্য খুব একটা ব্যয় করেননি। অনেকটাই আমাদের বোনদের পোশাক, সাজগোজের জন্য দিয়েছিলেন। মনটা ছিল শিশুর মতো সরল। সবসময় আনন্দের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন।

টেবল টেনিসে কেউ হারাতে পারত না

লীনা গুহ (ছোটদি)

প্রদ্যুত আমাদের ছোট ভাই। ছোটবেলায় ভীষণ দুষ্টু ছিল। নানারকম দুষ্টুমি সবসময় ওর মাথায় খেলত। যেমন খেলার পুতুল ভেঙে মাথায় চাপিয়ে 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে সারা বাড়ি ঘুরত। ওর লেখাপড়ার জন্য বাবা বাড়িতে একজন মেমসাহেব প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলেন।

সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গোটা দেশ তখন উত্তাল। 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'—'কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগান স্বদেশিদের মুখে মুখে ঘুরছিল। বাড়িতে মেমসাহেব যখন পড়াতে আসতেন ঠিক সেই সময়েই প্রদ্যুত স্বদেশিদের সেই স্লোগান শুরু করত। আবার আর একটা স্লোগানও শুনতাম—'সাইমন্ড গো ব্যাক'। এইসব দুষ্টুমি দেখে মেমসাহেব বিরক্ত বোধ করতেন। এতটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রদ্যুতকে পড়াবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন।

এরকম নিত্যনতুন দুষ্টুমি ওর মাথায় খেলত। সে জন্য মা-র কাছে সবসময় বকুনি খেত। মা অনেক সময় মারধর করেছেন, কিন্তু তাতে প্রদ্যুতের দুষ্টুমি আটকানো কখনও যায়নি।

একদমই ঘরে থাকতে চাইত না। দুর্ঘটনার আগে পর্যন্ত সুযোগ পেলেই ফুটবল নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলতে যেত। এভাবে যখন তখন ঘর থেকে বাইরে যাওয়া আটকাবার জন্য বাড়ির দুই গেটের দারোয়ানদের কাছে কড়া নির্দেশ ছিল। কিন্তু প্রদ্যুতের দুষ্টুমির কাছে দারোয়ানরা হার মেনে যেত। যেমন, অনেক সময় গিয়ে বলত, তোমাকে বড় বাবু (আমাদের বাবা) ডাকছেন। এভাবে দারোয়ানদের ধোঁকা দিয়ে খেলতে যেত। আমাদের বাড়িতে ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা ছিল। ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস— দুটো খেলাতেই বিশেষ পারদর্শী ছিল ছোট ভাই। বাড়িতে বড় সাইজের টেবল টেনিস বোর্ড ছিল। সেখানে দাদা, ভাইদের সঙ্গে আমরা বোনেরাও খেলতাম। ঘটনা হল, খেলাতে প্রদ্যুতকে হারানো যেত না। এতটাই পারদর্শী ছিল বলে দাদারা প্রদ্যুতের ওপর ভরসা করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। একদিন ওড়িশার একজন চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার আমাদের বাড়িতে চমৎকার টেবল টেনিস বোর্ড দেখে দাদাদের সঙ্গে খেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এদিকে তাঁর সঙ্গে খেলার জন্য প্রদ্যুত তখন ভীষণ উদগ্রীব ছিল। ওর আগ্রহ দেখে ওড়িশার সেই চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ারদের দাদারা তখন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'আগে

আমাদের ছোটভাইয়ের সঙ্গে খেলে জিততে পার তাহলেই আমরা তোমার সঙ্গে খেলব।' দাদাদের প্রস্তাবে সেই চ্যাম্পিয়ন রাজি হননি। রেগেমেগে চলে গিয়েছিলেন।

বাড়িতে ম্যাডামের কাছে পড়তে চাইত না। কিন্তু তাই বলে তো লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। ৮ বছর বয়সে একটা ফাঁড়া ছিল বলে একটু দেরিতে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। একটু বড় হতেই বাবা বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন মিশনে থাকলে আর যখন তখন বাইরে আসতে পারবে না। কিন্তু প্রদ্যুত তো 'বনের পাখি'। পাখিকে কে বেশিদিন খাঁচায় আটকে রাখা যায়? মিশনে ধরা বাঁধা নিয়মে ওর মন টিকবে কেন? ব্যাপারটা বাবাও বুঝতেন। ওকে শান্ত রাখার জন্য মেজদাদা (বিশ্বনাথ দত্ত) সপ্তাহে একদিন রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন। কিন্তু তৎসত্বেও মিশনে ওকে রেখে দেওয়া যায়নি। মিশনে খাওয়ার পরে নিজেদের বাসন পরিষ্কার করতে হত। তার উপর প্রাণের বন্ধুদের কাছে পেত না। ওর মনের যন্ত্রণা মেজদাদা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের পাট চুকিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন।

তবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে চলে এলেও শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। কৃতিত্বের সঙ্গে এম কম পাস করেছিল। বাড়িতে প্রাইভেট টিউটারকে পছন্দ করেনি, রামকৃষ্ণ মিশনে মন টেকেনি, কিন্তু সে জন্য নিজে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। শিক্ষাজীবনে সফল হবই, এই জেদটা সবসময়ই ছিল। তাই সাফল্যও পেয়েছিল।

পিতা হরিপদ দত্ত, মাতা শান্তিলতা দেবী

সহধর্মিনী মালবিকা দত্তর সঙ্গে

স্ত্রী মালবিকা দত্ত এবং দুই পুত্র আনির্বাণ, অনিন্দ্য

পুত্র অনির্বাণের অন্নপ্রাশনে কিংবদন্তি ফুটবলার পদ্মশ্রী শৈলেন মান্নার সাথে

বৈঠকখানায় সঙ্গী পুত্র অনির্বাণ

ভগ্নীপতি বিজিৎ ঘোষ, পারিবারিক বন্ধু শেখ আনোয়ার আলি
ও দাদা বিশ্বনাথ দত্ত এর সাথে

সবুজ বাঁচাও আন্দোলনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এর সাথে

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু-কে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নির্মাণকল্পের জন্য ২০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান, উপস্থিত রয়েছেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী

১৯৮৮ শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
শীলা দীক্ষিত এর সঙ্গে।

১৯৮৮ শিলিগুড়িতে, সঙ্গে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অজিত পাঁজা।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পর্যবেক্ষণে রূপকার প্রদ্যুত কুমার দত্ত

কর্মব্যস্ত শ্রী প্রদ্যুত কুমার দত্ত।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাঠ ভর্তি দর্শকদের সামনে বক্তৃতা

নেহরু কাপ চলাকালীন, সঙ্গে সিকিমের
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভান্ডারি।

মাঠের অনুগামীদের সাথে।

মাঠ ও পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করছেন পি কে ব্যানার্জীর সঙ্গে।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রবাদ প্রতিম শিল্পপতি জে.আর.ডি টাটার সাথে।

ইডেন উদ্যানে, খেলা শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তৎকালীন অধিনায়ক আজহারউদ্দিনের সঙ্গে পরিচিতি পর্বে।

পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা পল্টু দাসের হাতে।

আই.এফ.এ-র শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে।

কালীঘাট রোটারী ক্লাবের অনুষ্ঠানে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রী প্রদ্যুত কুমার দত্ত।

কলকাতা লীগের প্রথম স্পনসর (চার্মস) এসেছিল প্রদ্যুত কুমার দত্ত-এর হাত ধরে।
সেই চর্মস লীগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

আই.এফ. এ-র স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে।

তৎকালীন কলকাতা আই.এফ.এ শীল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠানে।

শিলিগুড়িতে নেহরু কাপে। ডান দিকে খালিফা জিয়াউদ্দিন এবং
বাঁ দিকে অশোক ঘোষ।

৪বি অপূর্ব মিত্র রোডের অফিসে আই.এফ.এ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায়।

আই.এফ.এ অফিসে গুরুত্বপূর্ণ সভায়।

আই.এফ.এ-র বার্ষিক সাধারণ সভায়।

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়।

ছোটকাকা

সুব্রত দত্ত (ভাইপো)

আমার ছোটকাকা প্রদ্যুত কুমার দত্ত বাংলার ফুটবল মহলে একটি সুপরিচিত নাম। ফুটবল প্রশাসনে তাঁর যাত্রা শুরু আমাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব থেকে। ১৯৮৪ সালে বাংলার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে প্রথমে অর্থসচিব, পরবর্তীকালে সাধারণ সচিব পদে যোগ দেন।

আসলে ক্রীড়া সংগঠনে প্রশাসনিক ব্যাপারটা আমাদের অনেকটাই জন্মগত। আমাদের পিতামহ হরিপদ দত্ত ছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। আমার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত সম্পর্কে নিশ্চয়ই নতুন করে কিছু বলতে হবে না। ফুটবল, ক্রিকেট – দুই সংস্থাতেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

ছোটকাকা আমার বাবার মতোই লড়াই করে আই এফ এ-র সচিব পদে বসেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি দল সাজিয়েছেন। প্রসঙ্গত সেই সময়ে আমার বাবা এবং অশোক ঘোষ ময়দান নিয়ন্ত্রণ করছেন। ১৯৮০-৮১ থেকে তিনবার নির্বাচনে লড়াই করেও জিততে পারলেন না। তবু হাল ছাড়েননি। গোটা দলটাকে সংগঠিত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হলেন। এজন্য তাঁকে কঠিন লড়াইয়ের সামনে পড়তে হয়েছিল। অদম্য জেদ, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, জয়ের তাগিদ যে কোনও কঠিন কাজেই সাফল্য এনে দেয়। আমার বাবা এবং ছোটকাকা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ছোটকাকা ছিলেন আমার জীবনে 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার এবং গাইড'। বেশ কিছুদিন আমি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। ১৯৭৯-৮০ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমি তখন ৪৫-এ, রাজা রামমোহন সরণীতে (আমহার্স্ট স্ট্রিট) থাকতাম। ছোটকাকা তখন তাঁর 'খেলার কথা' পত্রিকা অফিসে নিয়মিত আসতেন। সেই সময় অনেক কিছু খুঁটিনাটি বিষয় আমাকে বলতেন।

আমি তখন ক্লাস টেন-এ পড়ি। একবার সপরিবারে আমরা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রতিদিনই দুপুরে জমজমাট আড্ডা হত। তার মধ্যে একদিন আমার ambition কী জানতে চাইলেন। ডাক্তার হতে চাই শুনে বলেছিলেন কোনও ধরাবাঁধা চাকরি করা ঠিক হবে না। ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ ব্যবসা করলে স্বাধীনতা থাকবে। সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। সর্বোপরি সাংগঠনিক দক্ষতা প্রদর্শনের

সুযোগ পাওয়া যাবে। চাকরির ক্ষেত্রে সেই সুযোগ থাকবে না।

ছোটকাকার পরামর্শ মেনে নিয়ে ব্যবসাতেই মন দিলাম। সময় পেলেই ব্যবসার পাঠ নিতে ছোটকাকার কাছে ছুটে যেতাম। ছোটকাকা ছিলেন একজন 'ক্ল্যাসিক টেবল টকার'। যখন খুব ভালো মেজাজে থাকতেন তখন জমিয়ে আড্ডা হত তাঁর ঘরে। সেই জমকালো আড্ডায় আমিও যেতাম। তবে শুধু গল্প শুনতে নয়, আমার মূল লক্ষ্য ছিল শেখার।

আই এফ এ-এর সচিবের চেয়ারে তিনি সহজে বসতে পারেননি। কেউ যদি মনে করেন মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত চেয়ারে বসিয়েছেন, তাহলে ভুল করবেন। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিক থেকে লড়াই শুরু করেছেন। ভ্রাতৃসঙ্ঘ ক্লাবের চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, ভিক্টোরিয়া ক্লাবের রঞ্জিত গুপ্ত, মিলন সমিতি ক্লাবের বিকাশ রায়চৌধুরী, ইলিসিয়াম ক্লাবের কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জি – এরকম আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে শক্তিশালী একটা দল গড়েছিলেন।

পরপর তিনবার জিততে না পারলেও হাল ছাড়েননি। অদম্য জেদ, ইচ্ছা শক্তি এবং জয়ের তাগিদ সাফল্য এনে দিয়েছিল। ১৯৮৪ সালে অর্থসচিব এবং ১৯৮৫ সালে সাধারণ সচিব পদে নির্বাচিত হলেন। তাঁদের প্যানেলও জিতেছিল।

নির্বাচনের আগে যেমন সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণ করেছেন, সেরকম সচিবের চেয়ারে বসার পরেও। ক্লাবগুলোর সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। সব সময় ক্লাবের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। কারণ তিনি নিজে ক্লাব থেকে উঠে এসেছেন।

আই এফ এ সচিব হিসাবে এমন কয়েকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা আই এফ এ-এর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৯৬ সালে নার্সারি ফুটবল লিগ, মহিলা ফুটবল লিগ চালু করার জন্য বাংলার ফুটবল ছোটকাকার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ইউথ ডেভলেপমেন্ট। একদম গোড়া থেকে ফুটবলার তুলে আনা, যাকে বলে ফুটবলের প্রথম পাঠ। এই ব্যাপারে রাজারহাটে জমিও বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর সফল হল না। প্রশাসক হিসাবে দুটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফুটবলে Class-I এবং Class-II ডিগ্রি তুলে সব দলকে একই মর্যাদা দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত আমার বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ১৯৭৯ সালে সি এ বি-তে একই নিয়ম চালু করেছিলেন।

দ্বিতীয়টি অবশ্যই ১৯৮৬ সালে কলকাতা লিগে মহামেডানের সাসপেনশন। এক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক হয়েছিল। প্রবল চাপও ছিল বিভিন্ন মহল থেকে। সেক্ষেত্রে তিনি অনড় ছিলেন। আসলে কোনওরকম অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতেন না, আপস করতেন না।

আই এফ এ এবং জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব পরিচালনার পাশাপাশি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেও দায়িত্ব সামলেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। একবার ১৯৮০

সালে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কয়েকজন কর্মী অনৈতিকভাবে আন্দোলন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে ছোটকাকা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আন্দোলনকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময়ে ৪৫-এ, রাজা রামমোহন সরণিতে থাকার সুবাদে সেই অসহনীয় দিনগুলোর সাক্ষী ছিলাম আমি।

আই এফ এ প্রশাসনে শুরু থেকেই ঝড় তুলেছিলেন। দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে বিতর্ক হয়েছে। প্রবল বাধা এসেছে, তবু তিনি পিছিয়ে যাননি। কারণ, ছোটকাকার কাছে সবার আগে ছিল আই এফ এ-এর সম্মান ধরে রাখা।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, দীর্ঘকায়, ভারী চেহারা – তার ওপর ব্লাড প্রেসার, হাই সুগার, কোলেস্টেরলের জন্য প্রচুর ওষুধ খেতে হত। তার মধ্যেও নিরলস পরিশ্রম করতেন। যখন প্রয়োজন হত উদয়াস্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন।

জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের সচিব হয়েছেন সাত-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। সেই সময়ে স্পোর্টস ক্লাবের পারফরম্যান্স ভালো ছিল না। ছোটকাকার হাত ধরেই জর্জ আবার ঘুরে দাঁড়ায়। আবার বড় তিন দলের ঘুম কেড়ে নিতে লাগল। তাঁর সময়েই বেশ কয়েকজন ফুটবলার জর্জ থেকে বড় দলে যোগ দিয়েছিল। জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফিতেও সুযোগ পেয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ফুটবলার।

জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আই এফ এ – সর্বত্রই তিনি ছিলেন 'মুশকিল আসান'। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিজের শরীরটাকে সুস্থ করে ফিরতে পারলেন না। শেষ দিকে বেশিরভাগ সময়েই ব্যবসার জন্য দিল্লিতে থাকতেন। ১৯৯৪ সালে অক্টোবরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৫ অক্টোবর আমার সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয়েছিল। পরদিন 'চেক আপ' করার কথা ছিল। বলেছিলেন ১ নভেম্বর কলকাতায় ফিরবেন। কিন্তু শরীর ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। ১৬ নভেম্বর হৃদরোগ জনিত কারণে 'হার না মানা' ছোটকাকা জীবন যুদ্ধে হেরেই গেলেন।

আমাকে বিশ্বাস করতেন। ৩১-এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড-এ ... অ্যাপার্টমেন্টে ছোটকাকার দুটো রেস্তোরাঁ Step up এবং Zinath-এর পাশে আমার রেস্তোরাঁ Super Snax। নিজেরটা চালাবার পাশাপাশি Step-up, Zinath-এর দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। এতটাই বিশ্বাস করতেন।

কালজয়ী

অনির্বাণ দত্ত (জেষ্ঠ্য পুত্র)

ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়লে বাবার মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দিনগুলো আমার জীবনে চিরদিন মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে। কর্মজীবনে তিনি দক্ষ প্রশাসক হলেও বাড়িতে সব সামলাতেন আমাদের মা। তবে বাবা প্রতিনিয়ত নজর রাখতেন। বাবা ছিলেন আমার কাছে বন্ধুর মতো।

লেখাপড়ার দিকটা মা-ই সামলাতেন। বাবা আবার সবসময় বই খাতা নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করতেন না। বাবা ছিলেন বন্ধুর মতো। সেই সুযোগে মাঝেমধ্যে ঢিলেমি দিতাম। মা প্রায়ই নালিশ করতেন। শাস্তিস্বরূপ বাবা একদিন কোলে বসিয়ে আমার সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে বলেছিলেন, 'না, তোর তো লেখাপড়া হবে না। ভাবছি একটা মুদি দোকানের ব্যবস্থা করে দেব।' ব্যস, ওই একটা কথাতেই আমার জেদ চেপে গিয়েছিল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বাজারে তখন প্রথম ৫০০ টাকার নোট চালু হয়েছে। বন্ধুদের কাছ থেকে শোনার পরে নোটটা দেখতে কেমন কৌতূহল হয়েছিল। কারণ ১০০/২০০ টাকার নোট দেখেছি, ৫০০ টাকার নোট আগে কখনও দেখিনি। বাবাকে বলতেই কোনও দ্বিধা না করে ৫০০ টাকার একটা নোট দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫০০ টাকা কীভাবে খরচ করব! গল্পের বই, ড্রইং বই, খাতা, পেন, পেনসিল মিলিয়ে ৫০ টাকার মতো খরচ হয়েছিল। বাকিটা মা-কে ফেরত দিয়েছিলাম। বাবা বাড়ি ফিরে শোনার পরে যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। মা-কে বলেছিলেন, 'ভালো খবর, ভুল সঙ্গে পড়েনি।'

খুবই শৌখিন ছিলেন। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে ছিলেন পরিপাটি। বিশেষ ঝোঁক ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর। বিশ্বকর্মা পুজোর সময়ে বাড়ির ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতেন। আমিও বাবার সঙ্গে ছাদে উঠে তাঁর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতাম। বিশ্বকর্মা পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে থেকে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রস্তুতি শুরু হত। ঘুড়ির সঙ্গে লাটাই, সুতো কেনার পাশাপাশি থাকত ঘুড়িতে মাঞ্জা দেওয়ার ব্যাপারটা। ধারালো সুতোর সামনের দিকে মোম দিয়ে মাঞ্জা দিতেন। তাতে হাত কাটার ভয় থাকত না। ঘুড়ির খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাতের টানে অন্যের ঘুড়ি কেটে 'ভো কাট্টা' বলে তৃপ্তি পেতেন। আসলে তিনি এখানেও হারতে চাইতেন না।

এতটাই খোলামেলা ছিলেন। তবু কখনও যদি অন্যায় করতাম ধমক দিয়ে বলতেন 'তুই করেছিস?' তাতেই চোখে জল এসে যেত। আবার কখনও কোনও

দুষ্টুমি তাঁর কানে যদি যেত তখন নীচ থেকে যদি একটা হাঁক দিতেন 'জ...য়' – ব্যস। আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করত। বিকালে খেলতে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। ব্যাপারটা বাবার ভালোই লাগত।

বাবার কাছেই শুনেছি মাত্র ১২ বছর বয়সে মোটর বাইক চালাতে পারতেন। আমিও তাঁকে অনুস্বরণ করে ১৩/১৪ বয়সেই গাড়ি চালানো প্র্যাকটিস করতাম। সিটে হেলান দিয়ে নীচে পা রাখতাম। পাশে অবশ্য বাবার বিশ্বস্ত 'সারথি' সিপুজান থাকতেন। খবরটা বাবা জানার পরেও রাগ করেননি। আসলে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর আধুনিক।

আর একটা ঘটনা বলছি। কানে 'হেডফোন' লাগিয়ে মাঝেমধ্যে গান শুনতাম। একদিন আমার এক দাদা বললেন, এতে কানের ক্ষতি হতে পারে। ব্যাপারটা পরখ করার জন্য আমার কান থেকে হেডফোনটা খুলে একটু দেখে বললেন, 'কিস্‌সু হবে না, শোন।'

বাইরে থেকে বাবাকে কঠিন মনে হত। কিন্তু আসলে ভিতরটা ছিল কোমল, শিশুর মতো সরল। সবাই তাঁকে জানতেন একজন তেজি, রাগী, সাহসী ব্যক্তি হিসাবে। প্রবল চাপের মুখেও তিনি ছিলেন অনমনীয়। আবার এই মানুষটিই প্রাণখুলে হাসতেন। কীর্তন গাইতেন, ঢোল, সিন্থেসাইজার বাজাতেন। মজার ছড়া লিখতেন। এই দিকটা ছিল তাঁর বিশেষত্ব। এক কথায় তিনি ছিলেন অলরাউন্ডার।

বাবার প্রশাসনিক দিকটা নিয়ে বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। কারণ বোঝার মতো বয়স তখনও হয়নি। তবে এ ব্যাপারে একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, প্রশাসনিক দিকটা ছিল বংশগত। বাবার প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পর্কে জেনেছি নিজে ফুটবল জগতে আসার পরে। অনেকের কাছ থেকে দক্ষ প্রশাসক প্রদ্যুত দত্ত সম্পর্কে জেনেছি। অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন সময়ে বাবা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি অনেক চাপেও তিনি পিছু হটতেন না। মাসতুতো দাদা দীপুদা-র কাছ থেকে শুনেছি বাবার অনুধাবন শক্তি ছিল প্রখর। কঠিন কাজে নামার আগে কী হতে পারে মেপে নিতেন। কোনও স্বার্থ থাকত না বলে সাফল্য পেয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে প্রশাসনে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধান্বিত হলে ভাবি, এক্ষেত্রে বাবা থাকলে কী করতেন? তারপরই সিদ্ধান্ত নিতাম। যদি মনে হত বাবা পিছিয়ে যেতেন তাহলে আমিও এগোবার চেষ্টা করি না।

সবাই যে তাঁকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন সেটা বুঝেছিলাম তাঁর মৃত্যুর পরদিন। ক্রীড়াজগৎ তো বটেই, ক্রীড়া জগতের বাইরেও সহস্রাধিক মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন অন্য জগতের নক্ষত্র। এক কথায় কালজয়ী।

'ইনস্টিটিউটের মূল কেন্দ্র শিয়ালদহ-বৌবাজার অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিলেন। এলাকায় গভীর জনসংযোগ ছিল। অনেকেই দাড় করিয়ে নানা ঘটনা আজও বলেন।

কর্মযোগী

অনিন্দ্য দত্ত (কনিষ্ঠ পুত্র)

বর্তমানে আমি জর্জের মেন ক্যাম্পাস শিয়ালদায় বসছি। এখানকার আশপাশের অনেক মানুষ এখনও বাবাকে ভুলতে পারেননি। এক ডাকে চেনেন গলির মানুষজন। এটাও বলেন যে তাঁর কাছে পাড়ার অনেক সমস্যা নিয়ে মাঝেমধ্যে আসতেন। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের প্রত্যেকের কথা শুনে সেই সমস্যার সমাধান করতেন। স্মৃতিশক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে বছর ঘুরে গেলেও হয়তো কোনওদিন দেখা হলে ঠিক মনে করে একবার জিজ্ঞাসা করে নিতেন, 'কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? হলে জানাবেন কিন্তু'। তাই ছোটবেলা থেকে এই জনসংযোগের ফলেই হয়তো বাবা এখন পাশে না থেকেও আজও প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক বা ময়দান— প্রত্যেকটা জায়গার উনি স্মৃতিগুলো রেখে গেছেন। একটা কথা আছে না যে, মানুষ থাকে না শুধু রয়ে যায় তাঁর কাজ। আমার বাবা এই কথাটার উদাহরণ। মানুষটি চলে যাওয়ার পরেও তাঁর কাজগুলো মানুষের মনের মণিকোঠায় আজও থেকে গিয়েছে। আমরা যে এখন আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এত রকমের বিষয় পড়াশোনা করাচ্ছি তারও বীজ বপন করেছিলেন তিনি। যুগোপযোগী কোর্সের পরিবর্তন করেছেন এবং এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে জর্জকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা সেটা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত এবং সেই জন্যেই তাঁকে জর্জের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। একটা মানুষ দীর্ঘদিন যেরকম দক্ষ ক্রীড়া-প্রশাসক হিসেবে ময়দান সামলেছেন ঠিক সেরকম সকলের প্রিয় রেজিস্ট্রার হিসেবে জর্জ টেলিগ্রাফকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। ভোজন রসিক, আড্ডা প্রেমী যেরকম ছিলেন সেরকম ছিলেন একজন কর্মযোগী। বাবার কাজের পরিধি এতটাই যে স্বপ্নের মধ্যেও সেই কাজগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আমার দাদাকেও দেখছি বাবার পথ অনুসরণ করেই কাজ করতে। যে ব্যপ্তিতে আমার বাবা নিজের কাজগুলো করে গেছেন, আমার দাদা বর্তমানে সেভাবেই কাজ করে চলেছেন। মনে হয় এদের কাজের সামান্য অংশও করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

বাবা প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯৪ সালের ১৬ নভেম্বর। আমার বয়স তখন মাত্র

৯ বছর। তাই বাবার কর্মকাণ্ড বোঝার মতো বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। তবে দেখতাম নীচের অফিস ঘরে অনেকেই আসতেন। তাঁদের আলোচনা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান বাবার জীবনটাই গল্পের মতো। খুবই অল্প সময়ে কাছে পেলেও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আমি ছোটবেলায় একটু চঞ্চল ছিলাম। তাই একটু সুযোগ পেলেই অফিস ঘরে ছুটে যেতাম। তারপর বাবা যখন অফিসে যেতেন তখন একটু মন খারাপ হত। কখন ফিরবেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। দুষ্টু ছিলাম। তবু কখনও গায়ে হাত দিতেন না।

জর্জ টেলিগ্রাফের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ছোটকাকা

গোরা দত্ত (ভাইপো)

অতীতে যেমন সুন্দর দিন কাটিয়েছি তেমনি খারাপ দিনও দেখেছি। ছোটকাকার (প্রদ্যুত দত্ত) থেকে আমি আট বছরের ছোট। রাজনৈতিক কারণে যখন আমাদের জর্জ টেলিগ্রাফের অচলাবস্থা শুরু হয়েছিল তখন ছোটকাকা হাল ধরেছিলেন। হাজারো রকম সমস্যা। মামলাও শুরু হয়েছিল। তখন আমাদের দত্ত পরিবারের পারিবারিক ব্যবসা (জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট) বন্ধ প্রায়। সেই জায়গা থেকে ছোটকাকা লড়াই করে সব সমস্যার সমাধান করে ফের জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমাদের পিতামহ হরিপদ দত্ত জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ছোটকাকার নাম নিঃসন্দেহে বলতে পারি। ওই সময় খুব কাছ থেকে ছোটকাকার সাহস, ইতিবাচক মনোভাব এবং নিজের প্রতি সফল হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেখেছিলাম।

তিনি সব সময় আমাদের জর্জের স্টাফেদের পাশে থাকতেন। কাকা ছিলেন জর্জের রেজিস্ট্রার। একদিন হয়েছে কি, তিনি শুনলেন, স্টাফদের নির্দিষ্ট দিনে মাইনে হয়নি। ডেকে পাঠালেন আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিহিরবাবুকে। কাকা উত্তেজিত। টেবলের কাচে নিজের হাতের চাপড় মেড়ে জানতে চাইলেন, ঠিক সময়ে স্টাফদের কেন মাইনে হয়নি? টেবলের কাঁচ ভেঙে গেল। স্টাফদের জন্য এতটাই যত্নবান ছিলেন তিনি। বাইরে থেকে কাকাকে দেখলে মনে হবে রাগী মানুষ। কিন্তু তাঁর ভিতরটা আলাদা। একেবারে উলটো। কত জনকে যে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সাহায্য করে কাউকে বলতেন না। জীবনের ভ্যাল্যুজগুলোকে সঠিক ভাবে মানতেন। যখন কঠোর হওয়ার প্রয়োজন তখন কঠিন হয়েছেন। আবার যখন নরম হবার প্রয়োজন তখন তাঁর মানবিক রূপটা সামনে এসেছে। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

কাকার ক্রিয়েটিভিটিই আমাকে বেশি করে আকর্ষণ করত। তিনি বাঁধাধরা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কখনও কাজ করেননি। প্রকৃত অর্থেই কাকা ছিলেন খুব দক্ষ সংগঠক। যে ভালো সংগঠক তাকে যে কাজই দেওয়া হোক না কেন, সফল হবেই।

কাকার সঙ্গে আমার কৈশোর সময়টা বেশি কাটলেও আমাকে কখনও গড়ের মাঠ টানেনি। আমি বরাবর পড়াশোনা নিয়েই থাকতাম। জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটে এখন একটা পদে থাকলেও একটা সময় অন্য কোম্পানিতে চাকরি করেছি। কিন্তু কাকা যখন গড়ের মাঠের লোকজনদের নিয়ে আড্ডা মারতেন, খেলাধূলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন তখন কিন্তু আমি সেই আড্ডায় থাকতাম। কাজেই সেই সময়কার কিছু ক্লাব কর্তাদের চিনতাম, জানতাম। পরবর্তীকালে কাকা আই এফ এ-এর সচিব হলেন। যথারীতি তিনি বিরাট সাফল্যও পেলেন। এই সাফল্য পেতেও ছোটকাকাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। আসলে তাঁর হার না মানা ইচ্ছেটাই ছিল বড় শক্তি। সততার সঙ্গে কাজ করতেন। আজ আমার ভাবতে ভালো লাগে প্রদ্যুত দত্ত আমার ছোটকাকা। তাঁকে নিয়ে গর্ব হয়।

কাকাকে নিয়ে আমার কত স্মৃতি। লিখতে গেলে লেখার শেষ হবে না। আমরা যখন শিয়ালদহের সার্পেন্টাইন লেনে থাকতাম তখন ছোটকাকার সঙ্গেই আমার সময় কেটেছে বেশি। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। কাকার গানে ভীষণ অনুরাগ ছিল। প্রায় তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড কিনতেন। রেকর্ড কিনতে যাওয়ার আগে আমাকে বলতেন। মাঝেমধ্যে আমিও সঙ্গে যেতাম। একদিন বললাম, এই রেকর্ডটা ভালো হয়নি। গানটা তেমন ভালো নয়। তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডটা ভেঙে দিলেন। এমনই মানুষ ছিলেন। কালীপুজোর সময় বাজি ফাটানোর ব্যাপার ছিল। ছোটকাকা তাঁর বন্ধু মলয়কাকাকে নিয়ে তুবড়ি বানাতেন। শিয়ালদহর বাড়ির উঠোনটা বেশ বড়। সেখানে বড় বড় শিল-নোড়া দিয়ে তুবড়ির মশলা তৈরি করতেন কাকা। সে এক অদ্ভুত আয়োজন। উঠোনে খেলাও হত। শিয়ালদহ থেকে ভবানীপুর গেলাম। তখনও সব একসঙ্গে থাকতাম। ভবানীপুরের বাড়িটা যখন সংস্করণের জন্য কাজ শুরু হল তখন নিজের নিজের মতো করে আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করে থাকা শুরু হল। তখন থেকেই ছোটকাকার সঙ্গে যোগাযোগটা একটু কমে গেল। কাকাও ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবুও আমি মাঝেমধ্যে কাকার কাছে চলে যেতাম। ফিরে পেতাম আগের মতোই কাকার স্নেহ, ভালোবাসা, পরামর্শ। আজও মিস করি। মিস করি আমার প্রিয় ছোটকাকাকে।

জর্জ জিতলে রোল খাওয়াতেন

অতীন দত্ত (ভাইপো)

ভবানীপুরে ৩১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের বাড়িতে যারা কখনও গেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে বাড়িতে ঢোকার পথেই ছিল কংক্রিটের বিশাল উঠান। আয়তনে বেশ বড় ছিল বলে ওই উঠানে বন্ধুদের নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই আমি ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতাম। এই ব্যাপারে মদত দিতেন আমাদের সবার প্রিয় ছোটকাকা – প্রদ্যুত কুমার দত্ত।

আমাদের মনের মতো ছিলেন তিনি। উঠানের পাশেই ছিল বিশাল ড্রইংরুম। আমরা যখন খেলতাম তখন ড্রইংরুমের সব জানালা-দরজা বন্ধ রাখতে বলতেন ছোটকাকা।

খেলার সময়ে ছোটকাকা আমাদের সঙ্গে থাকতেন। নিজে খেলতেন না। আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতেন। গাইড করতেন। এককথায় কোচের ভূমিকা পালন করতেন। অর্থাৎ আমাদের খেলার ব্যাপারে বড় ভরসা ছিলেন ছোটকাকা।

বাড়ির পূর্বদিকে নীচের তলায় থাকতেন জর্জ টেলিগ্রাফের বেশ কয়েকজন ফুটবলার। বিভু চক্রবর্তী, শিবব্রত নাথ, বিপ্লব মজুমদার সেখানে থাকতেন। তাঁরা মাঝেমধ্যে আমাদের খেলা শেখাতেন। যা দেখতে মাঝেমধ্যে রাস্তায় ভিড় জমে যেত। বিভু চক্রবর্তী অনেক সময় বলতেন 'আমাকে কাটিয়ে যাও দেখি।' ছোটকাকা তখন দোতালার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন। আমরা কখনও সফল হলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সজোরে বলতেন, 'দারুণ, দারুণ।' বিভুদা ক্রিকেটও খেলতেন। আমাদের হাতে ধরে খেলা শেখাতেন। কোনও ভালো শট নিলে বা বল করলে উৎসাহিত করার জন্য বলতেন – 'নাইস, বিউটিফুল।'

সারাক্ষণ বইয়ের সামনে বসে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। খেলাধুলো, শরীরচর্চা করলে শরীর ও মন ভালো থাকে। তখন লেখাপড়াতেও 'এনার্জি' আসে। ছোটকাকার জীবনদর্শন ছিল এরকম। মানুষের জীবন হল খেলার মাঠের মতো। ছোটকাকার সৌজন্যে আমাদের গোটা পরিবারটি হয়ে গিয়েছিল খেলার মাঠ। সেই সূত্রে ফুটবলাররাও আমাদের পারিবারিক সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন।

ময়দানে প্রথম খেলা দেখতে গিয়েছিলাম ছোটকাকার সঙ্গেই। খেলা অবশ্যই ছিল জর্জ টেলিগ্রাফের। জর্জ জিতলে ফেরার পথে নিজামের রোল খাওয়াতেন। জিততে না পারলে মন ভালো থাকত না। তখন আর নিজামের রোল নয়। হেস্টিংসের হনুমান মন্দিরের পাশের দোকান থেকে ছোলা খেয়ে ঘরে ফিরতে হত।

মুশকিল আসান

সুব্রত পাল (শ্যালিকা পুত্র)

সেদিন বিকেলে ছিল কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল-জর্জ টেলিগ্রাফের ম্যাচ। তখন শিয়ালদহর সার্পেনটাইন লেনের বাড়িতে বাস ছিল দত্ত পরিবারের। একান্নবর্তী পরিবার। সেই দিনের বিকেলে বাড়িতে গাড়ি ছিল না। ম্যাচের সময় এগিয়ে আসছে। গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন দত্ত পরিবারের সব থেকে ডাকাবুকো, সাহসী কলেজ পড়ুয়া যুবক। তাড়াহুড়ো করে ধর্মতলাগামী ভিড় ট্রামে উঠে পড়লেন। প্রাচী সিনেমা হাউসের কাছে ট্রাম থেকে পড়ে গেলেন দত্ত পরিবারের ছোট ছেলে দুলু। এমন ভাবে পড়েছিলেন যে ট্রামের চাকা তাঁর পায়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর বাঁ পা টা বাঁচানো যায়নি। অস্ত্রোপচার করে হাঁটুর নীচের অংশটা বাদ দিতে হয়েছিল। দত্ত পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন দুলুর কেরিয়ারটাই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি সবাইকে ভুল প্রমাণ করেছিলেন। মনে জোর, ইচ্ছে, লক্ষ্য এবং ধৈর্য থাকলে কোনও কিছুই যে অসম্ভব নয়, তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একটা কৃত্রিম পা নিয়ে পড়াশোনা শেষ করলেন, পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকলেন। তারও পরে ঢুকে পড়লেন পারিবারিক ক্লাব ফুটবলের প্রশাসনে। তারও পরে বাংলার ফুটবলে আনলেন নবজাগরণ। বাংলার ফুটবল যতদিন থাকবে প্রদ্যুত দত্তর নামটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ময়দান, জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব ও আই এফ এ

পড়াশোনা শেষ করে প্রদ্যুত দত্ত যোগ দিয়েছিলেন পারিবারিক ব্যবসা জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। একই সঙ্গে ময়দান করাও শুরু করে দিয়েছেন। আসলে দত্ত পরিবারের সদস্যদের রক্তে জর্জ টেলিগ্রাফ। এই সংস্থার সঙ্গে গোটা দত্ত পরিবারেরই নাড়ির সম্পর্ক। শিয়ালদহর সার্পেনটাইন লেন ছেড়ে ততদিনে ভবানীপুরের ইন্দিরা সিনেমা হাউসের পাশে দত্ত পরিবারের বাড়ি। প্রদ্যুত দত্ত সকালে শিয়ালদহর জর্জ অফিসে চলে যেতেন। সারাদিন কাজ করার পর বিকেলে পৌঁছে যেতেন ময়দানে – জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব তাঁবুতে। কিছু ক্লাব কর্তা আসতেন, ফুটবল নিয়েই আলোচনা। চুটিয়ে ক্লাব করছেন। মাঠে তখন সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন শতদল গুপ্ত (বাচ্চু), হারাধন চ্যাটার্জি, পুটেদা, বীরজিৎরা। বাড়ি ফিরতেন রাতে।

এই ছিল তাঁর নিত্যদিনের রুটিন।

দলবদলের সময় এলে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের পাশে মোহন বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি কলকাতার নামকরা সব সংগঠনকে গাড়ি ভাড়া দিতেন। ঠিক দলবদলের আগে প্রদ্যুত দত্ত সেই মোহনের কাছে চলে গিয়ে তিন থেকে চারটি গাড়ি ভাড়া করতেন। ফুটবলার তুলে আনার জন্য দায়িত্ব ভাগ করে দিতেন। তিনি নিজে দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ফুটবলার খুঁজে নিয়ে এসে জর্জে সই করাতেন। বিশ্বাস করতেন, জেলা থেকে ফুটবলার তুলে না আনলে কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলাররা বাঁচবে না।

সাতের দশকের শেষের দিক। অশোক ঘোষ তখন আই এফ এ সচিব। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবে ততই যেন আই এফ এ-র বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠতে শুরু করল। ওই সময়ে বাংলার ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে যেমন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও কালীঘাট ক্লাবে ময়দানের বিভিন্ন ক্লাব কর্তাদের 'ঠেক' বসত, তেমনি বাংলার ফুটবল নিয়ে ক্লাব কর্তাদের আড্ডা বসত জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে। প্রসঙ্গত, সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র অনির্বাণ দত্ত। যাইহোক, সেই সময়ে একাধিক কর্তা তাঁর কাছে আই এফ এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করতেন। ঠিক করলেন, আর বসে থাকলে চলবে না।

একদিন, পান্নালাল চ্যাটার্জিকে ডেকে বললেন, 'আইএফ এ-এর অ্যানুয়াল রিপোর্ট বুকটা নিয়ে আমার বাড়িতে আসুন।' ওই সময়টা তিনি থাকতেন লেক রোডের কমলা গার্লস কলেজের কাছেই। পান্নালাল চ্যাটার্জি একদিন আই এফ এ-এর অ্যানুয়াল বুকটা নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন রঞ্জিত গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোককে। রঞ্জিতবাবু পোর্ট ট্রাস্টে উঁচু পদে চাকরি করতেন। ফুটবলটা ভালোবাসতেন। আর নিয়ম-কানুনটাও অনেকের থেকেই বেশি বুঝতেন। তাঁকে প্রয়োজন হতে পারে বলেই সেদিন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন পান্নালালবাবু। সেদিন, পান্নালাল ও রঞ্জিত গুপ্তর কাছে ময়দানের ভোটের অঙ্কটা বুঝতে চাইলেন। সব শুনে এ বার তৈরি হতে হবে।

আই এফ এ-তে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। ময়দানের সমস্ত ক্লাব কর্তার সঙ্গে নিয়ম করে যোগাযোগ শুরু করে দিলেন। প্রত্যেক ক্লাবে গিয়ে কর্তাদের সঙ্গে মিটিং করাও শুরু হল। কয়েক মাস ধরে এটাই চলতে থাকল। এর ফলে বেশ কিছু ক্লাব হাতে চলে এল। কলকাতা ময়দানের পাশাপাশি তিনি জেলার কর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা শুরু করলেন। মাঝেমাঝেই জেলা সফরে চলে যেতেন। তাঁর এই কঠিন পরিশ্রম বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থার একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হল। ওই মুহূর্তে প্রদ্যুত দত্তই হয়ে উঠলেন আই এফ এ-এর শাসক গোষ্ঠীর অলিখিত বিরোধী দলের নেতা। ততদিনে খবরটা পৌঁছে গিয়েছে দাদা বিশ্বনাথ দত্তর কাছেও। দাদার গোষ্ঠীর

প্রতিনিধি হিসেবে আইএফএ-এর সচিব তখন অশোক ঘোষ। সালটা ছিল ১৯৭৯। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালের ১৮ জুলাই সচিবের মেয়াদ শেষ করলেন অশোক ঘোষ। তাঁর জায়গায় সচিব হয়ে আইএফ এ-তে এলেন অশোক মিত্র। ১৯৮১ সালে নির্বাচনের জন্য ঝাঁপালেন। কিন্তু সেই বছর নির্বাচন হল না। তাঁকে দেওয়া হল স্ক্রুটিনাইজারের পদ। অ্যাকাউন্টসের যাবতীয় বিল খতিয়ে দেখার সুযোগ পেলেন। আর সেটা করতে পেরে আইএফ এ-এর আর্থিক চেহারাটা তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। স্ক্রুটিনাইজ করতে গিয়ে বহু ভুয়ো বিল ধরে ফেললেন। এই বিষয়গুলি সব মিটিংয়ে তুলতেন। এই স্ক্রুটিনাইজার হয়ে তাঁর অনেকটাই সুবিধা হয়ে গেল। তিনি এই পদে দু'বছর ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রথম আইএফএ সচিব নির্বাচনে লড়াইয়ে নামলেন, কিন্তু হেরে গেলেন। ১৯৮৪ সালে আইএফএ-এর ট্রেজারার পদে বসেন।

এ যেন সেই স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও মাকড়সার জাল বোনার সাফল্যের ঘটনা। বানুকবার্নের যুদ্ধে একাধিকবার মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় এডুয়ার্ড ও স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস। কিন্তু বারবার হেরে যাচ্ছিলেন রবার্ট ব্রুস। একবার সব কিছু হারিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন পরাজিত রাজা ব্রুস। গুহায় বসে একদিন দেখলেন, একটি মাকড়সা বাতাসের মুখে জাল বুনতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিল। কিন্তু মাকড়সাটি হল ছাড়েনি। জাল বোনার চেষ্টা করেই যাচ্ছিল। একটা সময় জাল বুনতে সক্ষম হল। এই ঘটনা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠিত হয়ে ফের যুদ্ধে নামলেন। সেই যুদ্ধে নেমে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন রবার্ট ব্রুস। তিনিও কি এই ঘটনা থেকেই ময়দানেই 'যুদ্ধে' বারবার লড়াই করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? জানা যায়নি। কিন্তু তৃতীয়বার 'যুদ্ধে' নামার আগে যেন আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।

সালটা ছিল ১৯৮৫। আই এফ এ-এর নির্বাচন। এ বার পুরোপুরি তৈরি। কোনও কিছুই হালকা ভাবে নিচ্ছিলেন না। প্রয়োজনে দাদা বিশ্বনাথ দত্তের গোষ্ঠীর একটি নিশ্চিত ভোটারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। ঘটনাটি হল, গ্রিয়ার ক্লাবের অন্যতম কর্তা হারাধনদা ডেডিকেটেড টু বিশ্বনাথ দত্ত। ওই ভোটটা কিছুতেই পাবেন না, তাহলে উপায়? ওই ভোটটাকে অফ করে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

ভোটের আগের দিন রাতে গ্রিয়ার ক্লাবের কর্তা হারাধনবাবুর বাড়িতে হাজির তিন যুবক। তাঁরা গিয়ে বলেন, 'বিশুদা পাঠিয়েছেন। দাদার কাছে খবর আছে প্রদ্যুত দত্তর লোকেরা আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে। বিশুবাবুর নির্দেশ, আপনাকে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' হারাধনবাবু তিন যুবকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। উঠলেন একটি হোটেলে। তাঁকে জামাই আদরে রাখা হল। পরের দিন ভোট। অথচ হোটেল থেকে বেরতেই পারলেন না। ভোট পর্ব শেষে

হারাধনবাবুকে সম্মানের সঙ্গে বাড়ি পৌঁছে দেন সেই তিন যুবক। সেইদিনের বিকেলেই হারাধনবাবু বুঝে গিয়েছিলেন, বিশুবাবু নয়, তাঁকে কৌশলে কিডন্যাপ করেছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। দলবদলে ফুটবলারদের তুলে আনার বহু ঘটনা আছে। কিন্তু কর্তাদের কিডন্যাপ, তাও আবার নির্বাচনের আগে কখনও শোনা যায়নি। পরেও শোনা যাবে না। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ওই নির্বাচনে জিতে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। বসে ছিলেন আইএফএ সচিবের চেয়ারে।

সচিব হয়েই দাদাকে প্রণাম

সচিবের চেয়ারে যেদিন বসবেন সেই দিন সকাল থেকেই জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব তাঁবুতে যেন বিয়েবাড়ির আমেজ। উৎসবের আবহাওয়া। জোর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। আলোর রোশনাইয়ে আলোকিত করার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত গোষ্ঠীর লোকেরা। সেদিন আইএফ এ অফিস যাওয়ার আগে তিনি এসব উৎসব করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সেদিন জর্জ ক্লাব তাঁবুতে হঠাৎ বিকট শব্দ। সব কিছু লন্ডভন্ড। তাঁবুতে পড়ে আছে দু-দুটি লাশ। মুহূর্তের মধ্যে গোটা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল খবরটি। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তিনি। জানা যায়, আতশবাজি তৈরি করতেই এই বিস্ফোরণ। সব কিছু সামলে নিয়ে সেই রাতেই ছুটলেন নিজের দাদা বিশ্বনাথ দত্তর কাছে।

প্রদ্যুত দত্ত– 'দাদা, ক্লাবের দুর্ঘটনার কথা শুনেছ তো?'

বিশ্বনাথ দত্ত — 'হ্যাঁ, শুনেছি। তোমার মতো করে বিষয়টা দেখে নাও।'

প্রদ্যুত দত্ত — (প্রণাম করে বললেন) – 'আজ সচিবের দায়িত্ব নিলাম। আশীর্বাদ করো।'

বিশ্বনাথ দত্ত — গড ব্লেস ইউ।

আই এফ এ ও প্রদ্যুত দত্ত (১৯৮৫-১৯৯৪)

আই এফ এ সচিবের চেয়ারে বসে ফুটবলে আমূল পরিবর্তন আনলেন তিনি। দাদা বিশ্বনাথ দত্ত যদি আইএফ এ-এর ভিত শক্ত করে থাকেন, তাহলে সমাজে এই সংস্থাকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। বাংলার ফুটবলে ঘটালেন নবজাগরণ। তাঁর কাজের উল্লেখযোগ্য দিক হল এই রকম –

১) বাংলার ফুটবলে তিনিই প্রথম স্পনসর (চার্মস, ফিলিপস ও লাইফবয়) এনেছিলেন। মমতা ব্যানার্জির সাহায্যে আইএফ এ-তে প্রথম চার্মস কোম্পানিকে এনেছিলেন। এজন্যও তাঁকে সমালোচিতও হতে হয়েছিল। চার্মস কোম্পানিকে স্পনসর করে আনার পরের দিন বাংলার জনপ্রিয় কাগজে সেই রিপোর্টার লিখেছিলেন, 'আই এফ এ–কে বিক্রি করে দিলেন প্রদ্যুত দত্ত।' কিন্তু সময়ের

থেকে একটু এগিয়েই ভাবতেন তিনি। আজ প্রমাণিত, স্পনসর ছাড়া কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। যা তিনি গত ৩৫ বছর আগে প্রদ্যুত বুঝেছিলেন।

২) সুষ্ঠুভাবে ভালো ফুটবলার তুলে আনতে গেলে একটা ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রয়োজন। সেটা বুঝেছিলেন তিনি। বাংলার রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার সচিব হিসেবে তিনিই প্রথম ফুটবল অ্যাকাডেমি শুরু করেছিলেন। হাওড়া ইউনিয়নের সাহায্যে ও পিয়ারলেসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে এই অ্যাকাডেমিটাকে ভাইপো সুব্রত দত্ত হলদিয়ায় নিয়ে গিয়ে নতুন করে শুরু করেছিলেন।

৩) ময়দানের কলকাতা লিগ খেলায় সব ক্লাবকে সমান অধিকার দিয়েছিলেন।

৪) দলবদলে ফুটবলারদের টোকেন চালু করেছিলেন তিনিই।

৫) লিগ ম্যাচের সময় মাঠে অ্যাম্বুল্যান্স, ওয়াকিটকি ও জলের ব্যবস্থা প্রথম শুরু করেন।

৬) আই এফ এ থেকে প্রথম নার্সারি ফুটবল লিগ, মহিলা ফুটবল লিগ ও সাবডিভিশন ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু করেন তিনি।

৭) ওই সময় ময়দানের অনেক ছোট ক্লাব ছিল, যাদের ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য জায়গা ছিল না। বিভিন্ন ক্লাব তাঁবুতে সেই ছোট ক্লাবগুলোকে ড্রেস চেঞ্জ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

৮) বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে সবুজ বাঁচাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছিলেন তিনি। মমতা ব্যানার্জিকে সঙ্গে নিয়ে, সমাজের সকল স্তরের মানুষদের শামিল করিয়ে বিরাট আন্দোলন করে রবীন্দ্র সরোবরকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

৯) ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে তাঁর অন্যতম সাফল্য শিলিগুড়িতে ফুটবল স্টেডিয়াম গড়া ও নেহরু কাপ আয়োজন।

১০) বাংলা দল সন্তোষ ট্রফি খেলতে যাবে। দলের প্রত্যেক ফুটবলারের জন্য ড্রেস কোড থাকতে হবে। ব্লেজার পরে খেলতে যাবে। প্রসঙ্গত, প্রথম বাংলা দলকে ফ্লাইটে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

নেহরু কাপ, সুভাষ চক্রবর্তী ও আই এফ এ অফিস বন্ধক রাখা

দক্ষিণ কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলের ঠিক পাশেই বিশাল বাড়ি। নামফলকে লেখা — জয়ন্ত রায়। তখন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত। তো সেই জয়ন্ত রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আত্মীয়) বাড়ির সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আর সেই বাড়ির বিপরীতে (রাস্তার ওপারে) একটি গাড়িতে টেনশন নিয়ে বসে আছেন আইএফ এ-র তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত দত্ত। তিনি অপেক্ষা করে বসে আছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্য। কারণ, কিছুদিন পর শিলিগুড়িতে শুরু হওয়ার কথা নেহরু কাপ।

রাজ্যের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নানান 'প্যাঁচের খেলায়' আই এফ এ তখনও নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পায়নি। সময় কমে আসছে। জ্যোতি বসু ছাড়া আর কোনও গতি নেই বুঝেই সেদিন তাঁর ওই রাতে রাস্তায় অপেক্ষা। সেদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর নির্দেশে পরের দিন রাইটার্সে গিয়ে নেহরু কাপ আয়োজনের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছিলেন।

আই এফ এ-এর আপসহীন, ডাকাবুকো সচিব প্রদ্যুত দত্তর উপর নিজের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। এক কথায় আই এফ এ দফতরটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। ফুটবল বিষয় নিয়ে তাঁকে একদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটান্ডায় মিটিংয়ে ডেকেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। ওই মিটিংয়ে মন্ত্রীর মুখের উপর বলেছিলেন, সুভাষের দাবি তিনি মানতে পারবেন না। তিনি আগে আই এফ এ-এর স্বার্থ দেখবেন। ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী অবশ্য বিষয়টা ভালোভাবে নেননি। তারপর থেকেই মন্ত্রী সুভাষের সঙ্গে আই এফ এ-এর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। যে কারণে নেহরু কাপ আয়োজন করতে গিয়ে হাজারো সমস্যার মুখে পড়তে হয় আই এফ এ-কে। আর এর পিছনে নাকি সুভাষ চক্রবর্তীর 'কালো হাত' সক্রিয় ছিল। এই সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্য নেহরু কাপ করতে আই এফ এ-এর ক্ষতি হয়েছিল ২৭ লক্ষ টাকা।

নেহরু কাপ আয়োজন করার জন্য বিভিন্ন স্পনসরের সঙ্গে কথা বলা শুরু হল। শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেল আই এফ এ-এর একটা বড় টিম। সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সহযোগিতার আবেদন করল আই এফ এ। একাধিক চা বাগানের মালিক আর্থিকভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু শিলিগুড়ির সিপিএম পার্টির কয়েকজন ছাড়া একটা বড় অংশ চূড়ান্তভাবে অসহযোগিতা করল। ফলে একাধিক স্পনসর পিছিয়ে গেল। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও একটা মোটা টাকার স্পনসরের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন শিলিগুড়ির ফোসিন থেকে (FEDERATION OF CHEMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY)।

শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক সংগঠন ফোসিন থেকে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখানেও বাধা। এই স্পনসর, নেহরু কাপ নিয়ে উত্তরবঙ্গের এক জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়। খবরটা প্রকাশ হতেই ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তাঁর ঘনিষ্ঠ আশু করকে দিয়ে খবর পাঠালেন, প্রকাশিত খবরের প্রেক্ষিতে তিনি যেন একটা রিজয়েন্ডার দিয়ে বলেন, 'আমি কিছুই বলিনি।' রিজয়েন্ডার না দিলে কিন্তু ফোসিনের টাকা দেওয়া যাবে না। আটকে যাবে। এই ঘটনা জেনে গিয়েছিলেন প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাংবাদিক। খবরটি পেয়েই তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়ে সাংবাদিকটি বলেন, প্রদ্যুতবাবু যদি রিজয়েন্ডার দেন, তাহলে

তাঁর (সাংবাদিকটির) চাকরি চলে যাবে। সেই সাংবাদিকটিকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'তুমি অফিসে যাও। নিজের মতো কাজ করো। চিন্তা করো না।' শেষ পর্যন্ত রিজয়েন্ডার দেননি। টাকার অভাবে নেহরু কাপ আয়োজন করা প্রায় অসম্ভব। তখন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে আই এফ এ অফিসকে বন্ধক রেখে নেহরু কাপ আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আই এফ এ সভাপতি জাস্টিস অজিত সেনগুপ্তর সাহায্য নিয়ে ব্যাঙ্কের সুদ মকুব হলে আই এফ এ অফিস বন্ধক মুক্ত হয়।

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ করার আগে পূর্ণাঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম করেছিলেন এই প্রদ্যুতবাবুই। অতীতে শিলিগুড়িতে কোনও স্টেডিয়াম ছিল না। এখন যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামটি আছে সেটা ছিল খোলা মাঠ। নাম ছিল 'তিলক ময়দান'। সেনাবাহিনীর মাঠ। ১৯৭৬–'৭৭-এ ঠিক হয় এই জায়গায় স্টেডিয়াম গড়া হবে। সেই সময় ডিফেন্স মিনিস্টার বংশীলালের অনুমতিও পাওয়া গেল। অনুমতি দিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও। একটি কমিটি গড়া হল। ১৯৮০ সালে মাঠের একটা অংশে গ্যালারি করা হয়। তারপর আর কোনও কাজ এগোয়নি। প্রদ্যুত দত্ত শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ করবেন সেটা কয়েক মাস আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। দরকার ছিল একটা স্টেডিয়াম। ১৯৮৫ সালে শিলিগুড়ির মেয়র বিকাশ ঘোষের সাহায্য ও প্রদ্যুত দত্তর উদ্যোগে তৈরি হল আজকের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম।

পরবর্তীকালে এই সুভাষ চক্রবর্তী প্রায়ই ফোন করতেন। দুজনের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই নিজের বাড়িতে ডাকতেন সুভাষবাবু। গল্প করতেন। আসলে তিনিও বুঝেছিলেন, প্রদ্যুত দত্ত নিখাদ ফুটবলটাকে ভালোবেসেই সব কিছু করেছেন। শেষ দিকটায় সুভাষ নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর থেকেই খুবই ভালো সম্পর্ক হয়। সুভাষবাবুও আর কখনও অন্যায় আবদার করেননি।

মহামেডান স্পোর্টিং ইস্যুতে জ্যোতি বসুর বার্তা – 'গো অ্যাহেড'

বাড়িতে একদিন হঠাৎ পুলিশ। কালীঘাট থানার ওসি জানালেন, 'রাইটার্স থেকে অনেকবার অফিসে ফোন করেছে। কিন্তু আপনাকে পাওয়া যায়নি। সিএম আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আগামিকাল সকাল দশটার মধ্যে সিএম-এর বাড়িতে যেতে বলেছেন।'

পরের দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাসভবনে পৌঁছে গেলেন। তখন জ্যোতিবাবু থাকতেন রাজ্যপাল ভবনে। পৌঁছতেই মিষ্টি মুখ করানো হল। একটু পরেই স্নান সেরে ঘরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পরনে লুঙ্গি ও ফতুয়া। এসেই তিনি মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গণ্ডগোল নিয়ে শুনতে চাইলেন। সব ঘটনা খুলে বলা হল। কয়েক বছর ধরেই কারণে-অকারণে

আই এফ এ-এর উপর চাপ সৃষ্টি করছে মহামেডান। ক্রীড়াসূচি থেকে শুরু করে বেশি সংখ্যার টিকিট চাওয়া — নানান অন্যায় আবদার লেগেই আছে। এ বার ম্যাচ চলাকালীন টিমই তুলে নিয়ে আই এফ এ-এর নিয়মকে অপমান করেছে। সব ঘটনা শুনে জ্যোতি বসু বললেন, 'সবই ঠিক আছে। কিন্তু মিস্টার দত্ত, আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ধরে রাখতে পারবেন তো?' উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, 'আপনার আশীর্বাদ চাই।' একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিবাবু বললেন, 'গো অ্যাহেড।'

আর পিছনে তাকাননি, ভাবেননিও। সংস্থার সংবিধান মেনে, প্রস্তুতি নিয়ে, মহামেডানকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। ঠিক তখনই রাজ্যের তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসান (আই এফ এ-এর পেট্রন-ইন-চিফ) আই এফ এ-কে একটি চিঠি দিয়ে জানালেন, এবার থেকে আই এফ এ-এর পেট্রন-ইন-চিফ পদে তাঁর নাম যেন ব্যবহার করা না হয়। অতি শীঘ্রই যেন আই এফ এ-এর প্যাড থেকে রাজ্যপালের নাম বাদ দেওয়া হয়। রাজ্যপালকে অনুরোধ তো করলেনই না, বরং কাল বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে নুরুল হাসানের নাম বাদ দিয়ে আই এফ এ-এর নতুন প্যাড তৈরির নির্দেশ দিলেন। আসলে মহামেডান ইস্যুতে রাজ্যপালও বহুবার অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধ না শোনায় আই এফ এ-এর পেট্রন-ইন-চিফ পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পাল্টা চাপ দিতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু রাজ্যপাল নূরুল হাসান সেই সুযোগটাই আর পেলেন না। বলা ভালো, আই এফ এ-এর সচিব হিসাবে সুযোগটাই আর দেননি। অর্থাৎ মহামেডান স্পোর্টিংকে সাসপেন্ডই হতে হল। ওই সময় বাংলার ফুটবলে সেই টিমকে সাসপেন্ড করা মুখের কথা নয়। সব সুপারিশ যখন ব্যর্থ তখন পথে নামলেন মহামেডান ক্লাবের কর্তারা।

আই এফ এ-এর স্টাফরা টেনশনে চুপ করে বসে আছেন। একটু আগেই খবর এসে পৌঁছে গিয়েছে, বিশাল বাহিনী নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে আসছেন মহামেডান স্পোটিং ক্লাবের সচিব মীর মহম্মদ ওমর। এই কর্তাটি কলকাতার অন্ধকার জগতের তখনও বেতাজ বাদশা। মন্ত্রী-সান্ত্রীর সুপারিশ ব্যর্থ। বাধ্য হয়ে নিজেই মাঠ ও মাঠের বাইরের লোক নিয়ে, এমনকি মহিলাদেরও মিছিলে শামিল করে আই এফ এ অভিযানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মীর মহম্মদ ওমর। ওমরের মিছিল আসছে, সাবধানে থাকবেন। পুলিশ ফোর্স লাগলে জানাতে ভুলবেন না। লালবাজার থেকে কোনও পুলিশ অফিসারের ব্যক্তিগত ফোন এল। না, পুলিশ ডাকেননি। বরং আই এফ এ-এর পিওনকে বলে দিলেন, 'আমার ঘরের দরজাটা খোলা রেখে দাও। দেখি তো কত বড় কর্তা আসছে।' মীর মহম্মদ ওমর মিছিল নিয়ে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেদিন আই এফ এ সচিবের ধমক খেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ....

২০১১ সালে বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, আজ সব থেকে কার কথা বেশি মনে পড়ছে? উত্তরে মমতা সেদিন বলেছিলেন, 'আজ প্রদ্যুতদা বেঁচে থাকলে সব থেকে খুশি হতাম। প্রদ্যুতদাকে খুব মিস করছি।'

মিস করার কারণও আছে। ১৯৮৫ সাল থেকেই খুব দারুণ সম্পর্ক ছিল। ভাই-বোনের সম্পর্ক। আটের দশকের ঘটনা। একদিন অফিসে হাজির মমতা। অফিসে ঢুকেই আবদার, 'প্রদ্যুতদা, উজ্জ্বলার চানাচুর আনুন। সঙ্গে চাও খাব'। প্রসঙ্গত, ভবানীপুরের উজ্জ্বলা সিনেমা হাউসের কাছে একটা চানাচুরের দোকান ছিল। মমতা ওই দোকানের চানাচুর খেতে খুব পছন্দ করতেন। আমাকে বললেন, 'দীপু, মমতাকে ভালো করে চিনে রাখ, যোগাযোগ রাখবি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের নেক্সট সি এম। সি এম হলে কী চাইবি? এখনই বলে রাখ।' মমতা শুনে বলেছিলেন, 'আবার শুরু করলেন প্রদ্যুতদা? ছাড়ুন তো, যত সব ফালতু কথা।' মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেই দিনের কথা ভুলতে পারেননি বলেই রাইটার্সের সেই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদ্যুত দত্তর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন মমতা।

প্রদ্যুত দত্ত ও মমতা ব্যানার্জি হল একটা অধ্যায়। যার মধ্যে রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও আন্দোলন অন্যতম। বিষয়টা ছিল রাজনৈতিক ইস্যু। আবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামও জড়িত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুরো রবীন্দ্র সরোবরটাই বেসরকারিকরণ করে অশোক টোডি ও শ্রবণ টোডির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খবরটা জানাজানি হতেই মমতা ব্যানার্জি ছুটে গিয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্তর কাছে। তিনি ওই সময় আই এফ এ-এর ডাকসাইটে সচিব। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কংগ্রেসের নেত্রী। দক্ষিণ কলকাতার সুবিশাল লেক বাঁচাতে তৈরি করলেন 'রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও কমিটি'। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন প্রদ্যুত দত্ত। নিজের খরচে তৈরি করলেন ট্যাবলো, হোর্ডিং। শুধু তাঁর ডাকে 'রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও কমিটি'-র আন্দোলনে পথে নামলেন বাংলার ফুটবলার থেকে সব ক্রীড়াবিদ— সবাই। সেই সময় অ্যাথলিট জগতের সেরা তারকা সাইনি আব্রাহামও এই আন্দোলনে শামিল হলেন। এই আন্দোলনের ফলে পিছু হঠলেন জ্যোতি বসু। সংগঠিত আন্দোলনের ফলে বেঁচে গিয়েছিল রবীন্দ্র সরোবর।

ফুটবল প্রশাসনে জড়িয়ে থাকার পাশাপাশি তিনি নানান সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। যেমন পণপ্রথা, ড্রাগ বিরোধী আন্দোলনেও পথে নামতেন তিনি। ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে বাংলার জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। এসবের কারণেই প্রদ্যুত দত্তর কাছে মমতা ব্যানার্জি একদিন রাজনীতিতে আসার প্রস্তাব দিলেন। প্রথমে রাজি

ছিলেন না। কিন্তু ভগ্নীসমা মমতার আবদারের কাছে আর না করতে পারেননি। ঠিক হল, যাদবপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়াই করবেন। পুরোটাই মমতার উদ্যোগ। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে আলোচনায় নাম তুললেন মমতা। কিন্তু বিরোধিতা করলেন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সোমেন মিত্র ও সুব্রত মুখার্জীরা। মমতাও লড়াই ছাড়েননি। বেশ কিছুদিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই করে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে রাজি করালেন মমতা। অবশেষে যাদবপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নাম পাঠানো হল দিল্লিতে। সব যখন ঠিক হয়ে গেল, প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলেন, তখনই খবর এল, দিল্লি কংগ্রেস তাঁর নামটা পাশ করেনি। বাতিল করে দিয়েছে। অনুমান করা যায়, যাতে নির্বাচনে টিকিট না পান তার জন্য দিল্লিতে 'গেম' খেলেছিলেন প্রিয়-সোমেন-সুব্রতরা।

ধীরেন দে ছিলেন কাছের, সাহায্য করেছিলেন পল্টু দাসকেও

ইস্টবেঙ্গল খেলতে যাবে জাপানে। ওই সময় ইস্টবেঙ্গলের সর্বময় কর্তা হলেন পল্টু দাস। আই এফ এ থেকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলকে কখনও অকারণে সুবিধা পাইয়ে দেননি। জাপানে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। একদিন কালীঘাটের অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়িতে আসেন পল্টু দাস। কোনও ভনিতা না করে পল্টু দাস বলতে থাকেন, 'সমস্যায় পড়েছি। জাপানে ইস্টবেঙ্গল খেলতে যাবে। কিন্তু টাকার অভাবে জাপান যাওয়া আটকে যাচ্ছে। কিছু একটা করুন।' জানতে পারলেন, পল্টু দাসের প্রয়োজন এক লক্ষ টাকা। ওই সময়ে এক লক্ষ টাকা মানে অনেক টাকা। তিনি ফোন করলেন রাজ্য সরকারের তৎকালীন মুখ্যসচিব তরুণ দত্তকে। এই তরুণ দত্ত খুব স্নেহ করতেন। মোহনবাগানের সঙ্গে আইএফএ-র বহুবার গন্ডগোল হয়েছে। টুটু বসুর হাঙ্গারফোর্ডের বাড়িতে বসে অনেক সমস্যা মিটিয়েছিলেন এই তরুণ দত্ত। সেই তরুণ দত্তকে ফোন করে এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলেন। তরুণবাবু অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। ফের একদিন বাড়িতে এসে পল্টু দাস বলেন, 'আর কোনও পথ খোলা নেই, প্লিজ কিছু একটা করুন।' আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে চেক ভাঙিয়ে এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকা পেয়ে সেদিন পল্টু দাসের চোখে জল এসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে জাপান থেকে ম্যাচ খেলে ফিরে একটা সুন্দর জামার কাপড় এনে উপহার দিয়েছিলেন পল্টু দাস। পল্টু দাস বলেন, 'ক্লাবের যা অবস্থা টাকার অভাব থেকেই যাচ্ছে। আপনার যে এক লক্ষ টাকা নিয়েছি, সেই টাকায় আমি বেশ কিছু আপনার পরিচিতকে ক্লাব সদস্য করিয়ে নিচ্ছি। তাহলে আমিও নিশ্চিত হই।' রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কখনও আর টাকা চাননি।

ধীরেন দের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক থাকায় অঞ্জন মিত্ররা সব সময় বিরোধিতা করতেন তাঁর। ধীরেন দে তাঁকে দুলু (ডাক নাম) নামেই ডাকতেন। এতটাই স্নেহ করতেন। বিদেশ থেকে যখনই ফিরতেন, তাঁর জন্য কিছু না কিছু আনতেনই। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সচিবের কাজে কখনই প্রভাব পড়তে দেননি।

"হু ইজ রুসি মোদি?"

জামশেদপুরের টাটা স্পোর্টস চেয়ারম্যান রুসি মোদি কলকাতায় বিদেশি দল এনে একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট করতে সব আয়োজন করে বসলেন। এ আই এফ এফ-এর অশোক ঘোষের পরামর্শ, সাহায্য সবই নিয়েছিলেন, কিন্তু মোদি আই এফ এ-কে গুরুত্বই দিলেন না। প্রথম খবরটি জানতে পারলেন 'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক পল্লব বসু মল্লিক-এর কাছ থেকে। সব শুনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন ঘটনা সত্যি। সেই দিনই 'আজকাল'-এ এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'হু ইজ টাটা? হু ইজ রুসি মোদি? আই এফ এ-এর অনুমতি ছাড়া এই টুর্নামেন্ট করার অনুমতি দেওয়া হবে না।' সাক্ষাৎকারটা প্রকাশ হতেই হই চই পড়ে গেল। চাপে পড়ে গেলেন খোদ রুসি মোদি। বিপদ বুঝে তিনি আলোচনায় বসতে চান। টাটা সেন্টারে আলোচনা সভায় বসেছিলেন মোদি ও প্রদ্যুত দত্ত। মোদিকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যত বড় কোম্পানি হোক বা ব্যক্তি, নিয়ম মেনে আই এফ এ-এর কাছে টুর্নামেন্ট করার আবেদন করতে হবে। তবেই টুর্নামেন্ট করার অনুমতি দেওয়া হবে। নিজের ভুল স্বীকার করে রুসি মোদি আই এফ এ-এর কাছে আবেদন করে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পেরেছিলেন।

কখনও কোনও অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করেননি। আপাদমস্তক সৎ মানুষ ছিলেন। আর সেটা বুঝে ছিলেন বলেই পরে অশোক ঘোষদের মতো মানুষদের সঙ্গ ছেড়ে প্রদ্যুতবাবুর হাত ধরে ছিলেন মোদি। পরবর্তীকালে তাঁদের খুব সুসম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। শরীর খারাপ হলেই ডেকে নিতেন নিজের বাসভবনে। এতটাই সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আসলে কিছু মানুষ ছিল যারা কোনও সম্পর্কের ভিতরে ঢুকে গিয়ে দূরত্ব তৈরি করে দিত অথবা কোনও সম্পর্ক তৈরি হতেই দিত না। প্রদ্যুত দত্ত ও রুসি মোদি বা সুভাষ চক্রবর্তী তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

গড়াপেটা বিরোধী ছিলেন

কলকাতা লিগের এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। মুখোমুখি জর্জ টেলিগ্রাফ ও কাস্টমস। ম্যাচটি ড্র হলে কাস্টমস অবনমন থেকে বেঁচে যাবে। ওই বছর জর্জের বেশ সংগঠিত দল। ম্যাচের আগের দিন থেকেই ময়দানে গুঞ্জন, জর্জ-কাস্টমস গড়াপেটা খেলবে। ম্যাচ ড্র হবে। সেই ম্যাচে কাস্টমসের সঙ্গে জর্জ ৩-৩ ড্র করল। গোটা ময়দানে

সমালোচনার ঝড়। ম্যাচের শেষে জর্জের এক কর্তা, মাটন স্টু ফুটবলারদের সামনে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলতে থাকেন, 'খা, ... বাচ্চারা খা।' ফুটবলারদের উপর এতটাই রেগে গিয়েছিলেন ওই কর্তা। জর্জ গড়াপেটা খেলছে কর্তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্তর টিমও গড়াপেটা খেলছে। ভাবতেই পারছে না কেউ।

পরের দিন সকালে চার ফুটবলারকে (তিন ডিফেন্ডার ও সেই ম্যাচে খেলা গোলকিপার) নিজের লেক রোডের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন প্রদ্যুত দত্ত। মাথা নিচু করে চার ফুটবলার বসে আছেন। প্রদ্যুত দত্ত ঘরে এসে ম্যাচ সম্পর্কে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথম দুই ডিফেন্ডার বললেন, তাঁরা কিছুই জানেন না। জেতার জন্যই মাঠে নেমেছিলেন। তৃতীয় ডিফেন্ডারটি বললেন, 'দাদা, ম্যাচটা কেমন যেন খাপছাড়া ভাব ছিল। তাই আমি সেকেন্ড হাফে বসে যাই।' উত্তরে প্রদ্যুত দত্ত বলে ওঠেন, 'তুই বেশি শেয়ানা তো। তাই বসে গেলি। তাই তো?' বলেই চতুর্থ ফুটবলারটির দিকে চোখ রাখতেই গোলরক্ষকটি ভয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। কাঁদতে কাঁদতে গোলকিপারটি বলতে থাকেন, 'আমাদের টিম গড়াপেটা খেলেনি। ওদের কর্তারাও কিছু বলেনি। ম্যাচের আগে পান্নাদা এসে বলল, গোলে বল এলে ছেড়ে দিতে ...' কথাগুলো শেষ হতে না হতেই নিজের জুতো খুলে ছুড়ে মারলেন প্রদ্যুতবাবু। গোলকিপারটি মাথা সরিয়ে নেওয়ায় জুতোটি দেওয়ালে লাগে। 'এই জুতো তুলে আমাকে তোরা মার। সব পছন্দ করি, কিন্তু গড়াপেটা পছন্দ করি না। তাও তোরা খেললি। আমার সব সম্মান শেষ করে দিলি।' কথাগুলো বলেই, ক্লাবের প্যাডে একটা নোটিশ লিখলেন। তারপরে বললেন, এখনই ক্লাবে গিয়ে নোটিশটা যেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ওই নোটিশে জানিয়ে দেওয়া হয়ে ছিল, ক্লাবের ফুটবল সচিব পি চ্যাটার্জিকে বহিষ্কার করা হল। ক্লাব চত্বরে আর কখনও যেন তাঁকে দেখা না যায়।

'খেলার কথা'

প্রদ্যুত দত্তর বহু দিনের ইচ্ছে ছিল, একটা খেলাধূলার কাগজ প্রকাশ করা। শুধু ভাবনাই নয়, কাজেও করে দেখালেন। তখনও তিনি আই এফ এ-তে ঢোকেননি। জর্জ টেলিগ্রাফ নিয়েই আছেন। সময়টা ছিল ১৯৭৮ সাল। ক্যামাক স্ট্রিটের শান্তিনিকেতন বিল্ডিংয়ের ১১ তলা। স্পোর্টস ম্যাগাজিন নিয়ে প্রথম মিটিং। সেই মিটিংয়ে ছিলেন সিনিয়র অমৃতবাজার পত্রিকার ফোটোগ্রাফার মনোজিৎ চন্দ, আনন্দবাজারের প্রাক্তন ডেপুটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মার্কেটিংয়ের ম্যানেজার ইন্দুভুষণ রায় ছাড়াও দৈনিক কাগজের তিন রিপোর্টার। মনোজিৎ চন্দের জন্যই এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অশোক দাশগুপ্ত (বর্তমানে 'আজকাল'-এর সম্পাদক)। বৈঠকে যে

তিন দৈনিক কাগজের রিপোর্টার ছিলেন, তাঁরা শুরুই করেছিলেন, 'ডেইলি পেপারে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ...।' তাঁরা এমন ভাব দেখালেন, যেন তাঁরাই আসল লোক, স্পোর্টস ম্যাগাজিন একটা ফালতু ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই ওই তিন দৈনিক কাগজের রিপোর্টারদের কথা ভালো লাগেনি অশোক দাশগুপ্তর। ওই মিটিংয়ে অশোক দাশগুপ্ত বললেন, 'প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার যে, ভালো স্পোর্টস ম্যাগাজিন করার জন্য খবরের কাগজে কাজ করার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। থাকলে ভালো। কলকাতায় 'খেলার আসর'-এর মতো একটা প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টস ম্যাগাজিন আছে। এখন আমাদের দারুণ কিছু ভাবতে বা করতে না পারলে ম্যাগাজিন না করাই ভালো। আরও মনে রাখতে হবে, ম্যাগাজিনে কখনওই 'অনুরোধের আসর' বসানো যাবে না। কারও অনুরোধ নয়, শুধুমাত্র পত্রিকার প্রয়োজনেই লেখা ছাপবে। সেই সঙ্গে পত্রিকাটিকে কমার্শিয়াল দিক দিয়েও ভাবতে হবে।'

অশোক দাশগুপ্তর সেদিনের মিটিংয়ে কথাগুলি মনে লেগেছিল প্রদ্যুতবাবুর। তাঁকেই পুরো দায়িত্ব নিতে বললেন। রাজি হলেন অশোকবাবু। পত্রিকার নাম ঠিক হল 'খেলার কথা'। নতুন এই স্পোর্টস ম্যাগাজিনের অফিস হল ক্যামাক স্ট্রিটের শান্তিনিকেতন বিল্ডিংয়ের ১১ তলা। অশোক দাশগুপ্ত নিজের টিম বেছে নিলেন। ছিলেন বিপ্লব দাশগুপ্ত, সরোজ চক্রবর্তী, পল্লব বসু মল্লিক, ধীমান দত্তর মতো তরুণ রিপোর্টার। ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ শুরু করলেন প্রদীপ সোম, জয়ন্ত শেঠ, পি কে চৌধুরী, শান্তি সেনরা। তারও পরে যোগ দেন বিকাশ সাধু।

প্রথমে ছাপা হত উল্টোডাঙ্গার দীপ্তি প্রিন্টিং প্রেসে। পরে সেই প্রেস বদলে ছাপা হত ন্যাশনাল আর্ট প্রেসে। শুরুতেই বাজিমাত 'খেলার কথা'-র। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার সময় ১০ হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে সব ম্যাগাজিন বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় 'খেলার কথা'-র সার্কুলেশন পৌঁছয় ৭০ হাজারে। দু-বছর পর অশোক দাশগুপ্তর সঙ্গে প্রদ্যুত দত্তর একটা মতপার্থক্য হয়। ১৯৮০ সালে অশোক দাশগুপ্ত পুরো টিম নিয়ে 'খেলার কথা' ছেড়ে চলে গেলেন। একমাত্র বিপ্লব দাশগুপ্তই প্রদ্যুতবাবুর সঙ্গে থাকলেন। অশোক দাশগুপ্ত তাঁর সেই পুরনো টিম নিয়ে নতুন ম্যাগাজিন শুরু করলেন 'খেলার কাগজ'। ১৯৮০ সালের ১ এপ্রিল।

তারপরেও প্রদ্যুতবাবু দক্ষতার সঙ্গে 'খেলার কথা' চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এক বছর পর দেখা গেল, প্রেসে ম্যাগাজিন ছাপতে গেলেই বই আকারে প্রকাশ হওয়ার আগেই 'খেলার কথা'-র গুরুত্বপূর্ণ কনটেন্ট ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সার্কুলেশনও কমতে থাকে। ময়দানেই 'খেলার কথা'-কে রুখতে এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র শুরু হল। এই ঘটনায় খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। তারপর আর এগিয়ে না গিয়ে 'খেলার কথা' বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি।

তিনি অনেকের কাছে ছিলেন 'মুশকিল আসান'

চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর দাহ করার সময় পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ওই বিবৃতি প্রকাশ হওয়ার দিনই টালিগঞ্জ স্টুডিয়োয় গিয়ে বিপ্লবকে মারতে গিয়েছিলেন কালীঘাটের কিছু স্থানীয় যুবক। সেই দিন স্টুডিয়োর পাঁচিল টপকে পালিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেই দিনই বিপ্লব শরণাপন্ন হয়েছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর। তখন সুভাষবাবু তাঁকে প্রদ্যুত দত্তর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ, প্রদ্যুতবাবু খেলাধূলা সংগঠনের পাশাপাশি নানা সমাজসেবা মূলক কাজ করতেন। সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। যোগাযোগ ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া, প্রদ্যুতবাবু তখন কালীঘাটে থাকেন। সুভাষ চক্রবর্তীর পরামর্শ মেনে বিপ্লব আসেন প্রদ্যুতবাবুর কাছে। সব সমস্যার কথা শুনে দুই দিনেই সমাধান করে দিয়েছিলেন প্রদ্যুতবাবু। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে আর কেউ বিরক্ত করেনি।

পুজোর এক মাসও বাকি নেই। হঠাৎ ময়দানের নিচুতলা ডিভিশনের একটি ক্লাব কর্তা হাজির প্রদ্যুতবাবুর অফিসে। ঘরে ঢুকেই সেই কর্তাটি বললেন, পুজোর মাস। বউ-ছেলে-মেয়েদের কিছুই কিনে দিতে পারিনি। কিছু সাহায্য করা যায়? একটু অপেক্ষা করতে বলে সেই কর্তাটির হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলেছিলেন, 'পরিবার নিয়ে ভালো করে পুজো কাটাও'। এমন অনেক ঘটনা আছে, ময়দানের কত মানুষের যে পাশে দাঁড়িয়েছেন তার কোনওটাই তিনি বলতেন না। প্রদ্যুতবাবু রাগী, দাপুটে, রাশভারী কিন্তু মনটা ছিল নরম। দয়ালু মন ছিল তাঁর। কেউ তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে গেলে কাউকে তিনি কখনও খালি হাতে ফেরাননি।

'দীপু আমার দিল্লি যেতে ইচ্ছে করছে না ...'

১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। ট্রেনে দিল্লি যাবেন। দিল্লিতে কাজও আছে, আবার নিজের শরীরের চেকআপও আছে। ট্রেনে উঠে সিটে বসেছেন। সি-অফ করতে স্টেশনে গিয়েছি। ব্যাগ, জলের বোতল ঠিক জায়গায় রেখে দুজনে বসে আছি। ট্রেন তখনও ছাড়েনি। ট্রেন ছাড়লেই কামরা থেকে নেমে আসবো। প্রদ্যুতবাবু চুপ করে বসে আছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দীপু, আমার দিল্লি যেতে ইচ্ছে করছে না। তুই দিল্লি চলে যা।'

আমি বলি, 'তা কী করে হয়! তোমার কাজ আমি কী করে করব? তাছাড়া ডাক্তারের কাছে তোমার শরীরের চেকআপও করার আছে।'

প্রদ্যুত দত্ত ফের বলে উঠেছিলেন, 'দীপু, বিশ্বাস কর আমার দিল্লি যেতে একদম ইচ্ছে করছে না। ভালো লাগছে না।'

সেই দিন তিনি দিল্লি অবশ্য গিয়েছিলেন। ক'দিন পরে ফিরেছিলেন বিমানে।

১৬ নভেম্বর, শীতের রাতে। ওই শীতের রাতে কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে হাজার হাজার মানুষ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সবাই যেন মৌনব্রতে মগ্ন। শুধু তাঁর অপেক্ষায় ওরা। তিনি বিমানবন্দর থেকে বেরুলেন ঠিকই, কিন্তু কফিন বন্দি হয়ে। মাত্র ৫৪ বছরের দীর্ঘকায় মানুষটার নিথর দেহটা যখন বাইরে আনা হল, তখন সেই শীতের রাতে অপেক্ষায় থাকা মানুষগুলো হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল নিথর দেহটির উপর। যেন সেই মানুষগুলোর কাছে নিজ আত্মীয় বিয়োগের সমান। উচ্চশিক্ষিত, বিচক্ষণ, আপসহীন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, সবার মুশকিল আসান এবং চূড়ান্ত সফল আই এফ এ-এ সচিবের অকালপ্রয়াণে দিশাহীন হয়ে পড়েছিলেন বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীরা। পরের দিন সকালে প্রদ্যুত দত্তর মরদেহ নিয়ে মহানগরের রাজপথে যে মিছিল বেরিয়ে ছিল তা নজিরবিহীন। শুধু ক্রীড়া জগৎ নয়, সমাজের সকল মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পথে নেমে শেষ বারের মতো কুর্নিশ জানিয়ে ছিলেন প্রদ্যুত দত্তকে।

দিল্লি থেকে আর তিনি ফিরবেন না। তিনি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন? তাই দিল্লি যেতে চাইছিলেন না? হয়তো!

দুঃসাহসী এক প্রশাসক

সৌগত রায়

(রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)

বাংলার ক্রীড়াজগতে জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের দত্ত পরিবারের নাম নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন হরিপদ দত্ত। পরবর্তীতে তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র বিশ্বনাথ দত্ত এবং প্রদ্যুতকুমার দত্ত বাংলা তথা ভারতীয় ক্রীড়া জগতের প্রশাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, ক্রীড়ামোদী মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ভারতীয় ক্রীড়া জগতে তিন জন— পঙ্কজ গুপ্ত এবং এম দত্ত রায়ের মতো প্রশাসক হিসাবে বিশ্বনাথ দত্তও ছিলেন কিংবদন্তি। বিশ্বনাথ দত্তর কনিষ্ঠতম ভ্রাতা প্রদ্যুতকুমার দত্ত ছিলেন দক্ষ একজন সংগঠক এবং প্রশাসক। দুর্ভাগ্য প্রদ্যুত দত্ত সময়ের অনেক আগেই হারিয়ে গেলেন। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর অকালপ্রয়াণে বাংলার ফুটবলে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা সেই ক্ষতি বা শূন্যতা আজও পূরণ হয়নি।

প্রদ্যুতবাবুর সঙ্গে আমার সে অর্থে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। মাঝেমধ্যে তাঁর কাছে আমি গিয়েছি কিন্তু সেই যাতায়াতের জন্য অন্তরঙ্গতা হয়ে ওঠেনি। বড় কোনও খেলার টিকিট পাওয়া বা অন্য কোনওরকম সুবিধা আদায়ের ব্যাপার ছিল না। খুব কাছে থাকার ব্যাপার ছিল না। স্বভাবতই তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলাম না।

তবু একজন দক্ষ প্রশাসকের যেসব গুণ থাকা দরকার সেই দিকগুলো তাঁর আছে, বুঝেছিলাম সংবাদপত্রের মাধ্যমে। খবরের কাগজ পড়েই বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়েছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত আমার সঠিক বলে মনে হয়েছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডান ক্লাবের মতো বড় তিন ক্লাবকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। বাংলার ফুটবলে নিয়ামক সংস্থা হল ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, অর্থাৎ আই এফ এ। সেক্ষেত্রে তিনি যেমন কখনও পক্ষপাতিত্ব করেননি, আবার কখনও কোনও প্রভাবশালী ক্লাবকে নিয়ামক সংস্থার মাথার উপরে উঠতে দেননি। তিনি সচিব থাকাকালীন বাংলার ফুটবলকে ঘিরে প্রবল উত্তেজনা ছিল। মাঠে মাঝেমধ্যে ঝামেলা, অশান্তি হত। প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর

হস্তে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। যতদূর জেনেছি ছোট-বড় সব ক্লাবই তাঁকে একদিকে যেমন সমীহ করত পাশাপাশি শ্রদ্ধাও করত।

আগেই বলেছি তাঁর কর্মধারা প্রসঙ্গে সবই জেনেছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। শুনেছি শারীরিক দিক থেকে তাঁর প্রতিবন্ধকতা ছিল। পথ দুর্ঘটনার একটা পা হারিয়ে ছিলেন। কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে হাঁটতেন। ভাবতে অবাক লাগে এরকম একটা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁর চলার পথে বাধা হতে পারেনি। দাপটের সঙ্গে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে গেছেন। সে তার প্রাণপ্রিয় ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টসই হোক যা নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ, তাঁর গতি থেমে থাকেনি।

প্রথমে তাঁর পরিচয় ছিল একজন দক্ষ সংগঠক হিসাবে। জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের সচিব হিসাবে। পরবর্তীতে সঙ্গে আই এফ এ সচিব। অর্থাৎ ফাঁকতালে তিনি আই এফ এ সচিব হননি। বা কেউ তাঁকে ওই পদে বসিয়ে দেননি। যতদূর শুনেছি ক্লাবগুলোই তাঁকে আই এফ এ-র শীর্ষপদে বসিয়েছে।

আই এফ এ সচিব হিসাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্য ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে আয়োজিত জওহরলাল নেহরু গোল্ড কাপ। তাঁর দাদা বিশ্বনাথ দত্ত গড়ের মাঠের খেলাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জেলার মাঠে। প্রদ্যুতবাবু এ ব্যাপারে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল আয়োজন করেছিলেন শহর থেকে অনেক দূরে শিলিগুড়িতে। কেরালার মতো তিনিও চেয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিতে। অনেকেই তাঁর সিদ্ধান্ত অবাস্তব বলে মনে করেছিলেন। কারণ, নেহরু গোল্ড কাপের মতো আন্তর্জাতিক ফুটবল আয়োজন করার জন্য জরুরি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম। শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে মাঠের পশ্চিমদিকে একটা ছোট স্টেডিয়াম ছিল। সেখানে পাঁচ হাজার দর্শকও মনে হয় বসতে পারতেন না। প্রদ্যুত দত্ত-র একটা সিদ্ধান্ত সরকারকে বাধ্য করেছিল রাতারাতি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম তৈরি করতে। পাশাপাশি গোটা শহরের খোলনলচে বদলে গেল। এটাই স্বাভাবিক। যেমন ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস। ওই বৃহৎ আসরকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যেমন সেজেছিল দিল্লি সেরকমই পরিবর্তন হল শিলিগুড়ির। হ্যাঁ, শিলিগুড়িতে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে স্টেডিয়াম হত। শহরটাও সেজে উঠত তবু মানতেই হবে আজ থেকে ৩৫ বছর আগে কখনোই হত না যদি না প্রদ্যুত দত্ত ওরকম একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নিতেন। এককথায় শিলিগুড়িকে উন্নত করার জন্য তিনিই পথ দেখিয়েছেন।

এ বারে আসছি তাঁর শিক্ষা ও রুচিবোধ সম্পর্কে। স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি হিসাবে এক বছরের মধ্যে দু-দুটি ফুটবল আসর বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯৮৭

এবং ১৯৮৮ সালে। ১৯৮৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সন্তোষ ট্রফি। সেই আসরে প্রধান অতিথি হিসাবে পাঞ্জাব থেকে উড়িয়ে এনেছিলেন ভারতকেশরী ডিফেন্ডার জার্নেল সিং-কে। জাতীয়তাবাদের পরিচয় রেখেছিলেন সেখানে। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ পরিচালনার সময় সকাল থেকে সন্ধ্যায় বাজত দেশাত্মবোধক গান। জাতীয় পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল গোটা শহর। এসবই তাঁর দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধের সাক্ষ্য বহন করে।

আবার বলছি একজন মানুষকে ভালোভাবে জানতে হলে সব সময় তাঁর কাছে থাকতে হয় না। তাঁর কর্মকাণ্ডই একজন মানুষকে চিনিয়ে দেয়। প্রদ্যুতবাবুকে আমিও সেভাবেই জানি। যতটুকুই জানি সেই ঘটনাগুলোই এই লেখায় তুলে ধরলাম।

অনেকের থেকেই ব্যতিক্রম

পূর্ণেন্দু বসু

(রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)

বাঙালির দুটো উৎসব। এক, শারদোৎসব, দুই, ফুটবল। একজন বাঙালি হিসাবে আমিও তার ব্যতিক্রম নই। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল আমাকে আকৃষ্ট করেছে। তাই রাজনীতি জগতের ব্যস্ততা, বিধায়ক এবং মন্ত্রী হিসাবে ব্যস্ত থাকলেও ফুটবল এখনও আমাকে টানে। শত ব্যস্ততা থাকলেও কোনও ফুটবল মাঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে আমি হাজির থাকতে চেষ্টা করি।

এই টানটা অবশ্য একেবারে ছোটবেলা থেকেই। যখন একটু বড় হলাম তখন থেকেই গড়ের মাঠ আমাকে টেনেছে। গোটা ময়দান জুড়ে শুধুই খেলার মাঠ, বিভিন্ন ক্লাবের তাঁবু। এই গড়ের মাঠ হল আমাদের প্রাণের স্পন্দন। সুযোগ পেলেই খেলা দেখতে ছুটে যেতাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক। তাই মোহনবাগানের খেলা দেখতে প্রায়ই হাজির হতাম ময়দানে। সেইসময় তিন বড় ক্লাবের পাশাপাশি দুই রেল দল, ইস্টার্ন রেল এবং বি এন আর বিশেষ শক্তিশালী ছিল। পাশাপাশি এরিয়ান, রাজস্থান, খিদিরপুর এবং জর্জ টেলিগ্রাফ অনেক সময়ই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিত তিন বড় ক্লাবের দিকে। অনেক সময়ই মাঝারি মানের এই দলগুলো বড় দলের পয়েন্ট কেড়ে নিয়েছে। লিগের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। তাই এই দলগুলোকে বলা হত 'জায়ান্ট কিলার।'

জর্জ টেলিগ্রাফের ফুটবল দলও এরকম বিভিন্ন সময়ে বড় দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, লিগের রং বদলে দিয়েছে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় এক দশক জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব ছিল বড় তিন দলের কাছে আতঙ্ক। তবে পরবর্তী সময়ে প্রায় দশ বছর জর্জ দল সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি। জর্জ টেলিগ্রাফ আবার ঘুরে দাঁড়াল সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। আর এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা ছিল তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত কুমার দত্তর। জর্জ টেলিগ্রাফ আবার স্বমহিমায় ফিরে এল প্রদ্যুত দত্ত-র হাত ধরেই। তাঁর দাদা কিংবদন্তি ক্রীড়া সংগঠক বিশ্বনাথ দত্ত-র যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন তিনি।

এমনিতে বাংলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। লেখাপড়ার

পাশাপাশি খেলাধূলাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন প্রদ্যুত দত্তদের পিতা শ্রদ্ধেয় হরিপদ দত্ত। সেই ধারা আজও বজায় রেখে চলেছেন তাঁর উত্তরসূরিরা।

পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তিনি বাংলার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ-র সচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে চেয়ারে বসে তাঁর দায়িত্ব পালন করে থেমে থাকেননি। আই এফ এ-এর সচিব হিসাবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁদের আদিবাড়ি যেহেতু ওপার বাংলায় তাই অনেকেরই ধারণা ছিল প্রদ্যুত বাবুরাও ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। সে তাঁদের হৃদয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল কি না জানি না, তবে একটা ব্যাপারে বিশ্বনাথ দত্ত এবং প্রদ্যুত দত্ত একাধিকবার প্রমাণ করেছেন যে খেলার মাঠে তাঁদের কাছে জর্জ টেলিগ্রাফই হল মুখ্য। সেখানে বড় দলের বিপক্ষে খেলার সময় তাঁদের কোনও দুর্বলতা থাকত না। আর প্রশাসক হিসাবে তাঁরা সব সময়ই নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। যেমন আই এফ এ-এর সচিব হিসাবে প্রদ্যুত দত্ত যদি নিরপেক্ষতা বজায় না রাখতেন তাহলে ১৯৮৬ সালে মোহনবাগান লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত না। আবার সে বছরই মহামেডান ক্লাবকে সাসপেন্ড করে আই এফ এ সচিব হিসাবে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। আসলে আই এফ এ সচিবের চেয়ারটাকে তিনি বরাবরই মর্যাদা দিয়ে এসেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তবু দূর থেকে প্রদ্যুতবাবুকে যতটা দেখেছি, বিভিন্ন সংবাদপত্রে ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে যতটুকু জেনেছি তাতে এই মানুষটির ওপর আলাদা একটা শ্রদ্ধা থেকে গেছে। সেই হিসাবে তাঁকে একজন প্রবল ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি অনেকের থেকেই ব্যতিক্রম বলতে আমার দ্বিধা নেই।

অনির্বাণ শিখা

রমলা চক্রবর্তী

(রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)

আমি যখন স্কুল-কলেজে পড়ি তখনও খেলাধূলার উদার প্রাঙ্গণ মেয়েদের কাছে অধরাই ছিল। ব্যতিক্রম কিছু ছিল নিশ্চয়ই। ব্যাডমিন্টন আর ভলিবলই ছিল কলেজ গেম। পাড়ার মাঠে বিশেষ দিনে ফুটবল, কবাডি ম্যাচ দেখার সুযোগটাই ছিল অনেক। তারপর বেলা গড়িয়েছে, জীবন বয়েছে অন্য খাতে। ছাত্র রাজনীতির স্থানে খেলার মাঠ পড়ে রইল ভাটায়। কিন্তু ইচ্ছে বুঝি রয়েই গেছে মনের গভীরে। বাঙালির ফুটবল প্রীতি নিয়ে তো নতুন কিছু বলার নেই। তাই আমি আমার পরিবারও এর বাইরে ছিলাম না। খাবার টেবিলে হাতাহাতিও হয়ে যেত ভাইতে ভাইতে। আমিও তো কোনও দলে থাকতাম। দাদাদের কাছে মাঠের গল্প শুনতাম— ফুটবল খেলার মাঠ তখনও মেয়েদের জন্য প্রস্তুত নয়— এমনকি ফুটবল সম্রাট পেলে যখন এলেন, তখন তাঁর আমন্ত্রণপত্র আমি অনেককে দিয়েছি কিন্তু কী এক সংকোচে নিজে যাইনি। তবে পরে ফুটবল ম্যাচ আমি অনেক দেখেছি কখনও মোহনবাগান, কখনও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গ্যালারিতে বসে। আর যুবভারতী তৈরি হবার পর তো নিয়মিত কারণে ফুটবল মাঠের পরিবেশ ততদিনে মেয়েদের দর্শক হিসেবে পেতে শিখে গেছে।

সাতাশ বছর মন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে সাতদিনও আমি রাইটার্স গিয়েছি কি না সন্দেহ, কিন্তু দীর্ঘ দিন ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথী হয়ে ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট, সংগঠক, প্রশাসক, খেলোয়ারদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে— অনেকের সঙ্গে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহের সম্পর্ক হয়েছে, যার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। ফুটবলের প্রশাসক শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ দত্তকে দেখলেও সে ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু বাংলার ফুটবলকে খেলার দরজার একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে দত্ত পরিবার, জর্জ টেলিগ্রাফের ভূমিকার কথা আমি জানতাম। সেই সময়ে সমাজজীবনের সবটাই ছিল অগোছালো— তার প্রভাব খেলার মাঠে পড়বে না তা কি হয়? একটা পট পরিবর্তন হয়েছে, নতুন সরকার তখন ভাঙা বুকের পাঁজড় দিয়ে নয়া বাংলা গড়ার চেষ্টা করছে। খেলার জগতেও পড়েছে সেই নূতনের ডাক। আই এফ এর দায়িত্বে এলেন শ্রদ্ধেয় প্রদ্যোত দত্ত। সেখানেও চলছে গড়ার কাজ। খোলনলচে পালটাবার কথা তিনি ভাবেননি বলেই আমার মনে হয়, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন ফুটবল মাঠকে দমবন্ধ পরিবেশ থেকে উদার

উন্মুক্ত করে নতুন আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে।

এরকম সময়েই তাঁকে আমি দেখেছি। অতবড় একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যতটা জানলে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়— তেমনি ভাবে ওই রাশভারী মানুষের সঙ্গে আমার মিলবার সুযোগ হয়নি অথবা আমি নিইনি। বহুবার তিনি এসেছেন আমাদের বাড়িতে, প্রয়োজনের শেষে কথাও হয়েছে দুচারটি। অতিথি সেবায় না কি আমার নামডাক আছে। ঘরোয়া পরিবেশ ছাড়াও দেখা হয়েছে— আই এফ এর অফিসে, স্পোর্টস কাউন্সিলে, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে, কখনও মাঠের ভি আই পি বক্সে। ইচ্ছেয়-অনিচ্ছায় অনেক সময় ক্রীড়া মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার টুকরো আমার কানে এসেছে তাতে বুঝেছিলাম একটা রাজজোটক হয়েছে। একটা দারুণ বোঝাপড়া। দুজনেই কিছু করতে চান। করে দেখাতে চান। দুজনেই জেদি, সাহসী। নানা জালে আবদ্ধ বাংলার ফুটবলকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত আর ক্রীড়া জগৎকে সংহত করতে চেয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। দারুণ সমন্বয় ছিল দুজনের। ভাঙার চেষ্টা হয়নি তা নয় তবে সেটা ধোপে টেকেনি। আই এফ এর-ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, জেলায় জেলায় ফুটবল খেলার পরিকাঠামো, স্টেডিয়াম তৈরি করা এই সব বিকল্প পরিকল্পনার সঙ্গে প্রদ্যুতদা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সহযোগী হয়েছেন। আই এফ এ-কে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও দোদূল্যমানতা ছিল না। সিদ্ধান্তে পারতেন অটল থাকতে। অনেক কড়া পদক্ষেপ নিতে হয়েছে তাঁকে বড় ক্লাবগুলির অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে। খেলার মান অথবা খেলোয়াড়— দুই-এর প্রতিই মনোযোগ থেকে বিচ্যুত হননি কখনও। ময়দান শাসন করতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হলেও সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার মনোবল তাঁর ছিল। সেটা দেখেছে সেই সময়ে রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীরা। আই এফ এ-র সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে শ্রদ্ধেয় অশোক ঘোষ ছিলেন সেই সময়ে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় সেতু।

প্রদ্যুতদা একটা অনুকূল পরিস্থিতি পেয়েছিলেন। খেলার জগতে রাজনীতির খেলা চিরদিনই ছিল নানা বেশে— গোষ্ঠ পাল, বাঘা সোমদের সময় এক রকম, তার পরবর্তী সময় থেকে অন্যরকম। বহু সময়েই খেলার জগতে সরকারি, প্রশাসনিক আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় ব্যাহত হয়েছে সামগ্রিক ভাবে ক্রীড়া ক্ষেত্রের অগ্রগতি। ব্যক্তি প্রাধান্য হয়ে উঠেছে অস্বস্তিকর। বৃহৎ ক্লাবগুলিকে নিয়ে বসেছে প্রতিযোগিতার আসর। প্রদ্যুতদা বা তার পরেও যাঁরা আই এফ এ-র কর্ণধার হয়েছেন, রঞ্জিৎ গুপ্ত, উৎপলদা বা সুব্রত দত্ত— সকলেই এই প্রশাসনের রাজনৈতিক চাপমুক্ত হয়ে কাজ করতে পেরেছেন। স্বাধীন সংস্থার উপর অহেতুক হস্তক্ষেপ তাদের বিব্রত করেনি। খেলার দুনিয়ার নিজস্ব কূট-কৌশলের যন্ত্রণা তো চিরন্তন!

প্রদ্যুত দত্ত আই এফ এ-র দায়িত্ব নিয়ে কী কী করতে পেরেছিলেন তার

হিসেব নিশ্চয়ই আই এফ এ-র মহাফেজখানায় আছে। কিন্তু জনমানসে তাঁর যে অতুলনীয় কর্মকাণ্ডের বিষয় একবারে মনে আসবে সেটা নিশ্চয়ই নেহরু গোল্ড কাপের কথা। নেহরু কাপের মতো মর্যাদাসম্পন্ন খেলাটিকে নান্দনিক করে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন। নেহরু কাপ দিয়ে উদ্বোধন হল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের। কী সাংঘাতিক একটা চ্যালেঞ্জও ছিল সুষ্ঠুভাবে এই খেলাটা করাবার। ওই সময়টাতে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি প্রদ্যুতদাকে। মাঠ পুরোপুরি তৈরি হয়নি, অসম্পূর্ণ গ্যালারি। ফিফার নির্দেশ, (কারণ বহু বিদেশি দল আসছে) এ আই এফ-এর খবরদারি। আই এফ-এর কেউ কেউ মজা দেখছেন— সেই সময় দেখেছি কী এক বোঝাপড়া নিয়ে সুভাষ চক্রবর্তী আর প্রদ্যুত দত্ত প্রতিটি মোড়ের বাঁকে বাধা কাটিয়ে এগিয়েছেন। সঙ্গে শিলিগুড়ি করপোরেশনের মেয়র বিকাশ ঘোষ এবং তার দল, সমগ্র নর্থবেঙ্গল মেতে উঠেছিল এই খেলা নিয়ে। সমস্ত অসুবিধের বাধা জয় করে নেহরু কাপ শুরু হল নবনির্মিত স্টেডিয়ামে। সেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝলমল করে উঠল, রাশিয়া, পোল্যান্ড, চায়না, বুলগেরিয়ার প্লেয়ারদের ঝলকানিতে। এটা প্রদ্যুত দত্তদের কাছে এভারেস্ট জয়ের থেকে কম কঠিন ছিল না। অসাধ্যসাধন করেছেন সাহস আর জেদের যুগলবন্দিতে। প্রশাসকরা আসেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তার মধ্যেই নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা বিশিষ্টতা অর্জন করে থাকেন। শ্রদ্ধেয় প্রদ্যুত দত্ত তাঁর সময় কালের মধ্যে আই এফ এ-কে কতটা মজবুত করতে পেরেছিলেন, খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণ থেকে উন্নয়ন, তাদের চাহিদা থেকে সুযোগ কী দিয়ে ছিলেন ইতিমধ্যেই তাঁর মূল্যায়ন হয়েছে নিশ্চয়ই। খেলোয়াড়দের অনেকের কাছেই অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনেছি তাঁর। তিনি যে কঠিন এবং ঋজু ও স্পষ্টবাদী এটা তার সমালোচনা নয়, এটা প্লেয়ারদের একটা উপলব্ধি।

খেলার দুনিয়ায় সংগঠকদের থেকে খেলোয়াড়রা অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে থাকে আর সেটাই স্বাভাবিক। তাই চিরকাল মারাদোনা, পেলেরা অমর হয়ে থাকবে। তাদের পেছনে মেসি, নেইমাররা। বাংলার ফুটবলের ইতিহাসে মেওয়ালাল, বলরাম, পিকে, চুনী গোস্বামী থেকে সুরজিৎ, সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, সুব্রত ভট্টাচার্য ভাস্কর গাঙ্গুলি, গৌতম, অমিত ভদ্র, কৃশানু, নঈম, মইদূল, মজিদ, বাইচুং, চিমা, বিকাশ পাজিদের নাম জ্বলজ্বল করে জ্বলবে। আবার আজকের প্রজন্মের খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে এমনি করেই ইতিহাস হবে কতজন। কিন্তু এদেরকে তারকা করতে, জনপ্রিয় করার কারিগর যারা বিখ্যাত কোচের নাম কেউ কেউ জানবে কিন্তু, প্রশাসকের নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাদের নাম করলে কেউ চিনতেই পারে না। তবু তার মধ্যে কিছু কিছু নাম উচ্চারিত হয় ফুটবলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর তারই মধ্যে স্থান করে নিয়েছে সচিব প্রদ্যুত দত্ত।

আজকের সময়টা আরও কঠিন। ক্ষমতা ও দখলদারির আক্রমণ মারাত্মক।

তার ছায়া সর্বত্র। ক্রীড়াঙ্গন কাঁপছে। ক্লাবগুলির উপরে যেমন খুশির থাবা। আজও তাই প্রদ্যুত দত্তর মতো একজন কঠোর কোমলে প্রশাসকের প্রয়োজন। আর সেই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতেই আসরে নব নির্বাচিত সচিব অনির্বাণ দত্ত। ভাবতে ভালো লাগছে প্রদ্যোৎদার উত্তারাধিকার পেয়েছে তাঁরই সুযোগ্য সন্তান। প্রদ্যুতদা যখন চলে গেলেন তখন ফুটবল জগতের চোখে জল। একজন দক্ষ প্রশাসকের জন্য ছিল হাহাকার। অনেক পথ পেরিয়ে আজ আবার দত্ত পরিবারের ঐতিহ্যের গৌরব নিয়ে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে এসেছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন নতুন কিছু ভাবনা চিন্তার সুযোগ এসেছে, সাধারণেরও পছন্দ এবং চাহিদা হয়েছে ভিন্নতর। আমি আশাবাদী এই সমাজটা সঙ্গে নিয়েই আই এফ এর নতুন কর্ণধার এগিয়ে যাবেন। কুসংস্কার মুক্ত করবেন ফুটবলের জগৎ, আজ বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার লগ্নে। তার কর্মযজ্ঞে বাস্তবায়িত হবে প্রদ্যুতদার অপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি। আই এফ এ-র অধিকারের সীমানা প্রসারিত হোক। শুধু ময়দানের বৃহৎ ক্লাবগুলি নয়— জেলায় জেলায় পৌঁছে যাক সাহায্যের হাত। শুধু পূজা আর মেলা নয়, ক্লাবগুলি হোক খেলামুখর। গ্রামে গঞ্জে, শহরের মাঠে, পার্কে, বস্তিতে, অলিতে গলিতে পায়ে পায়ে ফুটবল গড়াক। তবেই তো একদিন উঠে আসবে স্বপ্নের রাজকুমারেরা। কন্যাশ্রীতে লাগুক ফুটবলের দোলা। মুক্তি পাক প্রদ্যুতদার স্বপ্নরা পরম্পরার পথ বেয়ে। বাংলার ফুটবলের ইতিহাসে অনির্বাণ শিখায় প্রজ্জ্বলিত থাকুক প্রদ্যোৎ দত্ত স্মরণ।

ভারতীয় ফুটবলে দরকার ছিল

তাপস রায়

(রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)

ছোটবেলা থেকেই দত্ত পরিবারের সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিপদ দত্ত। তাঁরই দুই সুযোগ্য সন্তান বিশ্বনাথ দত্ত এবং প্রদ্যুত দত্ত। বাংলা তথা ভারতবর্ষে খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশুদা এবং প্রদ্যুতদার অবদান সর্বজনবিদিত।

বিশুদা দীর্ঘদিন ধরে আই এফএ থেকে সি এ বি এমনকি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সদর্পে বিচরণ করেছেন। সেদিক থেকে প্রদ্যুতদা অবশ্য বেশিদিন সুযোগ পাননি, অকালেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

প্রদ্যুতদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পল্টু দাসের মাধ্যমে। সালটা সম্ভবত ১৯৭৫ বা ৭৬। প্রথম দিন থেকেই তাঁর স্নেহভাজন হব ভেবেছিলাম। বিশুদাও আমাকে স্নেহ করতেন। এরকম দু-জন কিংবদন্তি ক্রীড়াব্যক্তিত্বের স্নেহভাজন হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

কলকাতা তথা বাংলার ফুটবল প্রসারে একটা বড় ভূমিকা ছিল বিশুদার। প্রদ্যুতদা ছিলেন তাঁর মেজদার যোগ্য উত্তরসূরি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনওরকম চাপের কাছে মাথা নত করেননি। আই এফ এ একটা স্বশাসিত নিরাপদ সংস্থা। এই ব্যাপারে তিনি কারও সঙ্গে আপস করেননি। এমনকী তৎকালীন রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতেও পিছপা হননি।

তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ক্রীড়া সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি তিনি ছিলেন যথার্থই একজন সমাজসেবী। সরাসরি রাজনীতি না করলেও তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। সেক্ষেত্রে কোনও রকম গোপনীয়তা অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ্যে না এনে শুধু দূর থেকে সমর্থন করেননি। প্রকাশ্যেই মুখ খুলেছেন। যেমন নয়ের দশকে মমতা ব্যানার্জির ডাকে 'সবুজ বাঁচাও' আন্দোলনে প্রকাশ্যে জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন সিধু-কানু-ডহর এবং বি বা দী বাগে।

তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান। উচ্চশিক্ষিত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। অত্যন্ত স্নেহ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতার লড়াকু মানসিকতা তাঁর মন জয় করেছিল। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে মমতার মধ্যে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রিত্বের

ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাঁর অনুমান যে ভুল ছিল না সেটা পরবর্তীতে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। বলতে দ্বিধা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে মমতাকে দেখে যেতে পারলেন না।

তিনি ছিলেন বাংলাপ্রেমী। তাঁর দেশাত্মবোধ আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। প্রশাসক হিসাবে তাঁর তেজস্বী ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। পাশাপাশি তিনি ছিলেন অসম্ভব জেদি ও সাহসী।

তাঁর চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কোনও বিশেষ দলের প্রতি দুর্বলতা না থাকা। আমরা রাজনীতি করলেও অনেকের মধ্যেই মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের প্রতি একটু হলেও দুর্বলতা থাকে। সেদিক থেকে প্রদ্যুতদা ছিলেন ব্যতিক্রম। পল্টুদার সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের অন্তরঙ্গতা। অন্তরঙ্গতা ছিল মোহনবাগানের টুটু বসু, বলরাম চৌধুরির সঙ্গেও। কিন্তু তাঁরা কেউই প্রদ্যুতদার থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারেননি। এ ব্যাপারেও তিনি ছিলেন বিশুদার যোগ্য উত্তরসূরি। বিশ্বনাথ দত্ত যেমন সামলেছেন জ্যোতিষচন্দ্র গুহ এবং ধীরেন দে-র মতো দুই প্রবাদপ্রতিম সচিবকে। সেরকম প্রদ্যুতদাও সামলাতেন প্রবল পরাক্রমশালী কর্মকর্তাদের। বলতে দ্বিধা নেই এই ব্যাপারে আমরা অর্থাৎ রাজনীতির লোকেরাও সব সময় কঠোর হতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রেই মেপে পা ফেলতে হয়। জনপ্রতিনিধি হিসাবে অনেক কিছু ভেবেচিন্তে পা ফেলতে হয়। অথচ একটা ক্রীড়াসংস্থার কর্ণধার হিসাবে তিনি সব পরিস্থিতি সাবলীলভাবে সামলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একশো শতাংশ নিরপেক্ষ।

এই মানুষটিকে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্ণধার হিসাবে খুবই প্রয়োজন ছিল। বাংলার ফুটবলের বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে যন্ত্রণা হয়। তখনই মনে পড়ে প্রদ্যুতদার কথা। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলার ফুটবলের অবস্থা এরকম অসহায় হত না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁকে সত্যিই খুব প্রয়োজন ছিল। একবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু পারলেন না। কেন পারলেন না? থাক সে কথা।

সবার আগে ছিল আই এফ এ-র সম্মান

ডঃ নীলিমেশ রায়চৌধুরী

(রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)

তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁকে যতটা দেখেছি দূর থেকে। তাঁর সম্পর্কে জেনেছি খবরের কাগজের মাধ্যমে। যতটুকু দেখেছি এবং জেনেছি তাতে প্রদ্যুত দত্ত সম্পর্কে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি তাহল আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রশাসক হিসাবে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অন্যরকম। পূর্বসূরি কোনও সচিব বা শীর্ষকর্তাকে অনুসরণ করে তিনি ফুটবল সংস্থা পরিচালনা করেননি। তিনি কাজ করেছেন নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে। সেক্ষেত্রে তিনি কঠোর হতেও দ্বিধা করেননি।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত-র সাহায্যে তিনি আই এফ এ-র সচিব হতে পেরেছেন। এই ধারণাটা একদমই ঠিক নয়। কারণ প্রদ্যুত দত্ত সংগঠক হিসাবে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব থেকে। যতদূর জানি জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব পরিচালনার সময় থেকেই তৎকালীন আই এফ এ-র পরিচালকদের অনেক কাজকর্মই পছন্দ হত না প্রদ্যুতবাবুর। সেই কারণে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ময়দানের বেশ কিছু ক্লাবকে সংগঠিত করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। এক্ষেত্রে দাদা বিশ্বনাথ দত্ত-র কোনও সহযোগিতা ছিল না। একটু চাপা স্বভাবের ছিলেন। প্রচারের বাইরে থেকে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন।

আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে বলতেই হবে তিনি চলতেন নিজস্ব চিন্তাধারায়। এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। এককথায় ব্যতিক্রমী প্রশাসক। আবার নিজস্ব চিন্তাধারার শামিল হতে অন্যদের প্রভাবিত করেছেন বলে শুনিনি।

নিজস্বতার কথা বলছিলাম। তার জ্বলন্ত উদাহরণ ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে নেহরু গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট। তাঁর আগে বিশ্বনাথ দত্ত আই এফ এ শিল্ডের খেলা জেলার মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি জুনিয়র ন্যাশনালের খেলাও পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে। এসবই ছিল সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা। সেক্ষেত্রে প্রদ্যুত দত্ত বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে নেহরু গোল্ড কাপের মতো আন্তর্জাতিক মানের একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা শিলিগুড়ি থেকে পরিচালনা করে।

তিনি ছিলেন যথার্থই একজন দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি

উৎসবকে সামনে রেখে যেমন ১৯৮৮ সালে নেহরু গোল্ড কাপকে বেছে নিয়েছিলেন সেরকম ১৯৮৭ সালে কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসাবে পাঞ্জাব থেকে উড়িয়ে এনেছিলেন জার্নেল সিং-কে। এ ব্যাপারে প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সম্মানিত করেছিলেন মোহনবাগান রত্ন-কে।

নিজে ছোট ক্লাব থেকে আই এফ এ-র শীর্ষপদে উঠেছেন। স্বভাবতই ময়দানের ছোট ক্লাবগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই বলে কোনও বিশেষ ক্লাবের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল না। এমনকি নিজেদের ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফের প্রতিও। পাশাপাশি বড় কোনও ক্লাবের প্রতিও তাঁর দুর্বলতা ছিল না। তাঁর কাছে সবার আগে ছিল আই এফ এ-র সম্মান বজায় রাখা। এ ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনে তিন বড় ক্লাবের বিপক্ষেও কঠোর হয়েছেন। ঐতিহ্যশালী মহামেডান ক্লাবকে সাসপেন্ড করতে যেমন দ্বিধা করেননি সেরকমই ইস্টবেঙ্গল ১৯৮৯ সালে এবং মোহনবাগান ১৯৯১ সালে আই এফ এ শিল্ডে খেলতে অস্বীকার করার পরেও পিছপা হননি। এক্ষেত্রে কোনও বিশেষ ক্লাবের প্রতি দুর্বলতা দেখিনি। সবসময়ই স্বচ্ছতার সঙ্গে সংস্থা পরিচালনা করেছেন।

ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেন

সুভাষ ভৌমিক

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার ও বিদগ্ধ প্রশিক্ষক)

ফুটবল জীবনে জ্যোতিষ চন্দ্র গুহ, ধীরেন দে-কে খুব কাছে থেকে দেখেছি। দু-জন ছিলেন দুই বড় ক্লাবের কর্ণধার। আই এফ এ-র কর্ণধার হিসাবে দেখেছি বিশ্বনাথ দত্ত এবং অশোক ঘোষকে। এই চারজনের পরেই যাঁর নামটি আসবে তিনি হলেন প্রদ্যুত দত্ত। প্রদ্যুতদা-কে খুব কাছে থেকে দেখেছি, তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। সমস্যায় পড়লে ছুটে গেছি। তিনি সবসময়ই সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গভীর হল ১৯৮৬ সালে, জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কর্মচারী হিসাবে। ইনস্টিটিউটের মূল ভবন শিয়ালদহ কেন্দ্রের বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। পর্যবেক্ষণের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমার পর্যবেক্ষণে তাঁর আস্থা অর্জন করেছিলাম।

ইনস্টিটিউটে আমার পদ ছিল 'পাবলিক রিলেশন ম্যানেজার' হিসাবে। আমার মূল দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের 'বায়োডাটা' নিঁখুতভাবে রাখার। কীভাবে সেটা করতে হবে এই ব্যাপারে আমাকে গাইড করেছেন। তাঁর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, 'যোগ্যতা থাকা সত্বেও কোনও ছাত্রকে বঞ্চিত করা যাবে না।' সেই হিসাবে প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ক্রমতালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোনও কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউতে ডাকার ক্ষেত্রে মেধা অনুযায়ী তালিকা পাঠাতে অসুবিধা হত না। এই ব্যাপারটা হাতে ধরে শিখিয়েছেন প্রদ্যুত-দা।

জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টিস ক্লাবের কর্ণধার হিসাবে তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। আমাকে ফুটবল কোচ হিসাবে দায়িত্ব প্রথম দিয়েছিলেন প্রদ্যুতদা। ১৯৮৬ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টিস ক্লাবের কোচ হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় থেকেও ভালো দল তৈরি করতেন। দল গঠনের ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। ১৯৮৭ সালে সুরজিৎ সেনগুপ্ত ক্লাব ফুটবলে না খেললেও আমার অনুরোধে তখন দলে নিয়েছিলেন। আমার নির্বাচন যে ভুল ছিল না সেটা বেশ কয়েকটা ম্যাচে সুরজিৎ প্রমাণ করেছিল। আমাদের দলে বেশিরভাগ ফুটবলারই

ছিল অনভিজ্ঞ-তরুণ। ওদের গাইড করার জন্য দরকার ছিল সুরজিতের মতো একজন পোড় খাওয়া নেতার। সেই গুরু দায়িত্ব সুরজিৎ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিল। সীমিত শক্তি নিয়েও জর্জ টেলিগ্রাফ হতাশ করেনি। এই ব্যাপারে প্রেরণা দাতা ছিলেন প্রদ্যুতদা।

১৯৮৬-৮৭ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের কোচ ছিলেন নিমাই গোস্বামী, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন বিদগ্ধ কোচ অরুণ সিনহা। আমার কোচিং ডিগ্রি ছিল না বলে ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এতটাই দূরদর্শী ছিলেন, তাই বুঝেছিলেন সিনিয়র ফুটবলারদের সামলাবার কাজটা আমাকে দিয়ে হবে। ম্যানেজার হিসাবে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের কাজ করার পাশাপাশি দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমার ভূমিকা থাকত। বলতে দ্বিধা নেই এই ব্যাপারে প্রদ্যুতদা এগিয়ে দিয়েছিলেন। সেবারে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ফাইনালে প্রদীপদা-র প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় রেলওয়ে দলের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিলাম। ফাইনালে নিয়মিত সাত জনকে বাইরে রেখে দল গড়েছিলাম। এই ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন তুললেও প্রদ্যুতদা আমল দেননি। কোচিং জীবনে একবারই ভারতীয় দলের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। ১৯৮৯ সালে এই দায়িত্ব পেয়েছিলাম প্রদ্যুতদা-র জন্যই।

১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ আয়োজন আই এফ এ সচিব হিসাবে প্রদ্যুতদা-র সেরা সাফল্য। সেবারের প্রতিযোগিতা বর্ণময় করেছিলেন। ঘরে, বাইরে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন তিনি। সেই আসরে প্রদীপদা (ব্যানার্জি), শান্ত মিত্র এবং আমাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে। তবে ঘুরে বেড়াবার জন্য নয়। আমাদেরও কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রতিটি ম্যাচে ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বুঝতেই পারছেন তাঁর এই চিন্তাধারা কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কতটা ভাবতেন!

কোচিং জীবনে প্রথম সাফল্য তাঁর জন্যই

শ্যাম থাপা

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার)

খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর আমি কয়েকটা বছর কোচিং করিয়েছি। সেক্ষেত্রে কোচিংজীবনে আমার সেরা সাফল্য অবশ্যই ১৯৮৯ সালে বাংলা দলের কোচ হিসাবে সন্তোষ ট্রফি জয়। দীর্ঘ ৪ বছর বাদে বাংলা সেবার ভিনরাজ্যের মাঠ থেকে সন্তোষ ট্রফি অর্থাৎ জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই হিসাবে আমি একটা আলাদা তৃপ্তি পাচ্ছি দীর্ঘ ৩৪ বছর বাদে আজও। আর এই ব্যাপারে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব আই এফ এ-র তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত দত্তর কাছে।

সেবার সন্তোষ ট্রফির আসর বসেছিল আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আসামের রাজধানী গৌহাটীতে। কোচিং সিলেকশন কমিটিতে আমার নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রবল সমর্থন ছিল প্রদ্যুতদার। দল নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর দফতরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন কয়েকটা ব্যাপারে আমার মতামত তাঁকে জানিয়েছিলাম। আমি এমন একটা দল চেয়েছিলাম যারা বাংলার হয়ে 'অল আউট' ঝাঁপাবে। সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন তৎকালীন তারকা আমার পছন্দের তালিকায় ছিল না। যতদূর মনে পড়ছে আমার তালিকায় এমন চার-পাঁচজনের নাম ছিল যারা তখন দুরন্ত ফর্মে। তাদের নাম বাদ কেন জানতে চেয়েছিলেন প্রদ্যুতদা। আমি তখন কোনও রকম রাখঢাক না রেখেই কারণটা বলেছিলাম। কারণ একটাই। সেরা ফর্মে থাকলেও অনেক সময় তাদের খেলতে অনীহা। যা নাকি দলগত সংহতি গড়ার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়। আমি দেখলাম সচিব হিসাবে তিনিও আমার কথাকে গুরুত্ব দিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারগুলো তিনিও অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন। শুধু একজনের নাম তিনি মেনে নিতে পারেননি। বলেছিলেন, এই বিশেষ ফুটবলারটি আমার দলে দরকার। তোমাকে সব সময় সহযোগিতা করবে। পরবর্তীতে দেখলাম তাঁর কথাটা ১০০ শতাংশ সঠিক। সেই ফুটবলারটির নাম অবশ্য লেখার মাধ্যমে জানাচ্ছি না। তবে যে কথা অবশ্যই বলতে হয় তাহল প্রদ্যুতদার দূরদর্শিতা। তিনি কোনও বড় দলের কর্মকর্তা না হয়েও প্রতিটি ফুটবলার সম্পর্কে খবর রাখতেন। রাজ্য দলের জার্সি গায়ে কে কতটা নিজের সেরাটা উজার করে দেবেন তিনি বুঝতেন।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ম্যানেজার নির্বাচনের ক্ষেত্রে। সেবারে বাংলা দলের ম্যানেজার ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক চন্দন ব্যানার্জি। ১৯৬৬ সালে কলকাতায় প্রথম যখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসেছিলাম সে বছর অধিনায়ক ছিলেন চন্দনদা। দলে একাত্মতা আনার ব্যাপারে চন্দনদার আন্তরিকতা প্রথম বছরেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার ফুটবলজীবনে এটা একটা বড় প্রাপ্তি। চন্দনদা হলেন ফুটবলারদের 'মাইডিয়ার পার্সন'। স্বভাবতই সেবারের দলে একাত্মতা আনার কাজটা অনেকটাই সহজ হয়েছিল আমার পক্ষে।

বলতে দ্বিধা নেই ১৯৮১ সালের পর ভিন রাজ্যের মাঠে বাংলা আর সন্তোষ ট্রফি জেতেনি বলে আমাদের দলে মানসিক একটা চাপ সবসময়ই ছিল। ব্যাপারটা সচিব হিসাবে তিনিও উপলব্ধি করেছেন। তাই একটা দল গঠন করে পাঠিয়েই চুপচাপ কলকাতায় বসে থাকেননি। গোটা দলকে চাঙ্গা রাখতে এখান থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। শানুদা (শান্ত মিত্র), সুভাষ ভৌমিক প্রতিযোগিতা চলাকালীন গৌহাটি গিয়ে ফুটবলারদের উৎসাহিত করেছেন।

আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করে। বিস্তারিত তথ্যে যাচ্ছি না তবে এটুকু বলতে পারি তাঁর মতো একজন দূরদর্শী দক্ষ প্রশাসকের অভাব আমরা এখন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি।

তিনি এতটাই দূরদর্শী ছিলেন যে, বাংলায় একটা ফুটবল অ্যাকাডেমির জন্যও সচেষ্ট ছিলেন। ভবিষ্যতে বাংলার ফুটবলকে মাথা উঁচু করে চলতে গেলে একটা ফুটবল অ্যাকাডেমি অত্যন্ত জরুরি। ব্যাপারটা যে কতটা জরুরি সেটা গত কয়েক বছর ধরে আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর স্বপ্ন সফল করতে পারলেন না। অকালেই চলে গেলেন।

আমাকে স্নেহ করতেন, তবু তাঁকে ভয় পেতাম

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার)

আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তবু আমি তাঁকে ভয় পেতাম। সামনে গিয়ে অনেক কথাই বলতে পারতাম না। কিন্তু তিনি এতটাই বিচক্ষণ, দূরদর্শী ছিলেন যে, কী বলতে চাইছি সেটা যেন আগে থেকেই বুঝতে পারতেন। খেলতে নেমে এরকম বেশ কয়েকজন ফুটবলারের পাশে খেলেছি বা যাঁদের খেলা দেখেছি তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজনকে দেখেছি যাঁরা তাঁর প্রতিপক্ষ দলের ফুটবলার কী করতে পারেন যেন আগে থেকেই বুঝতে পারতেন। যেমন অরুণ ঘোষ, সুধীর কর্মকার, অশোক ব্যানার্জি। প্রদ্যুতদা ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। তবে ব্যতিক্রম হল ফুটবল মাঠে হয় লড়াই, আর প্রদ্যুতদার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন। তাহল একজন ফুটবলার কী জন্য তাঁর কাছে এসেছেন ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া। ফুটবলারদের পাশে থাকতেন, স্বভাবতই ফুটবলাররাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারতেন।

উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রদ্যুতদা সর্বস্তরে ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন। আমি আগের বছর পুলিশ এ সি ক্লাবে খেলেছিলাম। ১৯৭৬ সালে কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীঘাটে সই করতে পারলাম না কারণটা অবশ্যই প্রদ্যুতদা। হঠাৎই জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের একজন কর্মকর্তা, প্রাক্তন ফুটবলার অনিল সাহা একদিন সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। কারণ আমার দাদা বাদল এবং আমিও তখন কালীঘাটে খেলব বলেই মনস্থির করে ফেলেছি। একদিন বাদে সকালবেলা হাজির হলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের তৎকালীন ফুটবল সচিব হৃষীকেশ ভট্টাচার্য। আমি রাজি আন্দাজ করে তিনি বিকালে জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুতে যাওয়ার জন্য বলে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু তাঁর কথামতো জর্জ তাঁবুতে যাইনি। কিন্তু ঘটনা হল আমি যে যাব না ব্যাপারটা যেন আন্দাজ করেছিলেন প্রদ্যুতদা। তাই বিকেলে নিজেই তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে। ঘরে ঢুকে কোনও কথা বলারই সুযোগ দিলেন না। মাত্র এক কাপ চা খেয়েই আমাকে জামা, প্যান্ট গোছাতে বললেন। আমি যেন

তখন প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনটা ছিল শনিবার। দু-দিন প্রদ্যুতদাদের ভবানীপুরের বাড়িতে থাকার পরে সই করেছিলাম জর্জ ক্লাবে। টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও কথাই হয়নি। আমার একটাই শর্ত ছিল তাহল দলে সুযোগ পাওয়া। আমাকে প্রথম চারটে ম্যাচ সুযোগ দিতে বলেছিলাম।

জর্জে সই করার পরে খেলতে গিয়েছিলাম ব্যাঙ্ককে এশীয় যুব ফুটবলে। ফিরে এসে ক্লাবের হয়ে লিগে প্রায় নিয়মিত খেলেছিলাম। শিল্ডের খেলা যখন চলছে তখন শ্রীনগরে জুনিয়র ন্যাশনালের খেলা চলছিল। সেমিফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি হয়েছিল জর্জ। বাংলা দল ট্রেনে ফিরলেও আমি ফিরেছিলাম প্লেনে। আমাকে ছাড়া সেমিফাইনালে জর্জের দল গড়তে তিনি চাননি। এতটাই আস্থা অর্জন করেছিলাম।

পূজোর পর ডি সি এম-এর টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। একনাগাড়ে বেশ কয়েকটা দিন ঘরে থাকতে পারিনি বলে আমার মা তখন রাজি ছিলেন না। ক্লাবে খবরটা যেতে প্রদ্যুতদা পাঠিয়ে ছিলেন ক্লাবের সক্রিয় সদস্য আদিত্য চৌধুরিকে। আদিত্যদা আমার মায়ের দুটো পা ধরে বলেছিলেন, 'মাসিমা, এবার অনুমতি দিন। মনাকে ছাড়া প্রদ্যুতদা দল পাঠাবেন না বলেছেন। ওকে সঙ্গে নিয়ে না গেলে প্রদ্যুতদা ঘরেই ঢুকতে দেবেন না।'

১৯৭৭ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দিয়েছিলাম। আমার অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছিল সেবার। ক্লাবে প্রদ্যুতদার সহকর্মীরা অনেকেই তখন আমার জর্জ ছাড়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের ধারণা ছিল, ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে আমি মানিয়ে নিতে পারব না। এমনকি আমি ইস্টবেঙ্গলে সই করার দু-একদিন বাদে — প্রদ্যুতদাকে সঙ্গে নিয়ে বাচ্চুদা এবং পুঁটেদা আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। তখন সইয়ের পর ১০ দিন প্রত্যাহারের সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু ঘটনা হল, প্রদ্যুতদা নিজেই চাননি যে আমি সই প্রত্যাহার করি। তিনিও আমার ইস্টবেঙ্গলে সই করার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে যে খুশি হয়েছিলেন। জর্জ থেকে একজন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন ব্যাপারটা তাঁর কাছে ছিল আনন্দের। আমার ঘনিষ্ঠ একজনকে ডেকে বলেছিলেন, 'মনা যেন সই উইথড্র না করে'। আমিও মনেপ্রাণে চাই এবছরটা ইস্টবেঙ্গলেই খেলুক। সেদিন পুঁটে, বাচ্চুদের মন রাখতে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

প্রদ্যুতদা আমার কাছে ছিলেন একজন অভিভাবকের মতো। এক বছর বাদে আর একটি ঘটনার কথা বলছি। পরের বছর ১৯৭৮ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রশাসনে পালাবদল হল। নতুন কর্মসমিতি আমার জায়গায় সুব্রত ভট্টাচার্যকে সই করাবার পরিকল্পনায় ছিল। ময়দানের বাতাসে খবরটা চাউর হতে সময় লাগেনি। মনোরঞ্জনকে ইস্টবেঙ্গল রাখবে না, স্বভাবতই প্রদ্যুতদার কানেও খবর পৌঁছেছিল।

দলবদল শুরুর দিন সকালে আমার মেজদাদা বাদলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সদলবলে হাজির হয়েছিলেন প্রদ্যুতদা। দাদা বাদলের সঙ্গে আমাকেও তুলে নিলেন। আমিও তখন মনেপ্রাণে জর্জ টেলিগ্রাফে ফিরে আসার কথা ভাবছি। আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে তুললেন তাঁদের সাবেক বাড়ি ভবানীপুরে। সেখানে জর্জের অন্য ফুটবলাররাও ছিলেন। একটু বাদেই প্রদীপ দত্ত, শিবব্রত নাথ, অমিত গুহ, সঞ্জীব চৌধুরি, আমার দাদা বাদলকে নিয়ে প্রদ্যুতদার গাড়ি রওনা দিল আই এফ এ অফিসের দিকে। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিলেন না। কেন নিলেন না ব্যাপারটা তখনও বুঝতে পারিনি। আমি তখন আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সই করার পর ফুটবলাররা ফিরে আসার পর আমাকে ডেকে তুললেন। বেশ মনে আছে অমিত, বাদল এবং আমি তাঁর বাড়ির পাশে ইন্দিরা সিনেমা হলে 'স্বাতী' ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। প্রদ্যুতদা আগেই টিকিট কেটে রেখেছিলেন।

এদিকে আমাকে প্রদ্যুতদার ডেরায় দেখে তাঁর মেজদাদা কিংবদন্তি ক্রীড়া প্রশাসক বিশ্বনাথ দত্ত একটু অবাকই হয়েছিলেন। তিনি এবং প্রদ্যুতদার সেজো দাদা প্রণব কুমার দত্ত নাকি প্রদ্যুতদার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চেয়েছিলেন আমাকে কি জর্জ সই করাবে? কাজটা ঠিক হবে না নাকি বলেছিলেন। তখন প্রদ্যুতদা বলেছিলেন, 'মনাকে জর্জে সই করাবার কোনও পরিকল্পনাই নেই। ওর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কথা বলছে না। ভুল করে অন্য কোনও দলে যাতে চলে যেতে না পারে সেজন্য এখানে আটকে রাখলাম।' আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন আমারই ঘনিষ্ঠ একজনকে কথাটা বলেছিলেন। এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে জন্য দাদা বাদলের সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন ইস্টবেঙ্গল আমার কাছে আসবেই। ঠিক তার একদিন বাদেই ইস্টবেঙ্গল হাজির হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। সেদিনই সই প্রত্যাহার করে ইস্টবেঙ্গলে থেকে গিয়েছিলাম। তারপর আর আমাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ৪১ বছর বাদে আজও সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। এখনও ভাবি সেদিন যদি আমাকে ওইভাবে তুলে নিয়ে না যেতেন তাহলে আমি হয়তো অন্য কোনও ক্লাবে সই করে বসতাম।

১৯৮৬-৮৭ সালের একটা ঘটনা বলছি। ১৯৮৩ সালে রোভার্স কাপের সেমিফাইনালের একটা ঘটনা। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন মিহির বসু, দেবাশিস রায়, ভাস্কর এবং আমাকে সাসপেন্ড করেছিল। যদিও তারপরেও আমি নেহরু কাপে ভারতীয় দলে খেলেছিলাম। এদিকে ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল নেহরু কাপ। বাংলার মাটিতে খেলা, আমাকে বাদ দিয়ে দল গঠন হতে পারে না। আমার সাসপেনশন তুলে ফেলবেন এরকম পরিকল্পনা ছিল প্রদ্যুতদার। সুভাষ ভৌমিক তখন প্রদ্যুতদার খুব কাছে থাকতেন। তিনিই আমাকে প্রদ্যুতদার বাড়িতে আসার জন্য খবর পাঠালেন। সেখানে আচমকাই ভারতীয় দলে খেলার প্রস্তাব

শুনে আমি অবাকই হয়েছিলাম। আমি সেই সময় আন্তর্জাতিক আসরে খেলার চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলাম সন্তোষ ট্রফি নিয়ে। কারণ তার আগে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫, একটানা তিন বছর বাংলার ঘরে সন্তোষ ট্রফি আসেনি। ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল অপমানজনক। তাই আমি জাতীয় দলে ফেরার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলাম, তিন বছর আমরা সন্তোষ ট্রফি জিততে পারিনি। এ বার কলকাতায় খেলা। এ বারও জিততে না পারলেও মান, সম্মান থাকবে না। জাতীয় দলে ফেরার কথা পরে ভাবা যাবে। আমার যুক্তি প্রদ্যুতদা মেনে নিয়েছিলেন। সুভাষদা এবং আমার ওপর ভরসা রেখেছিলেন। সেবারে বাংলা দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন বিদগ্ধ কোচ অরুণ সিনহা। কোচ ছিলেন আমাদের পূর্বসূরি খ্যাতনামা ফুটবলার নিমাই গোস্বামী, আর সুভাষদা ছিলেন ম্যানেজার। বলতে দ্বিধা নেই ম্যানেজার নির্বাচন যে কতটা সঠিক ছিল সেটা প্রতিযোগিতা শুরুর দিন থেকেই আমরা উপলব্ধি করেছি। আমরা ফাইনালে ভারতীয় রেল দলকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি জিতেছিলাম। প্রসঙ্গত রেল দলের কোচ ছিলেন প্রদীপদা, (পি কে ব্যানার্জি)। মানতেই হবে বাংলা দলের সাফল্যের পিছনে একটা বড় অবদান ছিল ম্যানেজার হিসাবে সুভাষ ভৌমিকের।

দু'বছর বাদে বাংলা আবার সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল অলোক মুখার্জির নেতৃত্বে। সেবার আমাদের কোচ ছিলেন শ্যাম থাপা এবং ম্যানেজার চন্দনদা (ব্যানার্জি)। খেলা হয়েছিল গৌহাটিতে। ট্রফি জিতে কলকাতায় ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে হাজির ছিলেন প্রদ্যুতদা। এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে, 'থ্রি-চিয়ার্স ফর মনোরঞ্জন' বলে এমন একটা গর্জন করেছিলেন যা নাকি আজও আমার কানে বাজে। আসলে সেবারে তাঁর বেশি উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণ দলে আমরা এমন চারজন ছিলাম যাঁরা জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে সরাসরি বড় দলে যোগ দিয়েছিলাম। ম্যানেজার চন্দনদা ১৯৬৩ সালে, ১৯৭৭ সালে আমি ইস্টবেঙ্গলে। ১৯৮১ সালে অলোক মুখার্জি সে বছরে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডান ক্লাবে এবং ১৯৮৬ সালে সত্যজিৎ চ্যাটার্জি মোহনবাগানে।

হাল ধরবেন কে?

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

('অর্জুন' পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক প্রাক্তন খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার)

১৬ নভেম্বর ১৯৯৪, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সাংসদ। সাংগঠনিক কাজে মমতার সঙ্গে সেদিন আমি ছিলাম বহরমপুরে। দুঃসংবাদটা প্রথমে শোনার পর বিশ্বাস করতে পারিনি।

তবে অসুস্থ হয়ে যখন দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন একটা আশঙ্কা তখন দানা বেঁধেছিল। পরবর্তীতে যখন শুনলাম সুস্থ হয়ে উঠছেন তখন ভেবেছিলাম বিপদটা তাহলে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরে আচমকা এই দুঃসংবাদ বিশ্বাস করিনি।

আমার ফুটবল জীবনে প্রথম ডিভিসনের প্রথম ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফ। তবে সেই সময়ে ১৯৬৯ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের সচিব ছিলেন প্রদ্যুতদা-র মেজদা বিশ্বনাথ দত্ত। সেই কারণে জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের প্রতি একটা আনুগত্য তখন থেকেই ছিল।

এটা ঘটনা, প্রদ্যুতদা যখন ক্লাবের দায়িত্ব নিলেন তখন ফুটবল দলের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। 'জায়ান্ট কিলার' খ্যাত জর্জ টেলিগ্রাফ সেভাবে বড় তিন ক্লাবের কাছে আতঙ্ক ছিল না। সেক্ষেত্রে জর্জ টেলিগ্রাফ আবার স্বমহিমায় ফিরতে শুরু করল প্রদ্যুত দত্তর হাত ধরে।

আমি তখন মোহনবাগানে। অকপটে স্বীকার করছি, জর্জ টেলিগ্রাফকে নিয়ে আমাদের সব সময়েই ভাবতে হত। বিশেষ করে ১৯৭৬ সালে কলকাতা লিগে এবং আই এফ এ শিল্ডে।

পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে আই এফ এ-র সচিব হয়েছেন। সচিব হিসাবে প্রায় ১০ বছর বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় দেখেছি। অনেকে বলতেন আই এফ এ-তে তাঁর সময়ে একনায়কতন্ত্র দেখা গেছে। এই ব্যাপারে আমি মনে করি তখন আই এফ এ পরিচালনার জন্য প্রবল ক্ষমতা বা হিম্মত প্রয়োজন ছিল। কারণ, যখন তিনি চেয়ারে বসেছেন তখন আই এফ এ-র আর্থিক অবস্থা ছিল সঙ্গীন। সেই সময় দৈন্যদশা থেকে তুলে আনার ক্ষেত্রে প্রদ্যুতদা-র ভূমিকা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? তাই প্রতি বছরই তিনি নির্বাচিত হয়ে সচিবের চেয়ারে বসেছেন।

দাদা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনেক প্রাক্তন ফুটবলারের মুখে আই এফ এ সচিব হিসাবে পঙ্কজ গুপ্ত, এম দত্তরায়-এর বিচক্ষণতার কথা শুনেছি। পরবর্তীতে যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে বিশ্বনাথ দত্ত ও অশোক ঘোষকে দেখেছি। এই তালিকায় প্রবলভাবে থাকবেন প্রদ্যুতদা। তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি।

তিনি সব সময়ই বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য ভেবেছেন। ক্রিকেটের যখন রমরমা শুরু হয়েছে তখন থেকেই তিনি বাংলার ফুটবলকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। বাংলার ফুটবলের কৌলীন্য কীভাবে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

আর একটা কথা বলতেই হবে তাঁর সাংগঠনিক দূরদর্শিতার ব্যাপারে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনে কঠোর হয়েছেন, আবার সমঝোতা করেছেন। যেমন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং মোহনবাগান সচিব টুটু বসুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার মনোমালিন্য হলেও পরবর্তীতে সহজভাবে বিতর্ক মিটিয়েছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক সঙ্গে চলতে হবে। আর এই একাত্মতার ক্ষেত্রে দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন।

বাংলার মেয়েদের ফুটবল প্রথম চালু করেছিলেন আমার বউদি, পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণি আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫ সালে। তখন অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন, বলেছিলেন – ‘মেয়েদের ফুটবল খেলা ঠিক নয়’। তবু বউদি পিছিয়ে যাননি। কিন্তু তাঁদের দরকার ছিল ফুটবল সংস্থায় স্বীকৃতি। এই ব্যাপারেও প্রদ্যুতদা বলিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে আই এফ এ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিল মেয়েদের ফুটবল। সেই বছরেই নার্সারি ফুটবল লিগও শুরু হয়েছিল প্রদ্যুতদা-র হাত ধরেই। ১৯৭৯ সালে নার্সারি ফুটবল চালু হলেও পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। প্রদ্যুতদা ছোটদের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ-তে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। এখন তো দলের সংখ্যা বিশাল। আর লিগও চলছে রমরমিয়ে। অর্থাৎ আগামী দিনের কথা মাথায় রেখে তিনি নার্সারি ফুটবলে ক্লাবগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রদ্যুতদা সচিব থাকাকালীন আমাকে একবার বাংলা দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘তোমার সাহস এবং এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতার জন্যই দায়িত্ব দিয়েছি। দলে যাদের প্রয়োজন তাদেরই নেবে। এই ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।’

প্রাক্তন ফুটবলারদের সব সময়ই যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন। আর্থিক ব্যাপারে প্রদ্যুতদার অতি বড় নিন্দুকও তাঁর দিকে আঙুল তুলতে পারবেন না।

পোশাকে-আশাকে সব সময়ই তাঁকে পরিপাটি দেখেছি। পোশাক পরিধানে পরিপাটি থাকার মতো মনের দিক থেকেও তিনি ছিলেন নির্মল। বিপদে-আপদে অনেককে আর্থিক সাহায্য করেছেন বলে শুনেছি।

যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন সেদিন থেকেই বাংলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। প্রদ্যুতদার শূন্যস্থান কি পূরণ হবে? একটা সময়ে ১৯৮৫ সালে আই এফ এ-র দুঃসময়ে তিনি হাল ধরেছিলেন। দেখতে দেখতে প্রায় ২৯ বছর কেটে গেল। কিন্তু এখনও তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হয়নি।

বাংলার ফুটবল এখন দিশেহারা, অভিভাবকহীন। কার হাত ধরে আবার বাংলার ফুটবল ঘুরে দাঁড়াবে? প্রশ্নটা সেখানেই।

অসম্ভব কথাটা অভিধানে লেখা ছিল না

গৌতম সরকার

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার)

১৯৯০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের ঘটনা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখছি সাংবাদিকের ভিড়— কী ব্যাপার! জানতে চাইলে স্ত্রী রাই মুচকি হেসে বলেছিল

একটা ভাল খবর আছে। খবরটা অবশ্য বলেনি। সাংবাদিকের মুখোমুখি হওয়ার পরে তাঁদের কয়েকজনের প্রশ্ন ছিল কবে থেকে প্র্যাকটিসে নামছেন?

কাদের প্র্যাকটিস বুঝতেই পারছিলাম না। সাংবাদিকের কাছ থেকেই জানতে পারলাম আই এফ এ থেকে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের কোচ হিসাবে আমার নাম নির্বাচিত হয়েছে। খবরটা নিশ্চয়ই গর্বের কিন্তু আমি কি পারব এরকম একটা গুরু দায়িত্ব পালন করতে? বিশেষ করে সে বছর থেকেই চালু হয়েছিল সন্তোষ ট্রফি অর্থাৎ জাতীয় ফুটবলে ভূমিপুত্ররাই (অর্থাৎ নিজ রাজ্যে) সেই রাজ্য দলের হয়ে খেলতে পারবে? স্বভাবতই কাজটা আমার কঠিন মনে হচ্ছিল। এরকম যখন ভাবছি তখন ফোন এল প্রদ্যুতদা-র কাছ থেকে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলাম, এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবেনা। কারণ, আমি তখনও কলকাতার কোনও ক্লাবে কোচিং করাইনি। সেখানে সরাসরি একটা রাজ্য দলে! আমার প্রতিক্রিয়া শেষ না হতেই প্রদ্যুতদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'আমি এই গৌতম সরকারকে চিনি না। আমি যে গৌতম সরকারকে চিনি সে সব সময়ই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসে। যে কোনও কঠিন কাজে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় না।' তাঁর কাছ থেকে এরকম একটা বিশেষণ পাওয়ার পরে আমার আর 'না' বলার প্রশ্নই ছিল না।

তিনি পালিয়ে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। সত্যি এই ব্যাপারে আমি তাঁর মতোই। কোনও কঠিন ম্যাচ, প্রতিপক্ষে যত বড় তারকাই থাকুন, কখনও খেলার আগে হার স্বীকার আমার অভিধানে লেখা ছিল না। আর ঠিক এই কারণেই প্রদ্যুতদাকে আমার ভালো লাগত।

তিনি সব সময়ই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসতেন। যে কাজ করতে অন্যরা সাহস পেতেন না, সেখানে প্রদ্যুতদা ছিলেন সবসময়ই ব্যতিক্রম।

প্রবল পরাক্রমশালী মহামেডান ক্লাবকে সাসপেনসন, তারকা ফুটবলারদের

কাছ থেকে জরিমানা প্রভৃতি এই ধরনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে সাহস দেখিয়েছেন।

সর্বোপরি শিলিগুড়িতে নেহরু কাপের মতো আন্তর্জাতিক ফুটবল আয়োজনের দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। টেবিল টেনিসের শহর শিলিগুড়ি রাতারাতি হয়ে উঠল ফুটবলের শহর। গোটা শহরের খোলনলচে বদলে গেল প্রদ্যুত দার একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে।

ফুটবলকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রথমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত ১৯৭৩ সাল থেকে। প্রথমে আই এফ এ শিল্ড, সঙ্গে জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবল। কৃষ্ণনগর থেকে বার্ণপুর, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি— এরকম বেশ কয়েকটি জেলা শহরে। এই ব্যাপারে তিনিই পথ প্রদর্শক। সেক্ষেত্রে প্রদ্যুতদার একেবারে আন্তর্জাতিক আসর করেছিলেন শিলিগুড়িতে। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রথমে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। অনেকে অসম্ভব মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রদ্যুতদার অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। তিনি যে কোনও কঠিন কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতেন এবং সফলও হয়েছিলেন। এই জন্য তাঁর প্রতি সবসময়ই একটা আলাদা শ্রদ্ধা থাকবে।

বাংলার ফুটবলের সাফল্যের পিছনে দত্ত পরিবারের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। সত্তর দশকে বাংলা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া সাফল্য পেয়েছিল তাঁর পিছনে একটা বড় ভূমিকা ছিল প্রদ্যুতদার মেজদাদা, তৎকালীন আই এফ এ সচিব বিশ্বনাথ দত্ত-র। ১৯৬৮ সালে জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় আই এফ এ-র সচিব ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত। যে কোনও কারণে জব্বলপুরে খেলা পিছিয়ে গিয়েছিল। তৎসত্বেও বিচক্ষণ বিশুদা (বিশ্বনাথ দত্ত) বাংলা দলের অনুশীলন বন্ধ করেননি। বাংলা দলে সে বছর ছোটদল থেকে গোলরক্ষক তরুণ বসু, সুধীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরী, সুভাষ ভৌমিক, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, স্বপন সেনগুপ্ত, এবং আমি, নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমাদের কোচ ছিলেন অচ্যুৎ ব্যানার্জি। একটানা প্রায় তিন মাস স্যার অচ্যুৎ ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে আমরা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে নিয়মিত অনুশীলন করেছিলাম। সেই দিনগুলোতে বিশুদা প্রতিদিন সকালে আমাদের টিফিন নিয়ে হাজির হতেন। কোচ, ফুটবলার এবং কর্মকর্তার সঙ্গে একাত্মতা তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্র সরোবর মাঠ থেকেই। ফলস্বরূপ আমরা দাপটের সঙ্গে খেলেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিলাম। দুটি গোলই করেছিল অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত।

পরবর্তীতে দেখা গেছে ১৯৬৮ সালের তিন মাসের শিবিরের সুফল আমরা পেয়েছিলাম। তরুণ, সুধীর, সমরেশ, সুভাষ, সুকল্যাণ, স্বপন, এবং আমি বড় দলের পাশাপাশি জাতীয় দলেও জায়গা করে নিয়েছিলাম।

বিশ্বনাথ দত্ত-র উত্তরসূরি হিসাবে প্রদ্যুত দত্ত-র নামও বলতে হবে। তিনি একই সঙ্গে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব এবং আই এফ এ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন।

তিনি বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবলারকে বাংলা দলের কোচ বা ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সুভাষ ভৌমিক, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম থাপার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দলের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি যখন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম তখন একটা কথা আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—life is a challenge, accept it.

বাংলার ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আরও অনেক পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু....।

আই এফ এ-এর সেরা সচিব

সুব্রত ভট্টাচার্য

('অর্জুন' পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক প্রাক্তন খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার)

প্রদ্যুতদা যখন আমাকে জরিমানা-সহ সাত ম্যাচ সাসপেন্ড করলেন, তখন উনার উপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। তখন আমি জনপ্রিয়তার মধ্যগগনে। রেফারি প্রদীপ নাগের সঙ্গে আমার গণ্ডগোল নিয়ে খবরের কাগজে শিরোনাম। বিতর্ক তুঙ্গে। আই এফ এ সচিব তখন প্রদ্যুত দত্ত। সব কিছু খতিয়ে দেখে আই এফ এ আমাকে সাত ম্যাচ সাসপেন্ড করল। পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। এত বড় শাস্তি হবে ভাবিনি। পরে একদিন প্রদ্যুতদার কাছে দেখা করলাম। উনি বলেছিলেন, 'তোমরাই তো ফুটবলের সম্পদ। তোমাদের শাস্তি দিতে আমাদের ভালো লাগে না। জানি মাথা গরম করে ভুল করে ফেলেছ। কিন্তু অন্যায় তো অন্যায়। এই সচিবের চেয়ারে বসে আমার আর অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। শাস্তি অনিবার্য। নাহলে সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আজ তোমাকে ছেড়ে দিলে কাল অন্যদেরও ছাড়তে হবে। এটা বুঝতে হবে বাবলু। প্রদ্যুতদা সেদিন কথাগুলো বলার পর, আমাকে বললেন,শাস্তি কমানোর জন্য একটা আবেদন করতে। আবেদন করার ফলে সাত ম্যাচের পরিবর্তে তিন ম্যাচ সাসপেন্ড করলেন। কিন্তু জরিমানার টাকা কমাননি।

এই ঘটনার পর থেকে যত প্রদ্যুতদাকে দেখেছি, কাছ থেকে মিশেছি, আমার ধারণা ততই বদলে গিয়েছে। উনি আসলে সত্যিকারের ফুটবলারদের অভিভাবক ছিলেন। সন্তান খারাপ কাজ করলে পরিবারের বাবা-জ্যাঠারা যেমন শাসন করতেন, শাস্তি দিতেন। আবার ভালো কাজ করলে কাছে ডেকে আদর করতেন। ফুটবল ময়দানে প্রদ্যুতদা যেন সেই বাবা-জ্যাঠার মতোই ছিলেন। উনি ফুটবলারদের খুব সম্মানও করতেন।

মানুষটাকে কখনও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখিনি। আপস করতেও দেখিনি। তিন প্রধান কর্তাদের ভয় করতেও দেখিনি। অন্যায় হলে কড়া পদক্ষেপ করেছেন। এতটুকু ভয় পেতেন না। তার বড় প্রমাণ আমাকে শাস্তি দেওয়া এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে সাসপেন্ড করা। তাঁদের জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব আছে। আই এফ এ-এর সচিবের চেয়ারে বসে প্রদ্যুতদা কখনও জর্জ টেলিগ্রাফকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেননি। তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার চেয়ারে বসে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। আমার চোখে প্রদ্যুতদাই হলেন আই এফ

এ-এর সেরা সচিব। তারপরেই থাকবেন অশোক ঘোষ।

উনার আর একটা গুণ ছিল তা হল, কোনও সুপারিশে অযোগ্যদের বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতেন না। আমার সঙ্গে প্রদ্যুতদার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। একদিন তাঁকে বলেছিলাম, আমার পরিচিত তিনজন ফুটবলার আছে। জর্জ টেলিগ্রাফে যদি সুযোগ করে দেওয়া যায়। প্রদ্যুতদা সঙ্গে সঙ্গে আমার তিন তরুণ পরিচিত ফুটবলারদের জর্জের অনুশীলনে সুযোগ করে দিলেন। আমি ভাবলাম তাহলে সইও হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুদিন পর বললেন, আমার সেই তিন ফুটবলার কোচের নজর কাড়তে পারেনি। কাজেই সই করানো যাবে না। কোচই শেষ কথা। এই ঘটনার পর প্রদ্যুতদার উপর আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেই ঘটনার পর দুটি ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, এক, যোগ্য না হলে সুপারিশে কাজ হবে না। অন্তত প্রদ্যুতদার কাছে তো নই। দুই, কোচের স্বাধীনতায় তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাননি। এই প্রদ্যুতদা যখন আমাকে বাংলা দলের কোচ করেছিলেন,তখন দল গড়ার ব্যাপারে আমিই শেষ কথা ছিলাম। কোচ হিসেবে আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সেই বছর মাদ্রাজে গিয়ে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

তিনি বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলাকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনিই শুরু করেছিলেন জেলায় জেলায় মহকুমা স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট। এটা দারুণ ব্যাপার ছিল। আসলে প্রদ্যুতদা তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবল প্রতিভা তুলে আনতে চেয়েছিলেন। তার ফলও পেয়েছিলেন। জেলা থেকে বহু ফুটবল প্রতিভা তুলে এনেছিলেন। পাশাপাশি কর্পোরেট জগতে বাংলার ফুটবলকে যে বিক্রি করা যায় সেই পথ তিনিই দেখিয়েছিলেন। তিনিই তো প্রথম বাংলার ফুটবলে স্পনসর এনেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। নতুন কিছু করতে চাইতেন। আমি যতদুর জানি, ভারতীয় ফুটবলে তিনিই প্রথম ৩ পয়েন্ট ও ১ পয়েন্ট সিস্টেম চালু করেছিলেন। সালটা ঠিক মনে নেই, তবে আটের দশকের শেষ দিকে ময়দানে সেই কুখ্যাত ১১৪ গোলের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর চারটি দলকে সাসপেন্ড করলেন। তার পরের বছরই কলকাতা লিগে ৩ ও ১ পয়েন্ট (ম্যাচ জিতলে ৩ পয়েন্ট আর ড্র করলে ১ পয়েন্ট) সিস্টেম চালু করলেন প্রদ্যুতদা। এখানে বলে রাখা উচিত, প্রদ্যুতদার তিন পয়েন্ট সিস্টেম চালু করার পরে ফিফায় ৩ পয়েন্ট সিস্টেম চালু হয়। যদিও ১৯৮১ সাল থেকে ইংল্যান্ডে ৩ পয়েন্ট সিস্টেম চালু ছিল।

'অর্জুন' খেতাব পাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রদ্যুতদার একটা ভূমিকা ছিল। ১৯৮৪ সালের নেহরু কাপের সময় খবর আসে, 'অর্জুন' খেতাবের জন্য ফেডারেশন আমার নাম প্রস্তাব করতে চলেছে। সেবার ধরেই নিয়েছিলাম 'অর্জুন' পাচ্ছি। কিন্তু পাইনি। সাত বছর পর ১৯৯২ সালে 'অর্জুন' পেয়েছিলাম। তখন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় অন্য কেউ ক্রীড়ামন্ত্রী থাকলে আটকে যেত কি না জানি না। তবে 'অর্জুন'-এর জন্য আই এফ এ-এর তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত দত্ত আমার জন্যও বেসরকারি ভাবে প্রস্তাব রেখেছিলেন।

১৯৯৪ সালে প্রদ্যুতদার মৃত্যুর পর থেকে বাংলার ফুটবল জগতে বিরাট একটা ধাক্কা ছিল। বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। আমার আজ বলতে দ্বিধা নেই, প্রদ্যুতদার মৃত্যুর পর আই এফ এ সেই ভাবে এগোতে পারেনি। এখনকার আইএফএ কাজকর্ম নিয়ে বিশেষ খোঁজখবর রাখি না। ফুটবলের মূল স্রোত থেকে অনেকটাই আমি দুরে। তবে শুনেছি প্রদ্যুতদার বড় ছেলে অনির্বান দত্ত আই এফ এ-এর সচিব হয়ে এসেছেন। বাবার রক্ত ছেলের শরীরে আছে। আশা করি ভালো কাজ করার চেষ্টা অনির্বাণ করবেই। তবে পরিবেশ তো আর আগের মতো নেই। সব কিছুই এখন বদলে গেছে। গড়ের মাঠের পরিবেশ কি আর আগের মতো আছে? অনির্বাণ যদি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে তাহলে ভালো কাজ করবে।

টার্নিং পয়েন্ট জর্জ টেলিগ্রাফ

সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার)

১৯৮৮ সাল। শিলিগুড়িতে অষ্টম নেহরু গোল্ড কাপ। কলকাতার বাইরে এরকম একটা আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট তার আগে কখনও হয়নি। প্রসঙ্গত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সেবারের প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছিল আই এফ এ-কে। আই এফ এ-এর সচিব তখন প্রদ্যুত দত্ত। দায়িত্ব পেয়ে তিনি একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা হল, কলকাতার যুবভারতীতে নয়, প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম শহর শিলিগুড়িতে। কিন্তু বিশাল সমস্যা ছিল আই এফ এ-এর সামনে তা হল, শিলিগুড়িতে তখন বড় মাপের কোনও স্টেডিয়াম ছিল না। বাধা আসবেই। কিন্তু প্রদ্যুতদা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কারণ, তিনি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন তা হল নেহরু গোল্ড কাপের মতো একটা আন্তর্জাতিক ফুটবলকে কেন্দ্র করেই স্টেডিয়াম তৈরি হবে। হয়েছিলও তাই। রাতারাতি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সামলানোর মতো তৈরি হয়েছিল শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম! ৩০/৩৫ হাজার আসন বিশিষ্ট সেই স্টেডিয়াম তৈরির পিছনে প্রদ্যুত দত্ত-র নামটাও নিশ্চয়ই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আসলে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এরকমই ছিল যে, অনেকেই যে কাজটা সম্ভব নয় বলে মনে করতেন প্রদ্যুতদা সেই কাজটাকেই সম্ভব বলে প্রমাণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। হার না মানা চরিত্র। এবং অবশ্যই শৃঙ্খলাপরায়ণ। কোনওরকম বেনিয়ম বরদাস্ত করতেন না। প্রবল চাপের কাছে মাথা নিচু করতেন না। অর্থাৎ পিছু হটতেন না। শিলিগুড়িতে ওই খেলার আয়োজন করতে গিয়ে অনেকরকম বাধা বিপত্তি সামনে এসেছিল। কিন্তু তাঁকে টলানো যায়নি।

শুধু প্রতিযোগিতার আয়োজনই নয়, অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দুটি দেশ সেবার নেহরু কাপে খেলেছিল। পোল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়াও এসেছিল বুলগারিয়া এবং চীন। এই চার দলের মধ্যে পোল্যান্ড এবং বুলগারিয়া দুটি দলই বিশ্বকাপে খেলেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার পাশাপাশি বিশ্ব অলিম্পিকে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। এটা ঘটনা যে দলটা শিলিগুড়িতে খেলেছিল সেই দলটাই সেবার অলিম্পিক ফাইনালে

হারিয়েছিল ব্রাজিলকে। এই দলগুলোকে এখানে আনার ব্যাপারেও মুখ্য ভূমিকা ছিল প্রদ্যুতদার।

সেবার ভারতীয় দলে আমিও খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা গ্রুপের কোনও ম্যাচ জিততে না পারলেও বিশ্বকাপার সমৃদ্ধ পোল্যান্ডকে রুখে দিয়েছিলাম। আমাদের কোচ ছিলেন অমলদা (দত্ত)। তিনিই প্রথম ৪-৪-২ ছকে ভারতীয় দলকে খেলিয়ে ছিলেন। যে জন্য বুলগারিয়া ম্যাচের পর অমলদা-র প্রথা প্রকরণকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন বাংলার ফুটবল জগতের বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। প্রাক্তন ফুটবলার থেকে কোচ, সাংবাদিক অনেকেই অমলদা-র সমালোচনায় মুখর ছিলেন। অমলদা তখন রীতিমতো বিধ্বস্ত। ফুটবল সমাজের ব্যক্তিদের সমালোচনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে একটা দৈনিক সংবাদপত্রে লিখেছিলেন 'হে সমালোচক, তুমি একটা কবিতা লেখ।'

প্রদ্যুতদা তখনও অবিচল। পোল্যান্ড ম্যাচের আগে অমলদাকে বলেছিলেন, 'আজ এ আই এফ এ কর্তারা আসছেন। আপনার সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। আজ একটা জবাব দিতেই হবে।

এতটাই আস্থা ছিল তাঁর কোচের উপরে। পোল্যান্ড ম্যাচে আমাকে দেখিয়ে অমলদাকে বলেছিলেন, 'কেমন লাগছে আমার প্লেয়ারটাকে।'

হ্যাঁ, আমি তো তাঁরই প্লেয়ার। ১৯৮৫ সালে জর্জ টেলিগ্রাফে খেলেছিলাম। নিঃসন্দেহে আমার ফুটবলজীবনে টার্নিং পয়েন্ট।

স্নেহ করতেন, আবার শাসনও করতেন

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার)

১৯৮০ সালের ঘটনা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাদের বেশ কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে এতটাই দুর্ব্যবহার করছিল যখন আমরা বাধ্য হয়েই ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বলতে দ্বিধা নেই আমাদের ফুটবলজীবনে এরকম কঠিন পরিস্থিতি তার আগে কখনও আসেনি। মানসিক দিক দিয়ে তখন আমরা বিধ্বস্ত। সেইসময় একদিন ছুটে গিয়েছিলাম প্রদ্যুতদার কাছে। তিনি তখন বিবেকানন্দ পার্কের কাছে কমলা গার্লস স্কুলের পাশে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। আমাদের মানসিক অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সব ঘটনা শুনে বলেছিলেন, 'ক্লাব তোমাদের রাখবে না। সেরকমই যদি হয় তাহলে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে আসতে পার। এখানে খেলে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট থেকে যা অর্থ আসবে সবটাই তোমরা পাবে। ক্লাব এক পয়সাও নেবে না।' বাস্তবে সেটা তখন সম্ভব ছিল না। কারণ, সবাই তখন ইস্টবেঙ্গলে নিয়মিত খেলছি। সম্ভব যে নয় তিনিও জানতেন। তবু আমাদের যন্ত্রণাটা উপলব্ধি তো করেছিলেন।

তিনি ছিলেন ফুটবলারদের দাদা বা অভিভাবক। আবার সেই কারণেই ফুটবলারদের দিক থেকে কোনও অন্যায়, অভব্যতা পছন্দ করতেন না। সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর। কঠিন শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। 'আমি তোমাদের এত ভালোবাসি, স্নেহ করি, তবু তোমরা কেন নিয়মের বাইরে যাচ্ছ, যেজন্য আমাকে বিব্রত হতে হচ্ছে!' এরকমই ছিল তাঁর মনস্তত্ত্ব। কথায় বলে না, 'শাসন করা তাঁরই সাজে, সোহাগ করে যে।' কোনও বেনিয়ম যেমন বরদাস্ত করতেন না, সেক্ষেত্রে কঠোর হতেন। পাশাপাশি সংশোধন করার সুযোগও দিতেন।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ১৯৮৯ সালে কলকাতা লিগে মোহনবাগান বনাম এরিয়ান ম্যাচে খুব গণ্ডগোল হয়েছিল, সেই গণ্ডগোল সুব্রত ভট্টাচার্য জড়িয়ে পড়েছিলেন। আই এফ এ বাবলুদাকে সাসপেন্ড করেছিল। সাসপেনশন বা বড় ধরনের শাস্তি হবেই বুঝতে পেরেছিলাম। যাতে কঠিন শাস্তি না হয় সেজন্য তাঁর কাছে বাবলুদা এবং আমি গিয়েছিলাম। সাসপেনশন না হলেও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল বাবলুদাকে। সেদিন আমাকেও মজা করে বলেছিলেন 'গণ্ডগোলে তোমার নামও আছে। অন্তত ২০০০ টাকা জরিমানা

হবেই। অগ্রিম বাবদ চেকটি দিয়ে যাও। তাহলে জরিমানাটা বেশি হবে না। নাম না থাকলে টাকাটা ফেরত পাবে।'

তখন আমি সত্যি একটু ভয় পেয়েছিলাম। যদিও রেফারির রিপোর্টে আমার নাম ছিল না। পরে বুঝলাম স্রেফ আমাকে ভয় দেখাবার জন্য কথাটা বলেছেন বা সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এতগুলো কথা বলার কারণ হল, তিনি কোনও ফুটবলারের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তাই এমন কিছু শাস্তি প্রয়োগ করতেন যাতে ফুটবলাররাও সতর্কিত হতেন।

তাঁর সময়ে ফুটবলারদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে কঠোর হতে দেখেছি। এই ব্যাপারটা কিন্তু ফুটবলারদের ভালোর জন্যই। ফুটবলের জন্য বিশেষ করে বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য সবসময়ই চিন্তাভাবনা করতেন। তাঁর সময়ে বাংলার নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ শক্তিশালী ছিল। যে জন্য সর্ব ভারতীয় ফুটবলের কর্তাব্যক্তিরা আই এফ এ-কে সমীহ করতেন। ১৯৮৮ সালে কুইলনে সন্তোষ ট্রফিতে গ্রুপের খেলার দুটো দল গড়পেটা খেলে পরবর্তী রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ব্যাপারটায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন আই এফ এ-এর তৎকালীন সচিব প্রদ্যুতদা। অনৈতিকভাবে বাংলাকে ছিটকে দেওয়ার জন্য জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন ফুটবল ফেডারেশনে।

এই জায়গাতেই অন্য সচিবদের থেকে তিনি ব্যতিক্রম। সবমিলিয়ে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ, নির্ভীক প্রশাসক। আর একটা কথা মনে পড়লে আজও আফসোস হয়। সেটা হল অর্জুন পুরস্কার না পাওয়ার যন্ত্রণা। এই রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রে রাজ্য সংস্থার সুপারিশ করতে হয়। তারপর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয়। আমার ক্ষেত্রে তৎকালীন আইএফএ সচিব হিসাবে প্রদ্যুতদা সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই সময়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছিলেন। তাই তীরে এসেও তরীটা ডুবে গিয়েছিল। 'রাষ্ট্রীয় সম্মান' আমার ভাগ্যে জোটেনি। সে যাইহোক, প্রদ্যুতদা আমার নাম সুপারিশ করেছিলেন। এটাই বড় সান্ত্বনা।

একবারই প্রদ্যুতদার কথা শুনিনি

শিশির ঘোষ

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার)

বাংলা ফুটবলের সফল ক্রীড়া প্রশাসকের নামগুলি বলতে হলে প্রথমেই প্রদ্যুত দত্তর নামটাই আগে আসবে। লম্বা, রাশভারী মানুষ। বাজখাই গলা। বাইরে থেকে প্রথম যখন দেখেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল, মানুষটা গম্ভীর, কঠিন। পরে বুঝেছিলাম তাঁর মনটা ভীষণ ভালো। ফুটবলারদের কাছের মানুষ আর ফুটবলের কাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর নামের পাশে দক্ষ প্রশাসক, ভালো ফুটবল সংগঠক — এই শব্দগুলি অতি পরিচিত। এক কথায় প্রদ্যুতদাকে মূল্যায়ন করা যাবে না।

আমার ফুটবল জীবনে প্রদ্যুত দত্ত নামটা জড়িয়ে ছিল নানান ভাবে। আমি কোনও দিন তাঁদের জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে খেলিনি। তা সত্ত্বেও আমি প্রদ্যুতদার খুব স্নেহের ছিলাম। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তবে ভালোবাসলেও আমার ভুলকে রেয়াত করেননি। তাঁকে নিয়ে লিখতে বসে বহু ঘটনার কথা আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। যেমন, ১৯৯০ সালের কলকাতা লিগের ডার্বি ম্যাচে চিমার সঙ্গে মারামারি করে লাল কার্ড দেখেছিলাম দুজনেই। সেই ঘটনার জন্য আমাকে ও চিমাকে ৯০ দিন মাঠে নামতে দেওয়া হয়নি। সাসপেন্ড থাকলেও নিয়মিত অনুশীলন করে নিজেকে তৈরি রেখেছিলাম। কিন্তু ৯০ দিন মাঠের বাইরে থাকাটা খুব কষ্টের, যন্ত্রণার। কিছু ভালো লাগছিল না। হঠাৎ একদিন প্রদ্যুতদার ডাক পেয়ে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই অভিভাবকের মতো বলতে শুরু করলেন, 'তুই কি মাঠে মারামারি করতে আসিস? নাকি গোল করে দর্শকদের আনন্দ দিতে চাস?' আমি সেদিন মাথা নিচু করে বলেছিলাম, ভুল হয়ে গিয়েছে। আর হবে না। আমার উত্তর শেষ করার আগেই প্রদ্যুতদা বলে উঠলেন, ''কাল মমতার (ব্যানার্জি) কাছে গিয়ে দেখা কর।''

আমার কালীঘাটে যাতায়াত ছিল। অনুপদার কাছে গিয়ে মাঝেমধ্যে ক্যারাম খেলতে যেতাম। যাইহোক, আমাকে যখন মমতাদির সঙ্গে দেখা করতে বললেন তখন তিনি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। আমি তাঁর বাড়িতে যেতেই মমতাদি বলে উঠলেন, 'ও তুমি এসেছ। বসো।' তাঁর কথা শুনেই বুঝে গেলাম তাঁকে আমার আসার ব্যাপারে প্রদ্যুতদা বলে রেখেছিলেন। মমতাদি প্রদ্যুতদাকে বড়দার মতো শ্রদ্ধা করতেন, এটা আমি জানতাম। মমতাদি এ বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চিমাকে

মেরেছ?' আমি ভাবলাম, মিথ্যে বললে অনেক মিথ্যে বলতে হবে। তার থেকে সত্যি কথাটা বলেই দিই। আমি স্বীকার করে বললাম, হ্যাঁ, মেরেছি। শুনে মমতাদি বললেন, 'কতবার মেরেছ?' আমি বললাম, 'একবার।' শুনেই হাসতে হাসতে মমতাদি বললেন, 'মাত্র একবার মেরেছ? ঠিক আছে বাড়ি যাও। মন দিয়ে প্র্যাকটিস করো।'

প্রদ্যুতদা কেন মমতাদির কাছে দেখা করতে বললেন সেটাই প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। মারামারি করেছি লিগের খেলায়। সিদ্ধান্ত নেবে তো আই এফ এ। তাহলে মমতাদির কাছে কেন? এই প্রশ্ন করার সাহস প্রদ্যুতদাকে দেখাতে পারিনি। তবে আমার পরে মনে হয়েছিল, আমি তখন টপ ফর্মে। এই চিমার সঙ্গে মারামারির ঘটনার ফলে যাতে আমি ভারতীয় দল থেকে বাদ না যাই তার জন্য হয়তো কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ছুঁয়ে রাখা। এটাই হয়তো প্রদ্যুতদা চেয়েছিলেন।

যাইহোক, মমতাদির সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েকদিন পর গোলপার্কের কাছে 'হাওড়া মোটরসে'র অন্যতম কর্তা এবং হাওড়া ইউনিয়নের বর্তমান সচিব ইন্দ্রনাথ দের বাড়িতে আরবিট্রেশন বসল। আমি, চিমা গেলাম। দুজনের বক্তব্য শোনার পর পরের দিন আই এফ এতে আমাদের উপস্থিত থাকতে বলা হল। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পৌঁছে গেলাম। প্রদ্যুতদা-সহ আই এফ এ-এর পদাধিকারীরা বসে আছেন। সামনে দুটি চেয়ার আমাদের জন্য। চেয়ারে বসার পর ফিস ফ্রাই, সন্দেশ খেতে দেওয়া হল। আমরা ভুল স্বীকার করে ভবিষ্যতে আর এমনটা করব না তা জানিয়ে দিলাম। প্রদ্যুতদার নির্দেশ মেনে একজন গোলাপি রংয়ের একটি ভাউচার আমাদের ধরানো হল। তাতে দেখলাম আমাদের দুজনকে ৭৮৬ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। কাগজটি আমাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার পর প্রদ্যুতদা হাসতে হাসতে মজা করে বলেছিলেন 'শোন, তোদের এই জরিমানার টাকা আই এফ এ নেবে না। আজকের মিটিংয়ে যে ফিস ফ্রাই, সন্দেশ খেলাম তার দামটা এই টাকায় মেটানো হবে। যা, আর মারামারি করিস না। মন দিয়ে এবার ফুটবলটা খেল।' মাঠে ফেরার অনুমতি পেয়ে সেদিন খুব খুশি হয়েছিলাম। প্রদ্যুতদাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ক'দিন পরেই ডি সি এম ট্রফি। শাস্তি কাটিয়ে ডি সি এমের প্রথম ম্যাচ জেসিটির বিরুদ্ধে আমার করা একমাত্র গোলে সেই দিন মোহনবাগান জিতেছিল।

১৯৮৮ সাল। আমি তখন টপ ফর্মে। সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দল বাছা হবে। সেই বছর বাংলা দলের কোচ হয়েছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। চূড়ান্ত দলে আমার জায়গা হল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফর্মে থাকা সত্ত্বেও বাংলা দলে আমাকে নেওয়া হল না। সেইবার বাংলা কোনও রকমে সেমিফাইনালে উঠেছিল। তখন সবাই নাকি বলেছিল দলে আমাকে প্রয়োজন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কোচ প্রসূনদা আমাকে তাড়াতাড়ি দলের সঙ্গে যোগ দিতে বললেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে

বলে দিয়েছিলাম, 'আমি যাব না।' আমার সিদ্ধান্তের খবর পৌঁছে যায় প্রদ্যুতদার কাছে। তখন মোবাইল ছিল না। বাড়িতে ফোন করে বলেছিলেন, 'বাংলা চ্যাম্পিয়ন হোক তুই চাস না? কেন এমন করছিস। যা খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আয়।' আমি সেদিন বলেছিলাম, 'বাংলা চ্যাম্পিয়ন হোক আমি চাই। কিন্তু আমি খেলতে যাব না। প্রত্যেকের আত্মসম্মান আছে। কোচ দল গড়ার সময় সেই সম্মান দেননি। এখন তো আমি যাব না।' আমার উত্তর শোনার পর প্রদ্যুতদা আর কোনও কথা বলেননি। সেই বছর বাংলা হেরেই ফিরেছিল। আমার ফুটবল জীবনে এই একবারই শুধু প্রদ্যুতদার কথা শুনিনি।

পরের বছর গুয়াহাটিতে সন্তোষ ট্রফির আসর বসেছিল। দল রওনা হওয়ার আগে বেঙ্গল ক্লাবে বাংলার ফুটবলারদের একটা পার্টি দিয়েছিলেন প্রদ্যুতদা। আমাকে ডেকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি রে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবি?' প্রদ্যুতদাকে বলেছিলাম, 'চিন্তা করবেন না। চ্যাম্পিয়ন হয়েই ফিরব।' আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।

এই প্রদ্যুতদার জন্যই আমি সন্তোষ ট্রফির অধিনায়কও হয়েছিলাম। সম্ভবত ১৯৯৩ সাল। আই এফ এ-এর শতবর্ষ। আমি তখন সিনিয়র। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ফলে সেই বছর আমারই অধিনায়ক হওয়ার কথা। হঠাৎ শুনলাম, আই এফ এ-এর সভাপতি জাস্টিস অজিত সেনগুপ্ত বাংলার অধিনায়ক হিসেবে কৃশানুর (দে) নাম প্রস্তাব করে রেখেছেন। কৃশানু না হলে তনুময় বসু হবে অধিনায়ক। সেই বছর বাংলা দলের কোচ ছিলেন নঈমদা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সতীর্থদের জানিয়ে রেখেছিলাম, অধিনায়ক না হলে দলের সঙ্গে যাবই না। ওই সময় আমার বোনের বিয়েও। সতীর্থদের যাব না বললেও আমি ব্যাগ কিন্তু গুছিয়ে রেখেছিলাম। প্রদ্যুতদার ফোন আসবেই তা ধরেই নিয়েছিলাম। ঠিক তাই হল। বাড়িতে ফোন করে প্রদ্যুতদা আমাকে বলে দিলেন, 'শুনলাম তুই নাকি খেলতে যাবি না। শোন, নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবি। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।' স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। শুনলাম তখনও টিম লিস্ট তৈরি হয়নি। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, যদি আমাকে ক্যাপ্টেন না করা হয় তাহলে ট্রেনেই উঠব না। বাড়ি ফিরে আসব। তাতে যা হয় হবে। অজিত সেনগুপ্ত জাস্টিস হতে পারেন। কিন্তু আমার প্রাপ্য সম্মান আটকে রাখার অধিকার অজিতবাবুর নেই। সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছে। আমি উঠছি না। ট্রেন ছাড়ার ৩০ মিনিট আগে আই এফ এ-র এক কর্তার হাত দিয়ে প্রদ্যুতদা সন্তোষ ট্রফির জন্য চূড়ান্ত বাংলা দলের লিস্ট পাঠালেন। লিস্ট দেখলাম আমার নামের পাশে ক্যাপ্টেন লেখা। আর দেরি করিনি। ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম। ফিরে এসেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হয়েই।

আজ সত্যিই প্রদ্যুতদাকে মিস করি। উনি চলে যাওয়ার পর ফুটবলারদের

কাছের করে নেওয়ার মানসিকতার সচিব আমি দেখিনি। প্রদ্যুত দত্ত কেমন মানুষ ছিলেন? সচিব কেমন ছিলেন? এই প্রজন্ম জানেই না। আমাদের দেশে মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর কাজের মূল্যায়ন করা হয়। আমরা যারা প্রদ্যুতদার সংস্পর্শে এসেছি তারা জানি তিনি ফুটবলের ও ফুটবলারদের কাছে কী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যে বইটি প্রকাশ হচ্ছে তা আরও অনেক আগে প্রকাশ করা উচিত ছিল। তবু, দেরিতে হলেও প্রদ্যুতদাকে নিয়ে বই হচ্ছে এটাই ভালো লাগছে।

পিতৃতুল্য

মহম্মদ মুকিম

(প্রাক্তন ফুটবলার, জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব)

কলকাতা ময়দানে আমার প্রথম ক্লাব হল কাশীপুর সরস্বতী। কাশীপুর সরস্বতী ক্লাব তৃতীয় ডিভিশনে খেলত। সেই ক্লাব থেকে ১৯৭৫ সালে যোগ দিয়েছিলাম জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে। আমি নিজেই ভাবতে পারিনি জর্জ টেলিগ্রাফের মতো শক্তিশালী দলে খেলার জন্য ডাক পাব। জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে তখন দল গঠনের ব্যাপারে বড় ভূমিকা ছিল মন্টু ব্যানার্জির। পুঁটেদা নিজেও এই ক্লাবে খেলেছেন। দলবদল শুরুর কয়েকদিন আগে প্রদ্যুতদা নিজেই এসেছিলেন আমার টিটাগড়ের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন বিশ্বস্ত রিক্রুটার – পুঁটেদা, বাচ্চুদা, আদিত্যদা। সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি করে তাঁরা এসেছিলেন। আমাদের মতো একজন সাধারণ পরিবারের বাড়ির সামনে যখন গাড়িটা থামল তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম। একটু পরে আরও অবাক হলাম যখন গাড়ি থেকে নেমে ওঁরা তিনজন আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। আমি তখন জানালার ফাঁক দিয়ে ওদের দেখছিলাম। প্রদ্যুতদা গাড়িতে বসেছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রদ্যুতদা বললেন, ‘গাড়িতে ওঠো’। সবকিছু দেখে আমি তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। তাই কেন ডাকছেন, কোথায় যাব – বলার সুযোগই পেলাম না। সেদিন থেকেই আমার পথ চলা শুরু হল জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে।

সইয়ের পর প্র্যাকটিস শুরু হল। আমাদের প্র্যাকটিস হত জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুর পাশেই সিটি এ সি মাঠে। প্রদ্যুতদা প্রায়ই প্র্যাকটিসের সময় হাজির থাকতেন। জর্জ টেলিগ্রাফের আক্রমণভাগ সেবার যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। মণীশ মান্না, চিন্ময় পাল, নিমাই দালালরা তখন বড় দলের ঘুম কেড়ে নিত। স্বভাবতই প্রথম দিকে আমি সুযোগ পেতাম না। প্রথম সুযোগ পেলাম মহামেডান ক্লাবের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে। সেই ম্যাচের পর আর আমাকে সাইড বেঞ্চে বসে থাকতে হয়নি। আমাকে প্রথম দিন থেকেই উৎসাহিত করতেন। স্নেহ করতেন। কোনোরকম আর্থিক চুক্তি ছাড়াই আমি জর্জে সই করেছিলাম। কিন্তু সেজন্য আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। কারণ প্রতিদিনই ম্যাচের শেষে আমার হাতে ১০০/২০০ টাকা ধরিয়ে দিতেন। আবার কখনও আবদার করলে বিমুখ করতেন না। কারণ, আমাদের আর্থিক অবস্থা যে ভালো নয় সেটা একদিন এসেই বুঝতে পেরেছিলেন।

আমার শরীর যাতে চাঙ্গা থাকে সেজন্য ভিটামিন ট্যাবলেট দিতেন। জর্জ টেলিগ্রাফের পরিবেশ ছিল চমৎকার। প্র্যাকটিস শেষে চমৎকার টিফিনের ব্যবস্থা থাকত। একটা গোটা মুরগির স্টু থাকত খাবার টেবিলে। এসবই হত প্রদ্যুতদার নির্দেশে।

১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সাল জর্জ টেলিগ্রাফের সোনার বছর। সেই সময় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডানের রাতের ঘুম কেড়ে নিতাম আমরা। ১৯৭৭ সালে দার্জিলিং গোল্ড কাপ এবং পদ্মজং গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম আমরা। ১৯৭৭ সালে কলকাতা লিগে ১–০ গোলে হারিয়েছিলাম মহামেডান ক্লাবকে। ম্যাচে আমি গোল করেছিলাম। ১৯৭৮ সালেও রুখে দিয়েছিলাম মোহনবাগানকে।

১৬ নম্বর জার্সি গায়ে জর্জ টেলিগ্রাফে ৯ বছর খেলেছি। এক বছর মহামেডানে গেলেও আবার ফিরে এসেছি প্রদ্যুতদার আকর্ষণে। ঘটনা হল মহামেডানে সইয়ের আগে প্রদ্যুতদার অনুমতি নিয়েছিলাম। আসলে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে কোনও ফুটবলার বড় দলে ডাক পেলে তিনি খুশি হতেন। কখনও বাধা দিতেন না। ময়দানের অন্যান্য মাঝারি ক্লাবের কর্মকর্তাদের মতো জোর করে ধরে রাখতে চাইতেন না। তিনি ফুটবলারদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। আমার কাছে তিনি ছিলেন ‘পিতৃতুল্য’। ক্লাবে অনেকেই মজা করে আমাকে বলতেন ‘প্রদ্যুতদা-র বড় ছেলে’।

খেলা ছাড়ার পরও জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব ছিল আমার হৃদয় জুড়ে। ময়দানে কখনও গেলে জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুতে একবার যেতে ভুল হয় না।

ফুটবলাররা সমীহ করতেন

প্রদীপ দত্ত

(প্রাক্তন খ্যাতনামা ফুটবলার)

১৯৭৫-১৯৭৭ – একটানা তিন বছর ইস্টবেঙ্গল দলে ছিলাম। কিন্তু সেভাবে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাইনি। তবে ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তিশালী পাখতাকোর দলের বিপক্ষে তৃতীয় হাফ ব্যাক হিসাবে নজর কাড়লেও পরবর্তীতে তেমন সুযোগ পাইনি। স্বভাবতই ১৯৭৮ সালে অন্যরকম ভাবতে হয়েছিল। তবে সেভাবে কারও সঙ্গে চূড়ান্ত কোনও কথা হয়নি।

১৯৭৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যাদবপুরে অরুণাচল সঙ্ঘের উদ্যানে অল ইন্ডিয়া ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই টুর্নামেন্ট পরিচালনায় আমিও জড়িত ছিলাম। সেই সময় একদিন সন্ধেবেলা অরুণাচল সঙ্ঘ মাঠে হাজির হলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের তৎকালীন সচিব প্রদ্যুৎ কুমার দত্ত। দীর্ঘকায়, চোখেমুখে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। আমাকে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে খেলার প্রস্তাব দিলেও তখনই তাঁকে চূড়ান্ত কথা দিতে পারিনি। কারণ এরিয়ান ক্লাব থেকে প্রস্তাব এসেছিল। প্রসঙ্গত এরিয়ান ক্লাব থেকেই ১৯৭৪ সালে জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফিতে নিয়মিত সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই প্রথম দিনই কথা দিতে পারিনি। পরবর্তীতে প্রদ্যুৎদা আবার যখন হাজির হলেন তখন আর তাঁকে ফেরাতে পারিনি। উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটির কথার মধ্যে কোনও তঞ্চকতা ছিল না।

১৯৭৮ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ দল যথেষ্ঠ শক্তিশালী ছিল। গোলে অমিত গুহ, রক্ষণে রমেন ভট্টাচার্য, বিভু চক্রবর্তী, সঞ্জীব চৌধুরি, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি। মাঝমাঠে তপন বসু, রবি রায়, আক্রমণে বাদল ভট্টাচার্য, বিভাস সরকার, শিবব্রত নাথ। সবমিলিয়ে জুনিয়র-সিনিয়র মিলিয়ে একটা 'কমপ্যাক্ট' দল। যাদের মধ্যে রমেন, শিবব্রত, তপন এবং আমার বড় দলে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল। এমন সব ফুটবলারদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন যাদের মধ্যে বড় দলে খেলার আগ্রহ প্রবল ছিল। এককথায় দল গঠনের ক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। আর একটা 'প্লাস পয়েন্ট' ছিল তাঁর কোচ নির্বাচন। দু-বছর আগে থেকেই জর্জের কোচ ছিলেন প্রাক্তন খ্যাতনামা ফুটবলার শান্ত মিত্র। একটা দলকে কীভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হয় তিনি জানতেন। এককথায় ম্যান ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

সে বছর মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল তো বটেই, মহমেডান ক্লাবও যথেষ্ঠ

শক্তিশালী ছিল। লিগে আমরা চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলাম। তবে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মোহনবাগান। শিবাজী ব্যানার্জি, সুধীর কর্মকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, শ্যামল ব্যানার্জি, দিলীপ পালিত, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জি, সুভাষ ভৌমিক, আকবর, হাবিব, শ্যাম থাপা, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু – তালিকাটা দেখে বুঝতেই পারছেন কতটা শক্তিশালী ছিল সেই দল। আমাদের কৃতিত্ব ওরকম একটা শক্তিশালী দলের 'জয়রথ' থেমে গিয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে। সেই ম্যাচটা ছিল লিগে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ। তার আগে ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান এবং বাকি সব দলের বিপক্ষে জিতে কোনও পয়েন্ট না হারিয়ে লিগ ছিল মোহনবাগানের দখলে। শেষ ম্যাচে মোহনবাগানের লক্ষ্য একটাই ছিল, সর্বপ্রথম সব ম্যাচ জিতে লিগ জয়। যে রেকর্ড ভারতীয় দল হিসাবে একমাত্র ইস্টবেঙ্গলের দখলে ছিল। স্বভাবতই লিগের শেষ ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল মোহনবাগানের কাছে। গোটা মোহনবাগান দলটাই তখন টগবগে অবস্থায়। অন্যদিকে আমাদের কাছে হারানোর কিছু ছিল না, আবার কিছু পাওয়ারও ছিল না। তবু একটা চ্যালেঞ্জ সবার মধ্যেই ছিল, তাহল মোহনবাগানকে রুখে দেওয়া। আর এই ব্যাপারে গোটা দলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রদ্যুতদা। আসলে তাঁর মধ্যে সব সময়ই ছিল একটা চ্যালেঞ্জিং মনোভাব। এই চ্যালেঞ্জিং মনোভাব বেশি করে দেখা যেত বড় তিন দলের বিপক্ষে। বরাবরই 'জায়ান্ট কিলার' হিসাবে ভারতীয় ফুটবলে সুনাম ছিল জর্জ টেলিগ্রাফের। সেই ধারাটা বজায় রাখতে তিনি ফুটবলারদের উদ্ধুদ্ধ করতেন। ম্যাচে মোহনবাগান প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আমি গোলটা শোধ করেছিলাম। প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে শটে বল জালে পাঠিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে জর্জ টেলিগ্রাফের জার্সি গায়ে আমার ফুটবল মরশুমের সেরা ম্যাচ। আমার ফুটবলজীবনে একটা আনন্দের দিন। পাশাপাশি গর্বের ব্যাপারও হল সেদিন পুলিশি পাহাড়ায় জর্জের তাঁবুতে ফিরতে হয়েছিল। সব ম্যাচ জিতে লিগ খেতাব না পাওয়ার যন্ত্রণায় মোহনবাগান সমর্থকরা তখন আমাদের টার্গেট করেছিল। সেই অবস্থায় গোটা দলকে কড়া পুলিশি পাহাড়ায় লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি কড়া পুলিশি পাহাড়া ছিল জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুতে। 'জায়ান্ট কিলার' তকমাটা আরও একবার প্রমাণ করতে পারার জন্য সেদিন আলাদা একটা তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

প্রদ্যুত দত্ত নিজের হাতে যেমন দল গড়তেন পাশাপাশি ফুটবলারদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকেও যত্নবান ছিলেন। ফুটবলারদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রবল ব্যক্তিত্বের গুণে ফুটবলারদের সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছেন।

সাহসী প্রদ্যুতদা

স্বপনসাধন বোস (টুটু)

(মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি)

আই এফ এ-এর সচিব প্রদ্যুত দত্ত সম্পর্কে কলম ধরতে গেলে কত স্মৃতি মনের কোণে ভিড় করে আসছে। প্রদ্যুতদাকে আমি একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবেই মনে রাখব আজীবন।

আই এফ এ-এর সচিব প্রদ্যুত দত্ত অকালেই আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমি মোটামুটিভাবে নব্বইয়ের শুরু থেকে মোহনবাগান ক্লাব পরিচালনার দায়িত্বে আসি। সুতরাং একজন প্রশাসক এবং একজন ক্লাবকর্তা হিসেবে প্রদ্যুতদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের সময়কালটা বছর চারেকের। তবে, যখন ময়দানে, মোহনবাগান গ্যালারিতে বসে আমি আর অঞ্জন (অঞ্জনকুমার মিত্র, মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সচিব, প্রয়াত) খেলা দেখতাম, তখন থেকেই ময়দানের বিখ্যাত দত্ত পরিবার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। বিশ্বনাথ দত্তকে তো জানতামই, প্রদ্যুত দত্তর কথাও একটু-আধটু শুনেছিলাম। মোহনবাগানের দায়িত্ব নিয়েই আমি আর অঞ্জন প্রথম যে কাজটি করতে পেরেছিলাম তা হল মোহনবাগানের দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে বিদেশি ফুটবলারকে সবুজ-মেরুন জার্সি পরিয়ে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত। চিমা ওকেরি ছিল মোহনবাগানের প্রথম বিদেশি ফুটবলার। চিমা মোহনবাগানে সই করার কয়েকদিন পরে প্রদ্যুতদার সঙ্গে আমার দেখা কোনও একটা অনুষ্ঠানে। দরাজ গলায় হাত মিলিয়ে বললেন, 'এই যে একটা কাজ করলেন। এটার জন্য লোকের আপনাদের মনে রাখা উচিত। বিদেশি ফুটবলারকে ক্লাবে খেলাতেই হবে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দেখেন না, একদেশের ফুটবলার অন্যদেশের ক্লাব দলে খেলছে। দেখবেন, একদিন ভারতীয় ক্লাবগুলোতে বিদেশির বন্যা বইবে।' ভিশনারি প্রদ্যুতদা এই দিনটি দেখার জন্য আর থাকলেন না। যে সময়টিতে তিনি চলে গেলেন সেই সময়টা তাঁর অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল কলকাতার ফুটবলের জন্য, ভারতীয় ফুটবলের জন্য। অকালেই প্রয়াত হন তিনি। তখন আমাদের কাগজ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর দফতর ট্যাংরার রাধানাথ চৌধুরী রোডে। একদিন রাধানাথ চৌধুরী রোডের অফিসে যেতেই ক্রীড়া বিভাগের এক সাংবাদিক আমাকে খবরটি দিলেন। প্রদ্যুতদা চলে গিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে তো আমার কালেভদ্রে দেখা হত, টেলিফোনে কথা হত— কিন্তু বিশ্বাস করুন সেইদিন আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছিলাম।

মনে হয়েছিল যেন একটা বটবৃক্ষ সরে গেল আমাদের মাথার উপর থেকে, আমাদের মানে কলকাতার ক্লাব যাঁরা চালান সেই কর্মকর্তাদের মাথার উপর থেকে। অথচ এই প্রদ্যুত দত্ত-র সঙ্গে ক্লাবকর্তা হিসেবে বিরোধ যে হয়নি তা নয়। তখন রচপাল সিং উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার। একবার রচপাল জানিয়ে দিলেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচে সাইড লাইনের বেঞ্চে আঠারোজন খেলোয়াড়, কোচ, সহকারী কোচ, মাসিওর এবং ফুটবল সচিব ছাড়া কেউ বসতে পারবে না। মাঠে অযাচিত গণ্ডগোল এড়াতেই এই ব্যবস্থা। আই এফ এ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল এই ফরমান। বেঁকে বসল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। এতদিন রেওয়াজ ছিল দলের সঙ্গে ছোট-বড়-মেজ-সেজ কর্তারাও মাঠের মধ্যে ঢুকবেন। খেলোয়াড়দের তাতাবেন। এই মৌরসিপাট্টায় হানা! কী করে মেনে নেয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। মিটিং ডাকল আই এফ এ। সেই মিটিং-এ মোহনবাগানের প্রতিনিধি আমি, অঞ্জন। প্রদ্যুতদা মোহনবাগন-ইস্টবেঙ্গলের সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্যেও অটল, আত্মপ্রত্যয়ী। অঞ্জনের মেজাজ একটু টাল খেল। ইস্টবেঙ্গল থেকে ছিলেন দীপক দাস, মানে আমাদের পল্টুদা। তিনিও অঞ্জনের সঙ্গে সুরে সুর মেলালেন। তাহলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচ খেলবে না। মোহনবাগানের মতটাই তো আমার মত। আমিও বললাম, খেলব না। প্রদ্যুতদা চুপচাপ শুনছিলেন। সব কিছু শোনার পর তিনি ঠান্ডা ধারালো কণ্ঠে বললেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনার খেলা হলে টুটুবাবু, কর্মকর্তারা কি মাঠের মধ্যে বসেন? নাকি লিভারপুল-চেলসি ম্যাচ হলে ক্লাব অফিসিয়ালরা মাঠে বসেন? আপনারা একটা নিদর্শন নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের সব কর্তার মাঠে বসার ব্যবস্থা করে দেব।' এরপর আর বেশি কথা বাড়েনি। যুবভারতীর ওই নিদর্শনটাই কলকাতার ফুটবলে আইন হয়ে গেল। জীবনে সেবার হেরেও সুখ পেয়েছিলাম। যা হওয়া উচিত তা-ই হয়েছিল। তবে, সেইদিন প্রদ্যুতদার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বুকের পাটা থাকলে কেউ বলতে পারে—তাহলে এ বার লিগে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ হবে না।

আর একবার প্রদ্যুতদার দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় পেয়েছিলাম একটি সবুজ বাঁচাও আন্দোলন নিয়ে। কলকাতার একজন বড় ব্যবসায়ী রবীন্দ্র সরোবরে একটি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক করতে চাইছিলেন। তখনকার কংগ্রেস নেত্রী, এখন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসরোবরকে বাঁচাতে হবে, এই অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে তুললেন এক আন্দোলন—সবুজ বাঁচাও আন্দোলন। প্রদ্যুতদা, তখনকার আই এফ এ সচিব, ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই আন্দোলনে। প্রধান সংগঠক হিসাবে তিনি ময়দানে নামলেন। সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সমেত দক্ষিণ কলকাতার ফুটবলারদের একই ছাতার নীচে জড়ো করলেন প্রদ্যুতদা। তাঁদের আন্দোলন এত তীব্র হল যে, এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হল। ওই সময় প্রদ্যুতদার সঙ্গে

দু'-একবার কথা হয়েছিল। আমি সেই সময় দেখেছিলাম, এক অনমনীয় চরিত্রকে। যিনি তাঁর ধারণা এবং আদর্শে অবিচলিত থাকাটাই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেন। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দ্বিতীয় ডিভিশনে অবনমনে বাধ্য করেছিলেন তদানীন্তন আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্ত। গোটা কলকাতা বিক্ষোভে অচল হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপন্ন হয়েছিল, কিন্তু অটল ছিলেন প্রদ্যুতদা। কোনও অনুরোধ-উপরোধেই তিনি কান দেননি। আমার তখন মনে হয়েছিল—প্রশাসকের বোধহয় এইরকমই হওয়া উচিত।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর 'জেদ'-এর অবশ্য ব্যাকফায়ার হয়েছিল। যেমন নেহরু কাপ কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। শুনেছি সেইসময় আই এফ এ দেনার দায়ে ডুবে গিয়েছিল। আই এফ এ অফিস পর্যন্ত ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছিল। হয়তো সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের একটা গন্ধ ছিল। আমার আবার সাহসী মানুষদের বেশি পছন্দ হয়। প্রদ্যুতদা সেইরকম সাহসী ছিলেন, যিনি ঝুঁকি নিতে পিছপা হতেন না। ঈশ্বর তো সাহসীদেরই সহায়ক হন। প্রদ্যুতদা যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন।

প্রদ্যুতদা নেই ভাবতেই পারি না

বলরাম চৌধুরী

(মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট)

আমি আপাদমস্তক মোহনবাগানি। একথা ময়দানের সবাই জানেন। কিন্তু একথা শুনলে হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না, তাহল আমার কাছে মোহনবাগান ক্লাবেরও আগে থাকবেন প্রদ্যুত কুমার দত্ত।

আসলে ময়দানে আমার খুব একটা আনাগোনা ছিল না। মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেতাম ঠিকই। তবে ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। ঘটনাচক্রে ১৯৮৬ সালে তৎকালীন মোহনবাগান সচিব ধীরেন দে-র আস্থা অর্জন করেছিলাম। ১৯৮৬ সালে চীনে এশিয়ান ক্লাব কাপে মোহনবাগান খেলতে গিয়েছিল। ওখানে ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর সমস্যায় পড়েছিল গোটা দল। কলকাতায় ফেরার কোনও বিমান সেদিন ছিল না। আমি সেই সময় হংকংয়ে ছিলাম। বন্ধু ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য আমাকে সমস্যার কথা জানালে আমি গোটা দলকে (২৬ জন) এয়ারপোর্টে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাড়ি ফেরার জন্য বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলাম। ক্লাব চীন থেকে ফেরার পর শীর্ষকর্তা ধীরেন দে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন থেকেই জড়িয়ে পড়লাম মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে।

পাশাপাশি সেই সময়েই পরিচয় হল প্রদ্যুতদার সঙ্গে। আমার বন্ধু তালতলা ক্লাবের দেবু মুখার্জি একদিন নিয়ে গিয়েছিলেন প্রদ্যুতদার কাছে। প্রথম দিন থেকেই অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল প্রদ্যুতদা-র সঙ্গে। খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছি। অনেক ব্যাপারেই তিনি আমাকে গাইড করেছেন। বিশেষ করে মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবে কীভাবে চলতে হবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সুপরামর্শ পেয়েছি।

তাঁর বিচক্ষণতা, প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে কীভাবে এগিয়ে যেতে হয় এই ব্যাপারটা প্রদ্যুতদার পাশে থেকে দেখেছি এবং শিখেছি। বিশেষ করে ১৯৮৮-৮৯ সালে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে কঠিন বাধার সামনে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। আর্থিক দেনায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল আই এফ এ। সেই সময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ভবন ২২ লাখ টাকার বিনিময়ে বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন

প্রদ্যুতদা।

দুঃখজনক ঘটনা হল, এরকম একটা দুঃসময়ে বাংলার দুই বড় ক্লাবের চূড়ান্ত অসহযোগিতা। শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল অংশগ্রহণই করল না। মোহনবাগান অবশ্য পরবর্তীতে মূল স্রোতে ফিরে এসেছিল।

সেই সময় প্রদ্যুতদার বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তা লক্ষ করেছি। বিভিন্ন মহলের চাপ এবং হুমকির কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। এমনকি মাঝারি ধরনের কয়েকটি ক্লাব মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত করেছিল। সংস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে বারেবারে বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

এরকম একটা দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবার জন্য দেবু মুখার্জি এবং আমি হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অজিত সেনগুপ্তকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাবার জন্য প্রদ্যুতদার কাছে আবেদন করেছিলাম। আমাদের আবেদন প্রদ্যুতদা মেনে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট পদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন বিচারপতি অজিত সেনগুপ্ত। বলতে দ্বিধা নেই, অজিত সেনগুপ্ত প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসার পর থেকেই কারণে-অকারণে কয়েকটি ক্লাবের মামলা করার প্রবণতা একদমই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তবে কয়েকটা ক্লাব বিরক্ত করলেও বেশিরভাগ মাঝারি এবং ছোট ক্লাব সব সময়ই প্রদ্যুতদার পাশে ছিল। প্রথম থেকে পঞ্চম ডিভিসনের বেশিরভাগ ক্লাবেরই আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন ছিল। সবসময়ই সেইসব ক্লাবের পাশে দাঁড়াতেন প্রদ্যুতদা। স্বভাবতই প্রদ্যুতদার সঙ্গে ক্লাবগুলো বেইমানি করেনি।

১৯৮৭ সালে কলকাতার সন্তোষ ট্রফি এবং ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে সফলভাবে নেহরু গোল্ড কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল আয়োজনের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সেনাপতি। সেই সময় অনেকেই তাঁকে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শীর্ষ পদে দেখতে চেয়েছিলেন। সেই দলে ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী শিলচরের সন্তোষমোহন দেবও। ঠিক হয়েছিল প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন সন্তোষমোহন দেব এবং সচিব পদে প্রদ্যুত দত্ত। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির নির্দেশে সন্তোষমোহন দেব লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বভাবতই একা প্রদ্যুতদার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব ছিল না।

এতক্ষণ যা সব কথা বললাম সব কিছুই ফুটবল প্রশাসক হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে। এ বারে একটু মানুষ প্রদ্যুতদা নিয়ে কিছু বলতেই হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দিলখোলা, ভোজনরসিক এবং মজাদার। ছটা ডিম টোস্ট একবারে খেতে পারতেন। এরকম মুখরোচক খাবারের দিকে তাঁর ঝোঁক বরাবরই। সেক্ষেত্রে শরীর-স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভাবতেন না।

মাঝেমধ্যে আবার টেনশনে ফেলে দিতেন। এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী

আমি নিজেও। সেবার প্রদ্যুতদার সঙ্গে দুর্গাপুরে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে গিয়েছিলাম। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে। ব্যবসার জন্য প্রদ্যুতদার তখন তিন লাখ টাকার প্রয়োজন ছিল। সঙ্গে অত টাকা নেই। কলকাতায় ফোন করলেন ভাইপো বাপিকে (সুব্রত দত্ত)। কথা মতো বাপি টাকা নিয়ে চলে এল। দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে আমার হাতে টাকা ভর্তি অ্যাটাচিটা দিয়ে ফিরে গেল। সে জানতেও পারল না ছোটকাকা কেন টাকাটা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমিও বাপিকে বলতে পারলাম না। পরে জেনেছিলাম ব্যবসার জন্যই টাকাটার প্রয়োজন হয়েছিল।

যতদিন বেঁচেছিলেন নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। যখন প্রয়াত হলেন তখন আমিও দিল্লিতে ছিলাম। শেষ দিকে প্রাণখোলা এই মানুষটির চোখে-মুখে দেখেছি অশান্তির ছাপ। মনে হয়, নিজেই হয়তো বুঝেছিলেন আর বেশিদিন আমাদের মধ্যে থাকতে পারবেন না। সত্যি বিশ্বাস করতেই পারছি না, প্রদ্যুতদা আমাদের মধ্যে নেই।

অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেননি

প্রদীপ বসু
(বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক)

একজন দক্ষ প্রশাসক এবং প্রবল ব্যক্তিত্ববান হিসাবে ভারতীয় ফুটবলে যাঁদের নাম প্রথম সারিতে আসবে তাঁদের মধ্যে প্রদ্যুত কুমার দত্ত অন্যতম। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি। আই এফ এ-তে কাজ করার সুযোগও পেয়েছি, সেই হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বলতে পারি গত ৩০ বছরে ফুটবলে প্রদ্যুত দত্ত এবং ক্রিকেটে জগমোহন ডালমিয়ার মতো প্রবল ব্যক্তিত্ববান কর্মকর্তা আর কাউকে দেখিনি।

লেখাটা যেহেতু প্রদ্যুত দত্তকে নিয়ে, কেন তাঁকে সবার উপরে রাখলাম, সেই বিশ্লেষণটাই করছি। তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্ববান। কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। কোনও রকম অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেননি। সেই কারণে অনেক সময়ই বিতর্ক হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে প্রবল চাপও এসেছে। কিন্তু কখনওই পিছু হটেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর কাছে সবসময়ই অগ্রাধিকার পেত বাংলার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ-এর সম্মান। এ ব্যাপারে বাধা বিপত্তি এলেও কখনও লক্ষ্যচ্যুত হননি। ১৯৮৫ সালে প্রথম আই এফ এ-এর সচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। যতদিন জীবিত ছিলেন আই এফ এ সচিবের চেয়ারটাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন। পাশাপাশি বাংলার ফুটবল যাতে মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

১৯৮৫ সালে যখন আই এফ এ সচিবের চেয়ারে বসলেন তখন সংস্থার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। প্রথমেই আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য 'ডোনারস্ মেম্বারশিপ' কার্ড চালু করে পরিস্থিতি অনেকটাই সামলে নিয়েছেন।

কখনওই বেনিয়ম পছন্দ করতেন না। কোনও ক্লাব যদি আই এফ এ-এর নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টা করত তখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না। সেই সব ক্ষেত্রে সব সময়ই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করতেন না।

১৯৮৬ সাল থেকে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসক হিসাবে দক্ষতার পরিচয় বেশ কয়েক বার খুব কাছে থেকে লক্ষ করেছি। ১৯৮৬ সালে মহামেডান ক্লাবের মতো প্রবল পরাক্রমশালী দলকে সাসপেন্ড করার ক্ষেত্রে দৃঢ়তার পরিচয় দেখিয়েছেন। সেই সময় রাজ্যপাল নুরুল হাসানের মতো ব্যক্তিত্ববান প্রশাসকের

অনুরোধেও তিনি সিদ্ধান্ত বদলাননি। কারণ তাঁর কাছে সবার আগে গুরুত্ব পেত আই এফ এ-এর সম্মান। সচিবের চেয়ারের মর্যাদা বজায় রাখা।

সে বছর আরও একটি সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন মোহনবাগানের বিপক্ষে। ঘটনা হল মোহনবাগানের ডিফেন্ডার মাস্তান আমেদকে দু-বার (দুই ম্যাচে) হলুদ কার্ড দেখা সত্বেও ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলিয়েছিল তাঁর দল। ম্যাচটা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হওয়ার পর স্বভাবতই সেই ম্যাচের তিন পয়েন্ট দাবি করে আবেদন জানিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। নিয়ম হল কোনও ফুটবলার দু-বার হলুদ কার্ড দেখলে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে পারবেন না। আমি সে বছর লিগ সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। ইস্টবেঙ্গলের দাবি নিয়মমাফিক ছিল বলে মোহনবাগানের পয়েন্ট কেটে নেওয়ার সিদ্বান্ত নিয়েছিল লিগ সাব-কমিটি। কিন্তু পরবর্তীতে মাস্তান আমেদকে সাসপেনশনের চিঠি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে আবেদন করেছিল মোহনবাগান। ওয়ার্কিং কমিটির সেই সভায় মোহনবাগানের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ক্লাবের আজীবন সদস্য, তৎকালীন সাংসদ, দুঁদে ব্যারিস্টার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনা হল মাস্তান আমেদ দুই ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখার জন্য একটা ম্যাচে খেলতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু এটাও ঘটনা আই এফ এ অফিস থেকে সে ব্যাপারে কোনও চিঠি ধরানো হয়নি। স্বভাবতই সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারেননি গভর্নিং বডির সদস্যরা। সভায় ইস্টবেঙ্গলের দাবি খারিজ হয় এবং ম্যাচের ফলাফল (০—০) বজায় থাকে।

তবে ব্যাপারটা খুব সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি প্রদ্যুতবাবু। যাঁদের গাফিলতিতে সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত মর্যাদা পেল না তাঁদের বিপক্ষেও শাস্তিমূলক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে তিনি পিছপা হননি। কারণ, মোহনবাগান ক্লাবকে চিঠি পাঠাবার দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা এই ব্যাপারে গাফিলতি দেখিয়েছিলেন। এটা এক ধরনের নাশকতাই বলতে হবে।

আই এফ এ সচিব হিসাবে তাঁর বিশাল অবদান হল ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে অষ্টম জওহরলাল নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন। কলকাতা শহরের বাইরে জেলার মাঠে আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। শুধু আয়োজনই নয়, সফলও হয়েছিলেন। সেই সময় অনেকরকম বাধা এসেছিল। অনেকেই অসহযোগিতা করেছেন। নানারকম চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তবু অবিচল থেকেছেন। সেই সময় আরও একটি মারাত্মক ঘটনা বলতেই হবে, তা হল অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নাশকতা। যে পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞাপন থেকে এসেছিল সেই অর্থ টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে পৌঁছয়নি। অর্থ এজেন্সি মারফত নগদে নিয়েছিলেন আই এফ এ-এর তৎকালীন এক প্রভাবশালী কর্মকর্তা। প্রদ্যুতবাবুকে সব দিক থেকে হেনস্থা করার জন্য একটা চক্র তখন সক্রিয় ছিল। শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ আয়োজনকে

ব্যর্থ করা, আর্থিক দিক থেকে আই এফ এ-কে ধাক্কা দেওয়াই ছিল সেই চক্রের লক্ষ্য। সেই সময়েও প্রদ্যুতবাবুর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। আসলে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট হল, সবরকম বাধা বিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।

তিনি ছিলেন প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই প্রসঙ্গে এ বারে বলছি — ২০১৯ সালে কলকাতা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পিয়ারলেস। কলকাতা ফুটবল লিগের ইতিহাসে তিন বড় দলের বাইরে দ্বিতীয় দল হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করল পিয়ারলেস। এক্ষেত্রেও প্রদ্যুত দত্ত-র অবদানকে অস্বীকার করলে ঘোরতর অন্যায় হবে। নিশ্চয়ই কৃতিত্ব পিয়ারলেসের কোচ, ফুটবলার এবং ম্যানেজমেন্টের। দীর্ঘ ২৭ বছর নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর তারা খেতাব জিতেছে। তবু মানতেই হবে প্রদ্যুত দত্ত-র অবদান। কারণ তিনিই পিয়ারলেস সহ চারটি দলকে সরাসরি কলকাতা লিগের সুপার ডিভিসনে খেলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন ১৯৯৩ সালে। কলকাতা ফুটবলে একটা সময় বেশ দাপটের সঙ্গে খেলত ইস্টার্ন রেলওয়ে, বি এন আর, পোর্ট ট্রাস্ট। কিন্তু পরবর্তী কালে ওই দলগুলোর সেভাবে আর কলকাতা লিগে দাপট ছিল না। কলকাতা লিগের আকর্ষণও তখন থেকেই নামতে শুরু করে। লিগের আকর্ষণ ফিরিয়ে আনার জন্য পিয়ারলেস, এফ সি আই, সেইল, কোল ইন্ডিয়া — এরকম চারটি দলকে অনুমোদন দিয়েছিল আই এফ এ। গোটা ব্যাপারটাই প্রদ্যুত দত্ত-র মস্তিষ্কপ্রসূত। তাই বলছি, আজ যে পিয়ারলেস কলকাতা লিগ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল সেটা সম্ভব হল প্রদ্যুত দত্ত-র দূরদৃষ্টির জন্য।

কলকাতায় মহিলা ফুটবল লিগও চালু করেছিলেন তিনি। সেটাও ১৯৯৩ সালে। তার আগে বাংলার মহিলা ফুটবল দল গঠন করেছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জির সহধর্মিণী প্রয়াত আরতি ব্যানার্জি। খ্যাতনামা ফুটবল প্রশিক্ষক প্রয়াত সুশীল ভট্টাচার্যর তত্ত্বাবধানে বাংলা দল জাতীয় ফুটবলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এমনকি আন্তর্জাতিক আসরেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু ঘরোয়া কোনও প্রতিযোগিতা তখন ছিল না। এই ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। আই এফ এ.-এর পরিচালনায় শুরু করেছিলেন মহিলা ফুটবল লিগ। ১৯৯৩ সালে বাংলায় মহিলা ফুটবলের প্রবর্তক আরতি ব্যানার্জিকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই শুরু হয়েছিল মহিলা ফুটবল লিগ।

নার্সারি ফুটবল লিগের পুনরুত্থান হয়েছিল প্রদ্যুত দত্ত-র হাত ধরেই। ১৯৭৮-৭৯ সালে এই লিগ চালু হলেও দু-তিন বছর বাদেই বন্ধ হয়ে যায়। সেই লিগ এক দশক বাদে আবার চালু করেছিলেন তিনি।

সব মিলিয়ে তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল বাংলার ফুটবলের উন্নয়ন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলার একটা অত্যাধুনিক মানের ফুটবল একাডেমি। এ ব্যাপারে রাজারহাটে স্থান নির্বাচনের কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অকালেই ইহলোক ত্যাগ

করায় সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে যেতে পারেননি।

তবে আরও এমন কিছু কাজ করে গেছেন সেগুলো চিরদিন মনে রাখার মতো। যেমন আই এফ এ-এর শতবর্ষে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ময়দানে আই এফ এ-এর মাঠ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় অনেক বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পাশাপাশি বিশাল সংখ্যক ফুটবলপ্রেমী জনতা হেঁটেছিলেন।

১৯৯১ সালে ফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। ১১ বছর বাদে দায়িত্ব পেয়েছিল আই এফ এ। সেই প্রতিযোগিতাও সার্বিক সফল হয়েছিল প্রদ্যুত দত্ত-র তত্ত্বাবধানে। প্রসঙ্গত সেবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচের দিন তিনি সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে। প্রসঙ্গত ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে ফেডারেশন কাপ চলাকালীন বিতর্ক হয়েছিল সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে। প্রদ্যুতবাবু এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কখনও কোনও বিতর্ক মনে রাখতেন না। তাঁর যতসব বিতর্ক হয়েছে আই এফ এ-এর সম্মান বজায় রাখার জন্য। এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বলতেই হয় তা হল বিতর্কটা হয়েছিল কোনও একটি সংবাদপত্রে তাঁর একটি লেখাকে কেন্দ্র করে। একটা সময় যখন চারিদিক থেকে বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল তখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি তৎকালীন ফুটবল ফেডারেশন এবং রাজ্য সরকারের উপর কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কথাগুলো যখন বলছিলেন তখন আমরা কয়েকজন ছাড়া মাত্র একজন ক্রীড়া সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। কথাগুলো আমাদের মধ্যে আলোচনার পর্যায়ে ছিল। কোনও খবরের কাগজে ছাপার জন্য নয়। সেই সাংবাদিকও আমাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হল তিনি খবরের কাগজে প্রদ্যুত দত্ত-র নামে সেই কথাগুলো ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই সূত্রপাত বিতর্কের। এরকম একটা বিতর্কিত লেখার পরও প্রদ্যুত দত্ত কিন্তু সেই সাংবাদিককে বিপদে ফেলেননি। অন্য কোনও সচিব হলেই ওই ব্যাপারে 'আমি বলিনি' বলে সেই সাংবাদিককে বিপদে ফেলে দিতেন। এই জায়গাতেই ব্যতিক্রম প্রদ্যুত দত্ত।

শতবর্ষ উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইডেন উদ্যানে একটা আকর্ষণীয় ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন। বাংলার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা তার আগে বা পরবর্তীকালে এরকম একটা ক্রিকেট ম্যাচ কখনও আয়োজন করেছে বলে মনে হয় না।

আগেই বলেছি কখনও কোনওরকম অন্যায় বা বেনিয়মকে তিনি বরদাস্ত করেননি। পাশাপাশি কোনও অনৈতিক আবদারকেও প্রশ্রয় দেয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর খুব কাছের মানুষও সুবিধা নিতে পারেননি। একটা ব্যাপারে আমি খুব কাছে থেকেই তাঁর সততার প্রমাণ পেয়েছি। ঘটনাটি ১৯৯৩ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। প্রদ্যুতবাবুর কাছের লোক হাওড়ার একজন প্রভাবশালী

কর্মকর্তা বাংলা দলে একজন ফুটবলারকে দলে নেওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে তাকে পাঠিয়েছিলেন। সেবারে সন্তোষ ট্রফির খেলা হয়েছিল কোচিতে। করমন্ডল এক্সপ্রেসে বাংলা দলের ফুটরলাররা যাবে। সেই ফুটবলারটিও যথা সময়ে হাজির হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। হাওড়ার সেই কর্মকর্তার ধারণা ছিল তাঁর পাঠানো ফুটবলারকে কোনওমতে ফেরাতে পারবেন না বাংলা দলের কোচ বা ম্যানেজার। এরকম একটা কিছু অপচেষ্টা হতে পারে আন্দাজ করেছিলেন প্রদ্যুতবাবু। তাই বাংলা দল ট্রেনে ওঠার আগেই হাজির হয়েছিলেন হাওড়া স্টেশনে। স্টেশনে পৌঁছেই কোচ সুভাষ ভৌমিককে পরিষ্কারই নির্দেশ দিয়েছিলেন নির্বাচিত ফুটবলারদের বাইরে কাউকে দলে নেওয়া যাবে না।

১৯৮৮ সালে সেই নেহরু কাপের পর একটা সময় খুবই সঙ্কটে পড়েছিলেন। আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনেক রকম বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অজিত সেনগুপ্ত। অজিত সেনগুপ্তকে আই এফ এ-এর সভাপতির চেয়ারে বসিয়েছিলেন। সেই সময় অজিত সেনগুপ্ত আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। অজিতবাবুও ছিলেন যথার্থই একজন ফুটবলপ্রেমী এবং অবশ্যই দক্ষ প্রশাসক। তাঁরা দু-জনই ছিলেন ফুটবলে নিবেদিত প্রশাসক। আজও মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা যেদিন সি আর এ তাঁবুতে প্রদ্যুত দত্ত-র স্মরণসভায় অজিত সেনগুপ্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছিলেন 'আমি একজন পরিবারের সদস্যকে হারালাম। এই ক্ষতি কোনওদিনই পূরণ হবে না।'

কারণ প্রদ্যুত দত্ত-র কাছে গোটা আই এফ এটাই ছিল একটা পরিবার। সংস্থায় একাত্মতা বজায় রাখার জন্য অনেক সময়ই 'পিকনিক' আয়োজন করেছেন। সেখানে প্রাণখুলে সবাই আনন্দ করতেন। তিনি নিজেও খুব আমুদে মানুষ ছিলেন।

১৯৮৯ সালে ফুটবল ফেডারেশনের সচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেও পরে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ যাঁরা তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তাঁরাই সরে দাঁড়িয়েছেন। এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েই বলতে পারি প্রদ্যুত দত্ত যদি ফুটবল ফেডারেশনের সচিব হতে পারতেন তাহলে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের খোলনলচেই বদলে যেত। জগমোহন ডালমিয়া যেমন ভারতীয় ক্রিকেটকে উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছেন। প্রদ্যুতবাবুও ভারতীয় ফুটবলে অন্য মাত্রা এনে দিতে পারতেন।

আমাকে এবং আই এফ এ-এর প্রাক্তন সচিব রঞ্জিত গুপ্তকে তিনি বিশ্বাস করতেন। রঞ্জিত গুপ্ত আগে থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে আমিও তাঁর বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিলাম। এরকম মহান সচিবের সঙ্গী হতে পেরেছিলাম বলে আজও গর্ববোধ করি। শুধু আমরা কেন, যাঁরা একবার তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁরা কোনওদিন তাঁকে ভুলতে পারবেন না।

স্বপ্নবিলাসী ছিলেন

মানস চক্রবর্তী

(বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক)

১৯৯৩-এর ফুটবল মরশুমের শুরু। বছরটা ছিল আই এফ এ-র শতবর্ষ। কিন্তু সে বছরেই কলকাতা ফুটবল প্রায় লাটে ওঠার অবস্থা। প্রদ্যুত দত্ত চেয়েছিলেন ফুটবলকে রুটির সঙ্গে যুক্ত করতে। পেশাদারি ফুটবলের আগের ধাপ। তাই এক সঙ্গে চারটি অফিস টিমকে প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলানোর ব্যবস্থা করলেন। পিয়ারলেস, ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফ সি আই), স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সেইল) এবং কোল ইন্ডিয়া। মোহনবাগান ক্লাব তীব্র বিরোধিতা করল। দলবদল শিকেয়। ময়দানে অচলাবস্থা। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক রকম সমঝোতা করে চারটি দলকে প্রিমিয়ারে নয়, এক বছর খেলতে হল প্রথম ডিভিশনে। সেখান থেকে তারা উঠে এল প্রিমিয়ারে।

সেই চারটি টিমেরই একটি, পিয়ারলেস ২০১৯ সালে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হল। তিন প্রধানের বাইরে এর আগে শুধু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টার্ন রেল। ১৯৫৮ সালে। তারপর একান্ন বছর পর একটা যুগান্তকারী ঘটনা কলকাতা ফুটবলে। এই সময় সেই মানুষটার কথা বেশি করে মনে পড়তে বাধ্য। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বপ্নবিলাসী। চাইতেন কলকাতা ফুটবলের উন্নতি। আর কে না জানে কলকাতা ফুটবলের ভালো হলে ভারতীয় ফুটবলের ভালো হবে।

প্রদ্যুত দত্ত চলে গেছেন ১৯৯৪ সালের ১৬ নভেম্বর। নেহাতই অকালমৃত্যু। আই এফ এ সচিব হয়েছিলেন ১৯৮৫ সালে। আমৃত্যু ছিলেন সেই পদে। আর এই ৯ বছরে করতে চেয়েছিলেন অনেক কিছু। বেশির ভাগই যুগান্তকারী। যেমন অধুনালুপ্ত নেহরু গোল্ড কাপ শুরু হয়েছিল কলকাতায় ১৯৮২ সালে। আবার ১৯৮৪ সালের নেহরু কাপও হয়েছিল কলকাতায়। তারপর আবার ১৯৮৮ সালে। কিন্তু প্রদ্যুতবাবুর আমলে যখন আই এফ এ দায়িত্ব পেল নেহরু কাপের তখন তিনি তা কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে ফেললেন শিলিগুড়িতে। অনেক সমালোচনা হল। অনেকে বলল, এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত। শিলিগুড়িতে তেমন পরিকাঠামো কোথায়? না আছে ভালো স্টেডিয়াম, না আছে ভালো হোটেল। শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন হল, তখন কিন্তু কোনও অভিযোগ ছিল না। না স্টেডিয়াম নিয়ে, না হোটেল নিয়ে। ঘটনাটা ১৯৮৮ সালের।

জন্ম হল এক নতুন ফুটবল শহরের। তারপর থেকে শিলিগুড়িতে কী হয়নি? সব কিছুই হয়েছে। ফেডারেশন কাপ, জাতীয় লিগ, আই লিগ, এয়ারলাইন্স কাপ। এমন কী রঞ্জি ট্রফির ম্যাচও হয়েছে শিলিগুড়িতে। কলকাতার বাইরে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় ফুটবল নগরী করে গেছেন প্রদ্যুত দত্ত। বাংলার ফুটবল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য।

শুধু নেহরু কাপকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়াই নয়, কলকাতা ফুটবলে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন তিনি যখন দায়িত্ব নিলেন তখন কলকাতা প্রথম ডিভিশনে ছিল সাতাশটি দল। একটা টিমকে খেলতে হয় ছাব্বিশটা ম্যাচ। কিন্তু ওপরের দিকের দলগুলির সঙ্গে নীচের দিকের দলগুলির বিরাট পার্থক্য। অনেক ম্যাচ পরিণত হত প্রহসনে। দায়িত্ব নিয়েই তিনি প্রথম ডিভিশনকে দুটো গ্রুপে ভাগ করলেন। এ গ্রুপে পনেরোটি দল, বি গ্রুপে বারোটি। এবং রিটার্ন লিগ। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে খেলতে হত ২৮টি ম্যাচ। সত্যিকারের লিগ। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ম্যারাথন লিগ, যাকে বলে। আজকের মতো লিলিপুট লিগ নয়। কিন্তু পঁচাশি থেকে ঊননব্বই—পাঁচ বছর এই ভাবে চলার পর তিনি চালু করলেন প্রিমিয়ার লিগ। দশটি টিম নিয়ে। রিটার্ন লিগ নিয়ে আঠারোটা ম্যাচ। লিগ জমজমাট। সত্যি কথা বলতে কী, ১৯৯০ থেকে অন্তত দশ বছর কলকাতা লিগে যা লড়াই আমরা দেখেছি তা আজকের দিনে গল্পকথা।

২.

কলকাতা লিগের পর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল আই এফ এ শিল্ড। প্রদ্যুতবাবু দায়িত্ব নেওয়ার পর শিল্ডকে বর্ণাঢ্যভাবে করার কথা ভাবলেন। প্রথম বছরেই এল রাশিয়া থেকে শাখতার এবং উরুগুয়ে থেকে পেনারোল। সঙ্গে আমাদের তিন প্রধান তো ছিলই। দুর্দান্ত হয়েছিল সেবারের শিল্ড। ফাইনালে দুই বিদেশি দলের খেলা দেখতে ভেঙে পড়েছিল সল্টলেক স্টেডিয়াম। সেই প্রথম শিল্ড গেল বিদেশে। শিল্ড নিয়ে গেল উরুগুয়ের পেনারোল। তার তিন বছর আগে কলকাতা থেকে নেহরু গোল্ড কাপ নিয়ে গিয়েছিল উরুগুয়ে। পরের বছর শিল্ডেও এল নাইজিরিয়ার ল্যাভেন্টিস। বেশ ভালো দল। যদিও তারা ফাইনালে উঠতে পারেনি। সেমিফাইনালে তাদের হারায় ইস্টবেঙ্গল। নিজের দেশের টিমের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন পরবর্তীকালে নাইজিরিয়ার হয়ে বিশ্ব কাপ খেলা এমেকা এজুকো। এমেকার তারকা হয়ে ওঠা এই ছিয়াশির শিল্ডেই। পরের ক'বছর শিল্ডে সে রকম বলার মতো বিদেশি দল না আনলে কী হবে তাঁর আমলের শেষ শিল্ডে কিন্তু এসেছিল পাখতাখোর এবং পাভলোদর। অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা দুই দেশের সেরা দুই দল। শিল্ড ফাইনাল হয়েছিল মোহনবাগান মাঠে। দুই প্রধানকে হারিয়ে দুই বিদেশি দল উঠেছিল ফাইনালে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাখতাকোর।

পরবর্তীকালে শিল্ডে বিদেশি দলকে নিয়ে অনেক অন্যায় হয়েছে। যেমন ২০০১ সালের ফাইনালে ব্রাজিলের পামেইরাস ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে দর্শক হামলায় ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। আই এফ এ ইস্টবেঙ্গলকে জয়ী ঘোষণা করে দেয়। পামেইরাস এর প্রতিবাদে ফিফায় যায়। ফিফা শাস্তি স্বরূপ শিল্ডে বিদেশি টিমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২০০২ এবং ২০০৩ সালে শিল্ড হয়েছিল বিদেশি দল ছাড়াই। আবার ২০০৪ সালে শিল্ডে বিদেশি দল আসা শুরু হয়। কিন্তু গত চার বছর তো শিল্ড হয়ে গেছে আন্ডার নাইনটিন!

শুধু শিল্ডের জৌলুস বাড়ানোই নয়, সন্তোষ ট্রফি নিয়েও বেশ ভালোভাবেই মেতেছিলেন প্রদ্যুতবাবু। তাঁর আমলের প্রথম সন্তোষ ট্রফি ছিল ১৯৮৬ সালে। দায়িত্ব নিয়েই তিনি কোচ করে আনেন অমল দত্তকে। ১৯৬৩ সাল থেকে কোচিং করাচ্ছেন অমল দত্ত। প্রদ্যুতবাবুর আগে তাঁকে বাংলার কোচ করার কথা কেউ ভাবেননি। তিনিই প্রথম এই কথাটা ভেবেছিলেন। বাংলার সেরা দল পাঠিয়েছিলেন জব্বলপুরে। গোটা টুর্নামেন্টে বাংলা একটাও গোল খায়নি। ফাইনালে হেরে যায় পাঞ্জাবের কাছে টাইব্রেকারে। তারকাখচিত দলে এক সঙ্গে খেলেছিলেন মনোরঞ্জন, সুব্রত, তরুণ দে। সুব্রতকে খেলাতে গিয়ে তরুণকে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে খেলাতে হয় অমল দত্তকে। কিন্তু নতুন পজিশনে তরুণ ব্যর্থ হন। এরপর সুব্রতকে বসিয়ে মনোরঞ্জন-তরুণ জুটিকে স্টপারে খেলান অমল দত্ত। তখন কিন্তু মানে ১৯৮৬-তে অমল কিন্তু ছিলেন মোহনবাগানের কোচ। তাঁর এই দুঃসাহসের পিছনে নেপথ্য সাহস জুগিয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত।

পরের বছর সন্তোষ ট্রফির আসর বসেছিল কলকাতায়। বাংলাই চ্যাম্পিয়ন হয় ফাইনালে রেলওয়েজকে ২-০ হারিয়ে। পরের বছর সন্তোষ ট্রফির আসর বসেছিল কেরলের ক্যান্নানোরে। এ বারে কোচ করলেন প্রদীপ ব্যানার্জিকে। একমাত্র তাঁর আমলেই বাংলার কোচ হয়েছেন পি কে-অমল। সেবার বাংলাকে টুর্নামেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য গড়াপেটা খেলে বিহার ও কর্নাটক। বাংলার ফুটবলাররা মুখে কালো রুমাল পরে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জিও। পুলিশের লাঠি খেতে হয় তাঁদের। এ নিয়ে প্রদ্যুতবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী অজিত পাঁজার মাধ্যমে। তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি। ফুটবল ম্যাচের রেজাল্ট পাল্টানো যায় না। এটা জেনেও প্রদ্যুতবাবুর লড়াই সেদিন ভারতীয় ফুটবলকে নাড়া দিয়েছিল।

৩.

প্রশাসক হিসেবে তিনি এমন কয়েকটি কাজ করে গেছেন যা তার আগে অথবা পরে কেউ করে দেখানো তো দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারেনি। যেমন

১৯৮৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রায়শই অসভ্যতা করছিল। মানে আই এফ এ-কে থোড়াই কেয়ার করা। প্রদ্যুতবাবু সব দেখছিলেন। মহামেডান ভেবেছিল তাদের পিছনে সংখ্যালঘু জনসমর্থনকে ভয় পাবেন প্রদ্যুতবাবু। ভুল ভেবেছিলেন কর্তারা। প্রথম ডিভিশন এ গ্রুপ থেকে থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মহামেডানকে। সাতাশি সালে বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবার অষ্টআশি সালে মহামেডান এ গ্রুপে ফিরে আসে।

১৯৮৯ সালে সুব্রত ভট্টাচার্য এরিয়ান ম্যাচে রেফারি প্রদীপ নাগকে মারধর করেছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের সচিব তখন ধীরেন দে, যাঁর সঙ্গে প্রদ্যুতবাবুর সম্পর্ক ছিল খুব ভালো। নানা মহল থেকে সুব্রতকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ যায় আই এফ এ সচিবের কাছে। সাসপেন্ড হয়ে যান সুব্রত। জরিমানা হয় ৫০ হাজার টাকা। শেষ পর্যন্ত সেই জরিমানা জমা দিয়ে মাঠে ঢোকার ছাড়পত্র পান সুব্রত। তবে এর পর ১৯৯১ সালে সুব্রতকে পি এস ভি আইন্দোভেনের বিরুদ্ধে টাটার সুপার সকারে আইএফএ-র অধিনায়ক করেছিলেন। পরের বছরই অর্জুন পুরস্কার পান সুব্রত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। প্রদ্যুতবাবুর খুব কাছের মানুষ ছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কাছে সুব্রতকে অর্জুন পুরস্কার দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন প্রদ্যুতবাবুই। না করেননি মমতা।

আই এফ এ সচিব হওয়ার পর থেকেই প্রদ্যুতবাবু স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন, অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের সচিব হবেন। তখন খলিফা জিয়াউদ্দিন জমানার শেষ দিক। সচিব অশোক ঘোষ। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর। নির্বাচন মুম্বইয়ে। তার অনেক আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলের দশটি রাজ্যকে নিয়ে কলকাতার শিশির মঞ্চে সভা করেছেন প্রদ্যুতবাবু। তাঁর সভাপতি ক্যান্ডিডেট ছিলেন সন্তোষমোহন দেব। তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রাক্তন জাতীয় রেফারি। ও দিকে তখনকার অন্যতম সহ-সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিও সভাপতি হতে চান। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে লড়াইটা দুই বঙ্গসন্তানের মধ্যে। প্রদ্যুত দত্ত বনাম প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। প্রিয়বাবুর সচিব পদপ্রার্থী ছিলেন কেরলের পি পি লক্ষ্মণ।

দু পক্ষই কোমর বেঁধে লড়াই করার রসদ নিয়ে পৌঁছে গেল মুম্বাই। কিন্তু শেষ পর্বে মাস্টারস্ট্রোকটা দিলেন প্রিয়রঞ্জন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন রাজীব গান্ধি। তাঁর দুই মন্ত্রীর লড়াইয়ে রাজীব সমর্থন করলেন প্রিয়কে। নির্বাচনের আগের দিন রাজীবের প্রতিনিধি হয়ে রাজস্থানের সাংসদ রামনিবাস মির্ধা মুম্বাই পৌঁছে সন্তোষমোহনকে রাজীবের বার্তা দিলেন। দুই কংগ্রেস মন্ত্রীর লড়াই চান না রাজীব। সন্তোষমোহন যেন নিজেকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে নেন। বিনা ভোটে প্রিয়রঞ্জন সভাপতি এবং লক্ষ্মণ সচিব হয়ে গেলেন। ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন প্রদ্যুত দত্ত।

এর পর অবশ্য প্রদ্যুতবাবু আর ফেডারেশনের নির্বাচনে দাঁড়াননি। তবে

অষ্টআশির নির্বাচনে এই ধাক্কা থেকে তিনি অনেক শিক্ষা নিয়েছিলেন। তবে যে কোনও কারণেই হোক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে সম্পর্কটা আর সহজ হয়নি। দুজনেই বাঙালি। দুজনেই দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। প্রদ্যুতবাবুর অপূর্ব মিত্র লেনের বাড়ি থেকে প্রিয়বাবুর রাণি ভবানী রোডের বাড়ি আর কত দূর? পাথর ছোড়া দুরত্ব। কিন্তু সেই দুরত্ব ঘোচাবার উদ্যোগ নেননি কেউই।

তবে এর পর প্রদ্যুতবাবু আই এফ এ নিয়েই পড়েছিলেন। ১৯৯৩ সালের আই এফ এ শতবর্ষটা খুবই ঘটা করে করেছিলেন। শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে সারা কলকাতা জুড়ে মিছিল হয়েছিল। ময়দানে আই এফ এ-এর মাঠে বিশাল মঞ্চ হয়েছিল ফুটবলের আদলে। করেছিলেন মন্টু সাহা। আর শতবর্ষ উদ্যাপনের অঙ্গ হিসেবে প্রত্যেক ডিভিশনের জন্য ছিল আলাদা আলাদা টুর্নামেন্ট। সুপার ডিভিশনের জন্য ছিল শিবদাস ভাদুড়ী ট্রফি। এফ সি আই-কে ৫-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান।

সব মিলিয়ে আপাদমস্তক স্বপ্নবিলাসী মানুষ ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। নিজের সম্পর্কে বলতেন,

“আমি বেদুইন,
আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া
কাহারে করি না কুর্নিশ।”

কাউকে কুর্নিশ না করেই একটু অকালেই চলে গেছেন প্রদ্যুত দত্ত। স্বপ্নগুলোকে সফল না করেই। তাঁর মৃত্যুর পর কেটে গেছে আরও প্রায় ২৯ বছর। বাংলার ফুটবল পেয়েছে আরও সচিব। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর ভাবমূর্তি কেউ নষ্ট করতে পারেনি, পারবেও না। তিনি রয়ে গেছেন একমেবাদ্বিতীয়ম!

আপসহীন

জয়ন্ত চক্রবর্তী

(বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক)

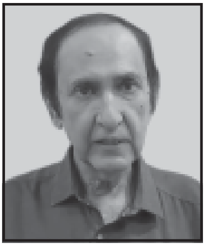

আই এফ এ–এর প্রয়াত সচিব প্রদ্যুত দত্তের কথা মনে হলে প্রথম যে ঘটনাটি আমার মনের পটে ভেসে ওঠে সেটা হল, কলকাতা শহর জুড়ে মহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ধর্মতলার মোড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে কুশপুতল। মীর মহম্মদ ওমরের নেতৃত্বে আই এফ এ অফিসের দিকে এগিয়ে আসছে একটি মিছিল। মিছিলের প্রথমে রয়েছেন বোরখা পরিহিত নারীরা। ইসলাম বিপন্ন, এই স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে রাজপথ। অটল, নিষ্কম্প প্রদ্যুত দত্ত বসে আছেন প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে আই এফ এ অফিসে। একদিন আগেই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দ্বিতীয় ডিভিশনে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে আই এফ এ-এর গভর্নিং বডির সভায়। সেই নিয়ে উত্তাল কলকাতা। যে কোনও মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। মধ্য কলকাতায় কংগ্রেস নেতা মীর মহম্মদ ওমরের প্রভাব তখন অপরিসীম। ওমর নিজেও পুলিশের খাতায় প্রায়শই ওয়ান্টেড তালিকায় থাকেন। সেই দুপুরে আই এফ এ অফিসে বসেছিলাম অনুসন্ধিৎসু রিপোর্টার হিসেবে। বেলা সওয়া তিনটে নাগাদ একটি টেলিফোন এল প্রদ্যুত দত্তের কাছে। সম্ভবত পুলিশের কোনও বড় কর্তার। প্রদ্যুতদা টেলিফোনে সাফ জানালেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের। আমার দায়িত্ব বাংলার ফুটবল চালানো। মাফ করবেন, কোনও আপস আমি করতে পারব না। সেদিন এক আপসহীন প্রদ্যুত দত্তকে দেখেছিলাম। সন্ধ্যায় মীর মহম্মদ ওমর তাঁর হুডখোলা জিপে আমাদের কয়েকজন সাংবাদিককে নিয়ে খিদিরপুরের একটি রেস্তোরাঁয় বিরিয়ানি খাওয়াতে খাওয়াতে বলেছিলেন, ''উনকা হিম্মৎ হ্যায়। ম্যায় উনকো সালাম করতা হুঁ।'' আসলে, ওমরও ভাবতে পারেননি তাঁর এই জঙ্গি আন্দোলনের পরেও প্রদ্যুত দত্ত অনমনীয় থাকবেন। পরেরবার মহামেডানকে দ্বিতীয় ডিভিশনেই খেলতে হয়েছিল। এমনই ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত, আমাদের মতো সাংবাদিকদের কাছে প্রদ্যুতদা।

কোন ছোটবেলায় শিয়ালদহের কাছে ট্রাম দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েছিলেন। আসল পায়ের বদলে ছিল নকল কাঠের পা। তাই, সামান্য টেনে হাঁটতেন তিনি। আর সেই দুর্ঘটনাই সম্ভবত প্রদ্যুত দত্তকে অনমনীয় হতে শিখিয়েছিল। যিনি জীবনের সঙ্গে আপস করেননি, তিনি ফুটবলের জন্য আপস করবেন তা ভাবা যায় না। সেই

সময়কার ফুটবল সাংবাদিকদের মধ্যে যে কোনও কারণেই হোক আমাকে একটু পছন্দ করতেন। কত দিন গেছে তাঁর অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়িতে ডেকে কত গোপন খবর দিয়েছেন। আসলে প্রদ্যুত দত্তর মতো প্রশাসক বিরল। দাদা বিশ্বনাথ দত্তর আদর্শে নিজেকে প্রাণিত করেছিলেন। কিন্তু চেহারায় এবং চরিত্রে দুজনেই ছিলেন একদম ভিন্ন গোত্রের। বিশ্বনাথ দত্ত তখন ক্রিকেট প্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত। দত্ত পরিবারের সুযোগ্য সন্তান প্রদ্যুত দত্ত ফুটবলের ভার নিলেন। বিশ্বনাথবাবু ছিলেন ছোটখাট চেহারার অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রদ্যুতবাবু তাঁর বিপরীত। বড় কাঠামোর চেহারা, গায়ের রং শ্যামলা। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনের দুর্দান্ত মিল। তা হল দুজনেই আপসহীন। এই প্রদ্যুত দত্তর সঙ্গে একটা এনকাউন্টার আজও আমার মনে আছে। শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ সংগঠন করেছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। এই টুর্নামেন্ট করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ দেনা হয় আই এফ এ-এর। দেনার দায় সামলাতে আই এফ এ অফিসটিই মর্টগেজ দিয়ে দেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ককে। খবরের টিপসটি পেয়েছিলাম নেতাজি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এ আই এফ এফ অফিসে বসে। কিন্তু এমন একটা খবর তো কনফারমেশন ছাড়া করা যায় না। তাই, ধর্মতলা চত্বরের ব্যাঙ্কগুলিতে ঢুঁ মারা শুরু হল আমার। খবর পেয়েছিলাম ধর্মতলা চত্বরের কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে আই এফ এ-এর বাড়িটি। বহু ঘোরার পর, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে মুম্বইয়ের বিখ্যাত পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, যিনি তখন ইউ বি আইয়ের অফিসার খবরটি কনফার্ম করলেন। শুধু কনফার্ম করাই নয়, ফাইলটিও আমাকে দেখিয়ে দিলেন। ক'দিনের মধ্যে আই এফ এ-এর সাধারণ সভা ছিল প্যারিস হলে। যেদিন সভা সেদিন আই এফ এ-এর বাড়ির ছবি দিয়ে যুগান্তর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবরটি প্রকাশিত হল। গোটা কলকাতা জুড়ে হইচই শুরু হল। সাধারণ সভায় বিকেলে ঝড় উঠল। সভার এক ঘর লোকের সামনে প্রদ্যুত দত্ত সম্পূর্ণ খবরটি অস্বীকার করলেন। বললেন, কাগজ ভুল খবর লিখেছে। আই এফ এ অফিস বন্ধক দেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমার সেদিনের অবস্থা কল্পনাই করতে পারেন। ভাবছি, অফিসে ফিরে কী ধমক খেতে হবে। চাকরি থাকবে কি? যেতেও পারে। বুকের ধুকপুকানি তখনই শুরু হয়ে গেল। তখন রেওয়াজ ছিল আই এফ এ সচিব সাধারণ সভার শেষে সাংবাদিক বৈঠক করবেন। সেইমতো প্যারিস হলে সাংবাদিক বৈঠক করলেন প্রদ্যুত দত্ত। কয়েকজন সাংবাদিক, আই এফ এ-এর অফিস বাড়ি বন্ধক দেওয়ার কথাটি তুললেন। হঠাৎই প্রদ্যুত দত্ত একটা বম্বশেল ছাড়লেন, সাংবাদিক হিসেবে জয়ন্তকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। ও যা লিখেছে ১০০ ভাগ সঠিক। আই এফ এ অফিস আমি বন্ধক দিয়েছি। কিন্তু সাধারণ সভায় সেটা অস্বীকার না করে আমার উপায় ছিল না। জয়ন্ত যে ব্যাপারটা খুঁজে বের করেছে, তার জন্য কৃতিত্ব ওর প্রাপ্য।

তরুণ বয়স ছিল সেইসময়। আবেগে চোখের জল এসে যেত মাঝেমধ্যেই। সেদিন রাতে প্যারিস হলের মাঠে দাঁড়িয়ে কার্যত ঝারঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। হঠাৎ পিঠে একটা চওড়া হাতের স্পর্শ পেলাম। প্রদ্যুত দত্ত। বললেন, সাংবাদিকের জীবনে ভবিষ্যতেও এইরকম ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে। তৈরি থেকো। সেদিন প্রদ্যুত দার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। আজও তাঁর সেই কথা মনে পড়ে নানা সময়ে, নানা ঘটনায়। সঙ্গে আমার একটা কনফ্রনটেশন হয়ে গেল ১৯৮৮ সালে মুম্বইয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে। এই নির্বাচন কভার করতে 'যুগান্তর' থেকে আমি এবং 'আনন্দবাজার' থেকে আমার অন্যতম বন্ধু রূপক সাহা গিয়েছিলাম মুম্বইয়ে। প্রদ্যুত দত্তের ক্যাম্পটি ছিল ইন্ডিয়া গেটের কাছে তাজমহল হোটেলে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী অশোক ঘোষের ক্যাম্পটি ছিল স্পোর্টস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায়। প্রদ্যুত দত্তের ক্যান্ডিডেট ছিলেন শিলচরের ফুটবল কর্তা সন্তোষমোহন দেব। অশোক ঘোষের প্রার্থী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। সেবার মুম্বইয়ে এমনই নির্বাচন হয়, যাতে বিমানবন্দর থেকে কিডন্যাপিং, গুম করা, মারপিট সব হল। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির দিকে পাল্লা ভারী। সেই মর্মে রিপোর্টও করছিলাম যুগান্তরে। প্রদ্যুতদার এটি পছন্দ হয়নি। তিনি দেখা হলেই আমাকে একটু কটাক্ষ করতেন। যদিও সেবার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিই বিজয়ী হয়েছিলেন ভোটে। ভোট হয়ে যাওয়ার পর তাজমহল হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে প্রদ্যুতদা' বলেছিলেন, ''তাহলে জিতে গেলে। মনে রাখবে, ফুটবলে হার-জিৎ দুইই আছে। আজ জিতলে বটে, পরে হারতেও পার। সেইভাবে সাংবাদিক হিসেবে মনটা তৈরি রাখবে।''

কেমন প্রশাসক ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত? আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে অকপটে বলব, সর্বকালের অন্যতম সেরা ভারতীয় ক্রীড়া সংগঠকের তালিকায় প্রদ্যুত দত্তর নামটি থেকে যাবে। যেমন, প্রোজ্জ্বল থাকবে বিশ্বনাথ দত্তের নামও। আসলে বাংলার ফুটবলে দত্ত পরিবারের অবদানের কথা কে আর কবে ভুলতে পারে! একটা সময় ছিল, যখন বাংলার ফুটবলের শেষ কথা ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। ১৯৯৪ সালের ১৬ নভেম্বর প্রয়াত হন তিনি। সাড়ে ৯ বছর আই এফ এ সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সময়টায় তিনি এক মুহূর্তও কোনও কিছুর সঙ্গে আপসে যাননি। এই বৈশিষ্টটিই প্রদ্যুত দত্তকে অনন্য করেছিল।

প্রদ্যুত দত্ত-র মতো দাপুটে প্রশাসক আর আসবে না

রাতুল ঘোষ
(বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক)

১৯৮৫ সালের মে মাসের ঘটনা মনে পড়ছে। সেবার আমরা বেঙ্গালুরুতে প্রায় এক মাস প্রলম্বিত ফেডারেশন কাপ কভার করতে গিয়েছিলাম। সেখানেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ের দুদিন আগে ফেডারেশনের কর্মকর্তারা যে পাঁচতারা হোটেলে ছিলেন তা হয়ে উঠেছিল সাংবাদিকদের কাছে খবর পাঠানোর জন্য আবশ্যিক গন্তব্যস্থল। একদিন রাতে আই এফ এ সচিব পদে সদ্য নির্বাচিত প্রদ্যুতদার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর হোটেল রুমের বাইরে কলিংবেলে আঙুল ছোঁয়ালাম। প্রদ্যুতদা নিজেই উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের আহ্বান করলেন।

বলা প্রয়োজন যে, এই মিটিংয়ের এক মাস আগে ধুন্ধুমার নির্বাচন করে আই এফ এ সচিব পদে প্রথমবার আসীন হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লড়তে হয়েছিল ভূতপূর্ব সচিব অশোক (নন্তু) মিত্রের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তবে মেজদা দত্তকুলোদ্ভব বিশ্বনাথ বাবুর আশীর্বাদ তাঁর অনুজের মাথার উপর থাকায় স্বচ্ছন্দে সচিব পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রদ্যুতদা নিজেও এই ভোটে লড়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ময়দানে হার্মাদ কর্মকর্তাদের তিনি হাতের মুঠোয় এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সেবার ভোটে জিততে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি।

সেই ভোটের দিন ময়দানের একটি তাঁবুতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। প্রদ্যুতদার এক ঘনিষ্ঠ অনুগামী সেই বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিলেন। সচিব হওয়ার পর বেঙ্গালুরুতে প্রথম সাক্ষাৎকারেই প্রদ্যুতদাকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। যথেষ্ট অপ্রিয় প্রশ্ন ছিল সেটি। কিন্তু দাপুটে কর্মকর্তাটি সোজাসাপটা জবাব দিয়েছিলেন, 'বাংলার রূপকার ডা. বিধানচন্দ্র রায়কেও বৌবাজার থেকে ভোটে জিততে জগা-ভানুর সাহায্য নিতে হত। আমিও সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে ভোটে নেমেছিলাম। তবে ওটা ছিল দুর্ঘটনা যা আগাম অনুমান করা যায় না। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি ওই ছেলেটির পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।'

কলকাতা ময়দানে প্রদ্যুত দত্তর মতো দাপুটে প্রশাসক আর হয়তো কোনওদিন

আসবে না। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে কখনও দ্বিধা করতেন না। তাই শতাব্দীপ্রাচীন, ঐতিহ্যশালী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তিনি দ্বিতীয় ডিভিশনে নামিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই নিয়ে মহামেডান মাঠে নিয়মিত জনসভা হয়েছিল। মির মহম্মদ ওমরের মতো ওজনদার ও প্রভাবশালী কর্মকর্তার চোখ রাঙানিকেও তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। মহামেডান স্পোর্টিং-এর সুলেমান খুরশিদরা হাজার চেষ্টা করেও প্রদ্যুতদাকে টলাতে পারেননি। এরপর মনে পড়ছে, বড় ম্যাচে বেপরোয়া আচরণের জন্য ময়দানের তৎকালীন সুপারস্টার সুব্রত ভট্টাচার্যকে ১৯৮৯ সালে প্রায় দু-মাসের জন্য সাসপেন্ড করার ঘটনাটি। সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও তিনি ধার্য করেছিলেন। তাই নিয়ে মোহনবাগান মাঠে প্রবল বিক্ষোভ হয়েছিল। তখন মোহনবাগান কর্ণধার ধীরেন দে'র চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন সুব্রত, তাই ক্লাবের পক্ষ থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার জন্য তেমন জোরাজুরি করা হয়নি।

১৯৮৫ সালে আই এফ এ শিল্ডে সচিবের দায়িত্বে আসার পর একসঙ্গে তিনটি বিদেশি ক্লাবকে এনেছিলেন। তার মধ্যে ছিল কোপা লিবের্তোদোরেসের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের পেনারল ও চ্যাম্পিয়নস্ লিগে খেলা ইউক্রেনের শাখতার ডোনেসক। ১৯৭৩ সালের পর শিল্ডে এমন কোয়ালিটি বিদেশি দল মাঝে আর খেলেনি।

ভারতীয় ফুটবলে পেশাদার লিগ চালুর কথা প্রথম ভেবেছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। যা ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ চিরিচ মিলোভান মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তার দশ বছর বাদে এদেশে চালু হয়েছিল জাতীয় লিগ। পেশাদার ফুটবল সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল প্রদ্যুতদার। তিনি বলতেন, 'মোহনবাগান ও ইস্টবঙ্গলের ফ্যান বেস যেরকম বিশাল তা ইউরোপেরও খুব কম ক্লাবের রয়েছে। কিন্তু দুই প্রধানের কর্মকর্তারা সেটা কখনও কাজে লাগাতে পারেননি। এই ক্লাবগুলি যদি পাবলিক লিমিটেডে পরিণত হয়ে স্টক মার্কেটে শেয়ার ছাড়ে তাহলে সমর্থকদের ইনভল্ভমেন্ট অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু এই লাইনে ভারতীয় ফুটবলে কোনও কর্মকর্তা ভাবেননি। যে কোনও পেশাদার ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম, নিজস্ব প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড এবং মাঠ থাকা আবশ্যিক। এখানেই মার খাবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। কারণ, এরা গড়ের মাঠে কাঠের পাটাতনে আবৃত একফালি খেলার জায়গা পেয়েছে। যার মালিক ফোর্ট উইলিয়াম। অথচ ইউরোপে যে কোনও মাঝারি মানের ক্লাবেরও নিজস্ব স্টেডিয়াম ও কোম্পানি রয়েছে।

প্রদ্যুতদা আই এফ এ সচিব না হলে শিলিগুড়ি কখনও পেত না কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম। তৎকালীন ফেডারেশন সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না। কিন্তু সেই সময়ের দাপুটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবকে রাজি করিয়ে তিনি রেলের কিছুটা জমি পেয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের রূপরেখা

তৈরি করেন। এরপর সুতারকিন স্ট্রিটের আই এফ এ অফিস বন্ধক দিয়ে ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নেহরু কাপের সফল আয়োজন করেছিলেন। পরের বছর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি ও অশোক ঘোষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফেডারেশনে প্রেসিডেন্ট ও সচিব পদে দাঁড়িয়েছিলেন যথাক্রমে সন্তোষমোহন দেব ও প্রদ্যুত দত্ত। এই নির্বাচনের আয়োজন করতে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল তাঁর। তিনি পরাস্ত হন সেবার। ১৯৯৪ সালের ১৬ নভেম্বরে তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর অভাব বঙ্গীয় ফুটবলে আজও পূরণ হয়নি।

শিলিগুড়ির স্টেডিয়ামের নাম হোক ‘প্রদ্যুত দত্ত ক্রীড়াঙ্গন’

প্রদীপ নাগ
(প্রাক্তন ফিফা আন্তর্জাতিক রেফারি)

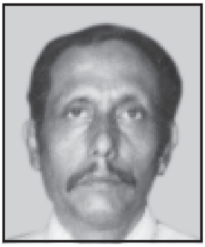

প্রদ্যুত দত্ত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অনিবার্যভাবে এসে যাবে তাঁর অগ্রজ বিশ্বনাথ দত্ত-র নাম। দু-জনই দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক। তবে বিশ্বনাথ দত্ত শুধু ফুটবল আঙিনায় আবদ্ধ ছিলেন না। পাশাপাশি সর্বভারতীয় ক্রিকেটেও তিনি দক্ষ একজন প্রশাসক হিসাবে দাগ কেটে গেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এরকম অনেক খেলা পরিচালনা করেছি দীর্ঘ দিন। ফুটবলে রেফারি হিসাবে শুরু অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা থেকে। সালটা ১৯৬৮। আমি তখন জেলা ২৪ পরগনায় নিয়মিত রেফারিং করছি। সেই সময় কলকাতার অফিস লিগ ফুটবল পরিচালনার জন্য জেলার রেফারিদের ডেকে আনা হত। প্রথম যখন ময়দানে পা রাখলাম অর্থাৎ বাঁশি বাজাবার সুযোগ পেলাম তখন কলকাতা রেফারিস সংস্থা অর্থাৎ সি আর এ-র সচিব ছিলেন রাসবিহারী চক্রবর্তী এবং আই এফ এ-র সচিব ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত। সেই সময় সি আর এ তাঁবুতে আই এফ এ-র গভর্নিং বডির সভা হত। প্রতিটি সভায় তিনি হাজির থাকতেন। সেই সূত্রে খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ হত। তখন কলকাতা ফুটবল ছিল জমজমাট। মে মাসে ফুটবল লিগ শুরু হত। তার আগে এপ্রিলে ময়দান গমগম করত। তখন নিয়মিত খেলা হত পাওয়ার লিগ। এই পাওয়ার লিগ ছিল কলকাতার বড় তিন দলের কাছে প্র্যাকটিস ম্যাচের মতো। তিন বড় দলের পাঁচজন নিয়মিত ফুটবলার পাওয়ার লিগে খেলার সুযোগ পেতেন। আবার নীচের ডিভিশনের খেলা হত এলেন লিগ, বেঙ্গল সরকার লিগ। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল অফিস লিগ। অফিস লিগে তখন চারটি ডিভিশনে খেলা হত। সেখানে পিটার থঙ্গরাজ থেকে পি কে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, সুকুমার সমাজপতি, শান্ত মিত্র, প্রশান্ত সিনহা, পরিমল দে, অশোক চ্যাটার্জি, অসীম মৌলিকের মতো ভারতখ্যাত তারকারা প্রায় নিয়মিত খেলতেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবের পাশে পৌরপ্রতিষ্ঠান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এরকম অফিস লিগে খেলা দলগুলোর তাঁবু ছিল। এতগুলো কথা বলার কারণ হল বিশ্বনাথ দত্ত-র সময়ে ময়দান গমগম করত। সর্বস্তরেই বিরাজ করতেন বিশ্বনাথ দত্ত। তাঁর সঙ্গে সব ক্লাবের প্রতিনিধির সঙ্গে ছিল মধুর সম্পর্ক।

তবে তাঁর খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ আমার হয়েছিল ১৯৭৮ সাল থেকে। তিনি তখন সি এ বি-র সচিব। আমিও তখন নিয়মিত আম্পায়ারিং করছি। আই এফ এ-র মতো সিএবি-র সচিব হিসাবেও তিনি অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। নানান বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন।

বিশ্বনাথ দত্ত-কে নিয়ে এতগুলো কথা বলার কারণ হল তাঁকে অনুকরণ করেই বাংলার ক্রীড়াজগতে অশোক ঘোষ এবং জগমোহন ডালমিয়া ফুটবল এবং ক্রিকেট প্রশাসনে সুনাম অর্জন করেছেন। ফুটবলে যেমন অশোক ঘোষকে হাতে ধরে তৈরি করেছেন সেরকম ক্রিকেটে জগমোহন ডালমিয়াকে।

প্রদ্যুত দত্ত ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত-র কনিষ্ঠতম ভ্রাতা। সেই হিসাবে যোগ্য উত্তরসূরি।

যতদূর জানি অশোক ঘোষ বা জগমোহন ডালমিয়ার মতো ক্রীড়া প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বনাথ দত্ত-র সান্নিধ্য খুব একটা পাননি। তিনি বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে দক্ষতা প্রমাণ করেছেন নিজ গুণে। ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে সম্বল করে। প্রশাসক হিসাবে তিনি ছিলেন অসীম সাহসী। এককথায় ডাকাবুকো। কোনওরকম চাপের কাছে মাথা নত করতেন না। রাজ্যের নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ মাথা উঁচু করে চলেছে প্রদ্যুত দত্ত সচিব থাকাকালীন সময়ে।

এমনিতে তিনি ছিলেন প্রাণখোলা, আমুদে মানুষ। কালীঘাটে ৪ বি অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়িতে ফুটবলের জমাট আড্ডা বসত। সেখানে সাংবাদিকদের পাশাপাশি, রেফারি, ফুটবল জগতের অনেকেই মাঝেমধ্যে হাজির থাকতেন। নানারকম মুখরোচক খাবার আসত এই ফুটবল আড্ডায়। নিজে যেমন খেতে ভালোবাসতেন সেরকম ভালোবাসতেন অন্যদেরও খাওয়াতে। তখন মনে হত না প্রাণখোলা এই মানুষটিই কখনও কঠোর হতে পারেন। যেমন, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে সাসপেন্ড করার মতো সাহস তিনি দেখিয়েছেন। যে জন্য ১৯৮৭ সালে মহামেডান ক্লাবকে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে যে ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে উঠেছিল, তারপর একনাগাড়ে পাঁচ বছর কলকাতা লিগ জিতে ভারতীয় ফুটবলে ঝড় তুলেছিল। সেই ক্লাবকে মাঠে রেফারির সিদ্ধান্ত না মেনে দল তুলে নেওয়ার জন্য শাস্তি দিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি প্রদ্যুত দত্ত। কারণ তাঁর কাছে আই এফ এ এবং সি আর এ-র সম্মান ছিল এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। এরকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মহামেডান ক্লাবের শীর্ষকর্তা মীর মহম্মদ ওমর প্রদ্যুত দত্ত-র কাছে ছুটে গিয়েছিলেন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য। এমনিতে ওমরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর ভালোই ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে তাঁর কাছে ছিল আই এফ এ-র অস্তিত্ব। মহামেডান শীর্ষকর্তাকে পরিষ্কারই বলেছিলেন, ‘দুঃখিত। আমার হাত পা বাঁধা।’

তিনি সাসপেনসনের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারবেন? এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যেও সংশয় ছিল। যখন বললাম আপনাকে সিদ্ধান্ত বদলাতেই হবে। মহামেডানকে সাসপেন্ড করতে পারবেন না। তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'পারবই। সিদ্ধান্ত বদলের কোনও সম্ভাবনাই নেই।' এতটাই কঠোর ছিলেন সেই সময়ে।

আসলে বেনিয়ম তিনি বরদাস্ত করতেন না। স্বভাবতই তিনি সচিব থাকাকালীন রেফারিরা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভরসা পেতেন। সাহসী হতে পারতেন।

সচিব হিসাবে তাঁর বিশাল অবদান হল শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর আয়োজন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের এই আসর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে বলে যখন তিনি ঘোষণা করলেন তখন সেই মাঠে আন্তর্জাতিক আসর আয়োজনের পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু রাতারাতি শিলিগুড়ির টিনে ঘেরা তিলক ময়দান নতুন রূপ ধারণ করল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হিসাবে। আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ড্রেসিংরুম— সবই তৈরি হল যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি হিসাবে। পাশাপাশি তৈরি হল সুদৃশ্য রাজপথ, হোটেল এরকম অনেক কিছুই যা নাকি গোটা শহরের চেহারাই বদলে দিয়েছিল। অস্বীকার করার উপায় নেই স্টেডিয়াম, পথঘাট সব কিছুই তৈরি হয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে। তবু মানতেই হবে এইসব উন্নয়নের নেপথ্যে ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত।

পরবর্তীতে ফেডারেশন কাপ, সন্তোষ ট্রফি, আই লিগ, এশিয়া কাপের অনেক খেলাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলিগুড়িতে। রাতারাতি শিলিগুড়ি হয়ে উঠল ফুটবলের শহর। স্টেডিয়াম না হলে সাইয়ের কমপ্লেক্সও হয়তো এখানে হত না। তাই আমার মতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নাম হোক – 'প্রদ্যুত দত্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন'।

রেফারিরা ভরসা পেতেন

চিত্তদাস মজুমদার

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রেফারি)

একজন দক্ষ প্রশাসক এবং সংগঠক হিসাবে প্রদ্যুত দত্ত-র নাম সবাই মনে রাখবেন। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই অনেকে লিখেছেন। আই এ ফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে কোনও রকম চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। একথা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেক্ষেত্রে আমি একজন রেফারি হিসাবে তাঁকে যে রকম দেখেছি কিছু ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। একটা ফুটবল দলে যে রকম তরুণ ফুটবলারদের তুলে ধরার জন্য ক্লাবের কর্মকর্তাদের বড় ভূমিকা থাকে, সে রকম রেফারিদের তুলে আনার জন্য ভূমিকা থাকে রেফারি সংস্থা এবং নিয়ামক সংস্থার। প্রদ্যুতদা ছিলেন এমনই একজন সচিব। তিনি আমাদের মতো জুনিয়র রেফারিদের উঠে-আসার ক্ষেত্রে সব সময়ই পাশে থেকেছেন, ভরসা দিয়েছেন। তিনি এমনই একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন যে জন্য তাঁর আমলে রেফারিরা বড় দলের বিপক্ষেও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করতেন না। এ ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত জীবনে একটা ঘটনার কথা তুলে ধরছি।

কলকাতা লিগে মোহনবাগান বনাম জর্জ টেলিগ্রাফ ম্যাচে মাঠে মারপিট করার জন্য দুই দলের দু-জন ফুটবলারকে খেলা চলাকালীন 'মার্চিং অর্ডার' দিয়েছিলাম। আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি জর্জ টেলিগ্রাফের তৎকালীন কোচ ক্যাপ্টেন ঘোষ (সুমিত)। ম্যাচ শেষে আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি কী করে পরের ম্যাচে পোস্টিং পাও আমি দেখব।' সেদিন অনেকেই আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন, 'একদিকে মোহনবাগানের মতো বড় দল, অন্যদিকে আই এফ এ সচিবের নিজের ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফ। অতটা কঠোর না হলেও পারতে।' সত্যি বলছি পরে আমিও একটু ভয় পেয়েছিলাম।

পরদিন সি আর এ তাঁবুতে পৌঁছতেই তৎকালীন সি আর এ সচিব সন্তোষ সেন আমাকে প্রদ্যুতদার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। দুরুদুরু বুকে আমি হাজির হয়েছিলাম আই এফ এ অফিসে। সেখানে ম্যাচের পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোহনবাগান কোচ অমল দত্ত-র বিবৃতি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেখানে অমল দত্ত পরিষ্কারই আমার সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত বলে জানিয়েছিলেন।

সেদিনের 'বর্তমান' পত্রিকা সবার সামনে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'ফুটবলাররা মাঠে অভব্য আচরণ করবে, রেফারি কী তখন তাদের আদর করবে?' পাশাপাশি জর্জের কোচ ক্যাপ্টেন ঘোষকে বলেছিলেন, 'আপনাকে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে কোচিং করাতে হবে না।' অর্থাৎ ক্যাপ্টেন ঘোষকে আমার পোস্টিং বন্ধের হুমকি দেওয়া, ব্যাপারটা ভালোভাবে নেননি প্রদ্যুতদা। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের ক্লাবের প্রতি কোনও দুর্বলতা ছিল না। একজন দক্ষ প্রশাসককে যে সব সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয় এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

প্রদ্যুতদা আমার কাছে 'ভগবানের' মতো। দীর্ঘ রেফারিং জীবনে তাঁর কাছ থেকে যে রকম সহযোগিতা পেয়েছি সে কথা মাথায় রেখেই বলছি তিনি সহযোগিতা না করলে আমি 'ফিফা' ব্যাজ অর্জন করতে পারতাম না। ১৯৯১ সালে জার্মানি, ইন্দো-জার্মান celebration ম্যাচ, ১৯৯২ ন্যাশনাল, ১৯৯০ ফিফা, ১৯৮৯ শিল্ড ফাইনাল।

তিনি একজন বড় মাপের সংগঠক, দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কোনওরকম বেনিয়ম বা অন্যায় বরদাস্ত করতেন না।

ফুটবলে আমাকে নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। আই এফ এ-র তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা রঞ্জিত গুপ্ত সিল করা একটা খাম আমার হাতে ধরিয়ে প্রদ্যুতদার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। ৩০ জন ফুটবলারের নাম সেই তালিকায় ছিল। আমি তো এরকম একটা দায়িত্ব পেয়ে অবাক। প্রদ্যুতদার সঙ্গে দেখা করলে বলেছিলেন, 'নির্বাচক কমিটির সদস্যদের মধ্যে একটা ক্লাবপ্রীতি থাকতেই পারে। নিজেদের দলের ফুটবলারদের প্রতি তাঁদের দুর্বলতা থাকাটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একজন রেফারি নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে।' সেই হিসাবেই আমাকে কমিটিতে নিয়েছিলেন। একজন রেফারি হিসাবে কলকাতা লিগে ফুটবলারদের পারফরম্যান্স যাচাই করার সুযোগ থাকে। সেই হিসাবে আমার উপর ভরসা রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত আমি যে ২৫ জনের নাম বেছে নিয়েছিলাম তারাই দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাংলা সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

সে বছর বাংলা দলের ফুটবলার, কোচ, ম্যানেজারের পাশাপাশি রেফারিরাও ব্লেজার পেয়েছিলেন (কালিদাস মুখার্জি এবং সুকৃতি দত্ত)। শুধু ব্লেজার দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা নয়। আসলে তিনি সব সময়ই রেফারিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রেফারিদের সমস্যা মেটাবার ব্যাপারে সব সময়ই আন্তরিক ছিলেন। রেফারিং জীবনে বা পরবর্তীতে সি আর এ-তে জড়িত থাকার সূত্রে আরও অনেক সচিবকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি প্রদ্যুত দত্ত-র মতো এরকম আর একজনকেও খুঁজে পাইনি। সব মিলিয়ে দায়িত্ব নিয়েই বলছি ভারতীয় ক্রীড়াজগতে তিনি ছিলেন অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম।

শূন্যতা আজও পূরণ হয়নি

দেবু মুখার্জি

(ক্রীড়া সংগঠক)

প্রদ্যুতদা-র সঙ্গে আমার পরিচয় সত্তর দশকের শেষ দিকে। তিনি তখন চুটিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফের দল গড়ছেন। আর আমি তালতলা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কলকাতা লিগে খিদিরপুরের সঙ্গে খেলাকে কেন্দ্র করে মামলা চলছিল। সেই সময়ই একদিন প্রদ্যুতদা আমাকে ডেকে পাঠালেন। কীভাবে মামলায় লড়তে হবে আমাকে বোঝালেন। ঠিক সেই সময় থেকেই আমাদের সম্পর্ক দাদা-ভাইয়ের মতো।

প্রদ্যুতদা আই এফ এর সচিব হয়েছিলেন ১৯৮৫ সালে। এমন একটা সময়ে তিনি সচিব হয়েছিলেন যখন আই এফ এ-র আর্থিক দুরবস্থা চলছে। সেই দুরবস্থা কাটাতে আই এফ এ-তে 'Donor' মেম্বারশিপ চালু করলেন। আর্থিক দুরবস্থা অনেকটাই সামলাতে পেরেছিলেন। বেশ কয়েকটা ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলকাতা ফুটবলে তখন একটা সংক্রামক ব্যাধি ছিল 'গট আপ' খেলা। এই অনৈতিক খেলাটা বন্ধের জন্য তিনি বেশ কয়েকটা পদক্ষেপ করেছেন। তার আগে নির্লজ্জ ১৯৪ গোলের কলঙ্ক বাংলার ফুটবলকে আসামির কাঠগড়ায় তুলে ছিল। সেই কারণে সন্দেহজনক ম্যাচে নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দায়িত্বে আসার আগে কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনে দলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৫ থেকে ২৭-এ পৌঁছেছিল। লিগে রিটার্ন লিগ সিস্টেম তুলে দেওয়া হয়েছিল। প্রদ্যুতদা প্রথমেই দলের সংখ্যা আবার ১৫-তে নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে আবার আগের মতো রিটার্ন লিগ চালু করলেন।

তিনি সচিব হওয়ার পর একটা চক্র সব সময়েই অসহযোগিতা করে গেছে। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রদ্যুতদা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সততা বজায় রেখেছেন। শেষপর্যন্ত জয়ীও হয়েছেন।

মাঠে এবং মাঠের বাইরে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা, বেআইনি কাজকর্মকে বরদাস্ত করতেন না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ ১৯৮৬ সালে মহামেডান ক্লাবের সাসপেনশন। সেই সময় বিভিন্ন মহলের চাপ সত্বেও তিনি ছিলেন অটল। ১৯৩৪ সাল থেকে কলকাতা লিগে মহামেডান ঝড় তুলেছিল। তখন তো বটেই, পরবর্তীতে মহামেডান

ক্লাবের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বিশাল। এরকম একটা শক্তিশালী ক্লাবকে সাসপেন্ড করার মতো সাহস দেখিয়েছিলেন প্রদ্যুতদা। ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৬ একটানা ৫৩ বছর কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলার পর মহামেডানকে নেমে যেতে হয়েছিল দ্বিতীয় ডিভিশনে। মনের দিক থেকে তিনি এরকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চাননি। কিন্তু মহামেডান ক্লাব শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছিল। ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেছিল। তারপরেও যদি কঠোর না হতেন তাহলে পরবর্তীতে অন্য যে কোনও ক্লাবও এভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গ করতে সাহস পেত। এ ব্যাপারে প্রদ্যুতদা ছিলেন নিয়মমাফিক। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনও জায়গা ছিল না। অথচ এই মানুষটিই ছিলেন উদার মনের। মহামেডান মাঠের পাশ দিয়ে যখন আসতেন তখন দেখতেন মহামেডান ক্লাবের ফুটবলপ্রেমী অনেক সমর্থক রেড রোডের ধারে প্রাচীরে শুয়ে আছেন। এরকমই একদিন আসার পথে আমাকে বলেছিলেন, 'ওদের দেখলে কষ্ট হয়, কিন্তু আমি যে নিরুপায়। কঠোর না হলে আই এফ এ-কে কোনও ক্লাবই মানবে না।'

তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ ফুটবল। এ আই এফ এফ সেবার আই এফ এ-কে প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছিল। প্রদ্যুতদা ঠিক করলেন খেলাটা কলকাতায় করবেন না। বেছে নিলেন রাজ্যের কর্মব্যস্ত শহর শিলিগুড়িকে। খেলাটাকে কলকাতা কেন্দ্রিক না করে শিলিগুড়িকে বেছে নিলেন। যেভাবে কেরালাতে হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি শিলিগুড়িকে বেছে নিলেও অনেকরকম বাধা এসেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। প্রথম বাধা এল এ আই এফ এফ থেকে। তৎকালীন সচিব অশোক ঘোষ বলেছিলেন সম্পূর্ণ কংক্রিট স্টেডিয়াম এবং পরিকাঠামো না থাকলে কোনও আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট করা যাবে না। ঘটনা হল শিলিগুড়িতে স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হলেও অনেক কাজই অসম্পূর্ণ ছিল। তখনও পর্যন্ত ড্রেসিংরুম তৈরি হয়নি। গ্যালারিও অর্ধেক বাকি ছিল। কিন্তু প্রদ্যুৎদাও নাছোড়। রাজ্য সরকার তখন অনেকটা বাধ্য হয়েই ঝড়ের গতিতে স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এ ব্যাপারে আই এফ এ থেকেও বিশাল অঙ্কের অর্থ ঋণদানের ব্যবস্থাও করেছিল। বলতে দ্বিধা নেই, শিলিগুড়িতে স্টেডিয়াম নিশ্চয়ই হত। কিন্তু এত দ্রুত সম্পূর্ণ হওয়ার পিছনে অবশ্যই বড় অবদান ছিল প্রদ্যুৎদার। প্রসঙ্গত নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে সেই সময় সেজে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম এই শহর। চেহারাই বদলে গিয়েছিল শিলিগুড়ির। এ ব্যাপারে নেপথ্য নায়ক হিসাবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এরপর শুরু হল প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা। কলকাতা থেকে বিশাল একটা বাহিনী নিয়ে আয়োজন করেছিলেন অষ্টম নেহরু গোল্ড কাপ। শহরের বিভিন্ন হোটেলে কর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, বিদেশি দলগুলোকে

আপ্যায়ন, কোনও দিকেই ত্রুটি রাখেননি। সমস্যা হয়েছিল বিদেশি দল আনা নিয়েও। কিন্তু তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে এই ব্যাপারেও সফল হয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং পোল্যান্ডের মতো দুটি শক্তিশালী দলকে এনেছিলেন। শিলিগুড়ির ফুটবলপ্রেমী মানুষরা নিশ্চয়ই ১৯৮৮, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের দিনগুলো আজও মনে রেখেছেন।

আর একটা ঘটনা বলছি। সালটা ১৯৮৯। সেবার সন্তোষ ট্রফির আসর বসেছিল কুইলনে। গড়াপেটা খেলে বাংলাকে ছিটকে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদে গোটা বাংলা দল কালো ব্যাজ পরে সেই ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল। প্রতিবাদের জন্য এ আই এফ এফ বাংলা দলকে সাসপেন্ড করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এ আই এফ এফ-এর প্রাক্তন সচিব বাংলার অশোক ঘোষের তখন বিশাল প্রভাব ছিল ভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে। অশোকদাকে পরিষ্কারই বলেছিলেন, 'ফেডারেশন পরিচালকদের বলবেন বাংলার পিছনে যেন লাগার চেষ্টা না করে। আমি কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব না।' এই একটা টনিকেই কাজ হয়েছিল।

বাংলার ফুটবলকে বাঁচাতে, বিভিন্নরকম চক্রান্ত রুখতে তিনি একটা দল গড়েছিলেন। সেই দলে আমাকেও রেখেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে এনেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অজিত সেনগুপ্তকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা বেশিদিন তাঁকে কাছে পেলাম না। সত্যি বলতে, আমরা একজন দক্ষ অভিভাবককে অকালেই হারালাম। তাঁর অকালপ্রয়াণে বাংলার ফুটবলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আজও পূরণ হয়নি।

প্রদ্যুত পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক দত্ত

জি সি দাস

(বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক)

মিস্টার প্রদ্যুত দত্ত বলেই আমি তাঁকে সম্বোধন করতাম। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল অশোকদার মাধ্যমে। অশোকদা মানে অশোক ঘোষ তখন আই এফ এ-র সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৭৬ সালে ক্ষণিকের মতো কথাবার্তা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন সুদীর্ঘক্ষণ ধরে নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং 'খেলার কথা' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক অল্পবিস্তর কথাবার্তার পর আমি জার্মানিতে ফিরে গিয়েছিলাম।

আসলে জার্মানি থেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। সোমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, ফ্লাইট নং এল এইচ ৭৮০ লুফৎ হানসার বোয়িং বিমানে চড়ে ভায়া বোম্বাই হয়ে কলকাতায় পরদিন মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে এসে পৌঁছেছিলাম। কারণ শনিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, মোহনবাগান বনাম কসমসের ম্যাচ কভার করে জার্মানির 'নরড ডয়েচ সাইটুং' এবং 'ওসনাব্রুক সাইটুং'-এ রিপোর্ট পাঠাতে এবং বেকেনবাওয়ার হংকং থেকে কেন দেশে ফিরে গেলেন সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে এসেছিলাম। বুধবার আই এফ এ অফিসে গিয়ে অশোকদার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসার সময় দেখা হয়েছিল অমল বণিক চৌধুরীর সঙ্গে। অমল তখন আমাকে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে নিয়ে গিয়ে মিস্টার প্রদ্যুত দত্তের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অমল বণিক চৌধুরী, নেপাল চক্রবর্তী হলেন দত্ত পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেপাল দত্ত পরিবারের মহিরুহ বিশ্বনাথ দত্তের জন্যই মুসলিম ইনস্টিটিউট থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে আই এফ এ-তে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। অমল বণিক চৌধুরী বৌবাজারের জর্জ টেলিগ্রাফে কাজ করতেন। এদের দুজনের সঙ্গেই আমার পরবর্তী সময়ে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরা দুজনেই মিস্টার প্রদ্যুত দত্তর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। মি. দত্ত আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নানা বিষয়ে, বিশেষ করে বিদেশি এবং ইউরোপের ফুটবল সম্বন্ধে, আলোচনা করলেন। আমি অবশ্য শনিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, মোহনবাগান- কসমসের ম্যাচ কভার করেই জার্মানি ফিরে গেলাম।

ক্যামাক স্ট্রিটের শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এর টেনথ ফ্লোর থেকে 'খেলার কথা' পত্রিকা প্রকাশিত হল। আমি জার্মানি থেকে নিয়মিত বিদেশের ফুটবল সম্বন্ধে

লেখা পাঠাতাম এবং মাঝেমধ্যে যখন কলকাতায় আসতাম তখন মি. দত্তর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে রাত্রে দেখা করতাম। ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে সাধারণত মি. অশোক দাশগুপ্ত, এডিটরের সঙ্গে এবং খেলার কথা-র প্রাণভোমরা বিপ্লব দাশগুপ্ত, নীরব রায়, রতন ভট্টাচার্য, সরোজ চক্রবর্তীদের সঙ্গে একান্তে আলাপ ও কথোপকথন করতাম। কিন্তু আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মি. দত্তর বাড়িতে রাত্রে গিয়ে কথা বলতাম।

১৯৮৫ সালে প্রদ্যুত দত্ত আই এফ এ-র সম্পাদক হলেন। বাংলার ফুটবল প্রশাসনে একজন বলিষ্ঠ এবং দক্ষ প্রশাসক। ৪ বি অপূর্ব মিত্র রোডে তাঁর বাড়ির ম্যাজেনাইন ফ্লোরে একটি মিনি আই এফ এ অফিস ছিল। সন্ধ্যায় সেখানে আই এফ এ-র গুরুত্বপূর্ণ সভা হত এবং নীতি নির্ধারণ করা হত। সেখানে অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে আমার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁরা হলেন রঞ্জিত গুপ্ত, দেবু মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জি প্রমুখ। তাছাড়া সেখানে বলরাম চৌধুরী, টুটু বসু, পল্টু দাস, জীবন চক্রবর্তী, দেবব্রত সরকারদেরও যাওয়া-আসা করতে দেখেছিলাম। মি. দত্ত খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা ন্যায় নীতি নির্ধারণ করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

১৯৮৪-৮৬ সাধারণত আমি মাঝেমধ্যে ভারতে আসতাম। মি. দত্তর দোতলার বড় ড্রয়িংরুমে বসে বিস্তর কথাবার্তা হত। একদিন দেখি একজন দারুণ স্মার্ট ভদ্রমহিলা কয়েকজন যুবক-সমেত এলেন। প্রদ্যুত বাবু জানালেন যে আমার সামনে কথাবার্তায় কোনও অসুবিধা হবে না। মূলত তাঁরা সকলেই রাজনীতি নিয়েই আলাপ-আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রদ্যুৎবাবুর অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান আর তাৎপর্যপূর্ণ টিকা-টিপ্পনী ও উপদেশ শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তাঁর কূটনৈতিক বিচারবুদ্ধি এবং তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধিতে। আমি বুঝলাম যে খেলাধুলো ছাড়াও সেই সময়ের রাজনীতির জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি তাঁর যথেষ্ট আছে। আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। ভদ্রমহিলারা চলে গেলে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম সেই ভদ্রমহিলা হলেন কংগ্রেসের যুবনেত্রী। সে প্রায় ৩৫ বছর আগেকার কথা। প্রদ্যুতবাবু তাঁর প্রখর দূরদর্শিতায় বুঝেছিলেন যে সেই ভদ্রমহিলা ভারতের রাজনীতিতে অনেকদূর পর্যন্ত যাবেন। আজ তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মি. দত্ত আই এফ এর সচিব থাকাকালীন অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার সুব্রত ভট্টাচার্য মাঠে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করার বিরুদ্ধে তিনিই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং জরিমানা ধার্য করেছিলেন। এর আগে কোনও সচিব এই ধরনের কড়া মনোভাব কোনও ফুটবলারের বিরুদ্ধে দেখাতে পারেননি।

তিনি সুদক্ষ প্রশাসক হিসেবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছিলেন। যেমন কয়েকটি বড় বড় সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে সরাসরি কলকাতার ফুটবল লিগে খেলার সার্থক প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া,

সেইল, পিয়ারলেস প্রমুখ নাম অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম কলকাতায় পেশাদারি ফুটবল লিগ চালু করার কথা ভেবেছিলেন। বিদেশের বিভিন্ন দেশে কীভাবে পেশাদারি ফুটবল লিগ খেলা হয়ে থাকে সে বিষয়ে আমার কাছ থেকে খুঁটিনাটি সব ব্যাপারগুলি জেনে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। বিভিন্ন সংস্থাকে কলকাতা ফুটবল লিগের আওতায় আনায় বহু ফুটবলার চাকরি পেয়ে উপকৃত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমাকে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করে তদ্বির করতে বলেছিলেন। ৩০.০৪.১৯৯০ একটি চিঠি মারফত ফিফাকে অনুরোধও করেছিলেন। বিচক্ষণ ভার্সেটাইল প্রদ্যুত দত্ত তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এবং ভারতীয় ফুটবলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে এখানে পেশাদারি ফুটবল খেলার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যতদূর সম্ভব আমার মনে আছে যে তখন প্রায় ৪০ বছর আগে পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের কর্ণধাররা বিশ্ব ফুটবল সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁদের ধ্যান ধারণা শুধুই অলিম্পিক ফুটবল সম্বন্ধে ছিল। বিশ্বকাপ, ইউরো কাপ, কোপা আমেরিকা সম্বন্ধে তেমন কিছু ভালোভাবে জানতেন বলে মনে হয় না। ১৯৫০ বিশ্বকাপ, ভারত সরাসরি খেলবার সুযোগ পেয়েও খেলেনি। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার ভারতে আসার মূল কারণ ছিল যে ফুটবল যুবরাজ বেকেনবাওয়ার হংকং থেকে কেন ভারতে না এসে ফিরে গেলেন? আসল ব্যাপার হল মোহনবাগানের সর্বময় কর্তা ধীরেন দে নিউ ইয়র্কে কসমস কলকাতায় আসার সময় পেলে এবং তার স্ত্রী রোজমারিকে মহামূল্য হীরের আংটি উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার এন এস এল-এর বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলার কসমসের বেকেনবাওয়ার সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না। সেজন্য তিনি বেকেনবাওয়ার ও তাঁর স্ত্রী সেবিলেকে কিছুই দেননি। ফুটবল সম্রাট ও তাঁর স্ত্রী উপহার পাবেন আর বিশ্ব ফুটবলের যুবরাজ ও তাঁর পত্নী পাবেন না তা কি হয়? ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে, মেনে নিয়েছিলেন মোহন সচিব। জার্মানিতে বিভিন্ন কাগজে মোহনবাগান বনাম কসমসের খেলা এবং বেকেনবাওয়ারের ঘটনা ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। ১৯৮৮তে মি. দত্তই সর্বপ্রথম মারাদোনাকে কলকাতায় আনতে চেয়েছিলেন। টাটার রুসি মোদির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছিলেন। ১৯৮৭তে লন্ডনে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে মারাদোনা ৯০ মিনিটের জন্য ৯০ হাজার পাউন্ড নিয়েছিলেন। সেকথা মি. প্রদ্যুত দত্তকে জানিয়েছিলাম। আমি মারাদোনার স্ত্রী ক্লদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলে টপ ফর্মে মারাদোনা কলকাতায় খেলবার জন্য ৯০ মিনিটের জন্য ৯০ হাজার ডলার চেয়েছিলেন। ব্যাপারটা প্রদ্যুত দত্ত জেনেশুনেই এগিয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কিছু সর্বভারতীয় কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রবল বিরোধিতায় ব্যাপারটা বাস্তবে রূপ দেয়নি। ঠিক যেরকমভাবে তাঁর পাক্ষিক জনপ্রিয় ‘খেলার কথা’ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে প্রদ্যুতদা

অলোক মুখোপাধ্যায়

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার)

আমার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছাপুরে। ইছাপুরের মাঠ থেকেই আমার ফুটবল জীবনের যাত্রা শুরু। জেলা লিগে খেলতাম ইছাপুর অনুশীলনী ক্লাবে। ওই ক্লাব তখন জেলার ফুটবলে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করত। সেই দলে আমিও একদিন সুযোগ পেলাম। একথা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না তা হল, বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অবদান। চার-এর দশকের গোড়া থেকেই বছরের পর বছর ভারতীয় ফুটবলে ২৪ পরগনা জেলার ফুটবলাররা দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছেন। কিন্তু এটাও ঘটনা অনেক প্রতিভাবান সুযোগের অভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। অকালেই হারিয়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে ‘ভাগ্যবান’ বলে মনে করি। কারণ, আমার ফুটবল জীবনে প্রদ্যুত দত্তর মতো একজন অভিভাবককে মাথার উপরে পেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, তিনি আমার অভিভাবকই ছিলেন। বাড়িতে যেমন বাবা, মা হলেন অভিভাবক। কিন্তু বাড়ির বাইরে এমন কিছু সহৃদয় ব্যক্তি থাকেন যাঁরা সঠিক পথে পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেন। আমারও ফুটবল জীবনে এমনই একজন মানুষ ছিলেন প্রদ্যুতদা। কারণ, তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন।

১৯৮০ সালে ইস্টবেঙ্গল দলটাই ভেঙে গিয়েছিল। প্রদীপদা সেবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে তাঁর কোচিংয়েই খেলেছিলাম রেল দলে। কারণ, বড় দলে কোচিংয়ের পাশাপাশি প্রদীপদা রেল দলেরও দায়িত্ব সামলাতেন। তিনি আমাকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সইয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

এদিকে আমি তখন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেছি। এক কথায় প্রদ্যুতদা-র কবজায়। প্রদীপদা আমাকে খুঁজছেন শুনে প্রদ্যুতদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন, ‘তুমি আগামী দিনে ভারতীয় দলে খেলবে। সবে এক বছর প্রথম ডিভিশনে খেলছে। এখনই তাড়াহুড়ো কোরো না। কোনও প্রলোভনে পা বাড়াবেনা।’ শিবরাত্রির দিনে ওই কথাগুলো তিনি বলেছিলেন।

একটা বছর আমি জর্জ টেলিগ্রাফে খেলেছিলাম। পরের বছরই যোগ দিয়েছিলাম মহামেডান ক্লাবে এবং সত্যি সত্যি ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়েছিলাম।

তিনি আমাকে সবসময় গাইড করতেন। রেল দলে থাকলে চাকরি নিশ্চিত

ছিল। প্রদ্যুতদা আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এফ সি আই (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)-তে। এফ সি আই-এর স্পোর্টস অফিসার প্রদীপ মিত্র-র কাছে আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আমার বাবাকে বলেছিলেন, 'রেলের মতো বেতন এফ সি আই থেকে পাবে না। তবে আমরা সেই ঘাটতি মিটিয়ে দেব।'

১৯৮৯ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচকরা আমাকে বেছে নেওয়ার পিছনে প্রভাব ছিল প্রদ্যুতদার। কারণ, আইএফএ-র প্রথা অনুযায়ী আমার আগে একটা ম্যাচ খেলার জন্য সেবার অধিনায়ক হওয়ার কথা ছিল সুদীপ চ্যাটার্জির। প্রদ্যুতদা নির্বাচকদের বলেছিলেন, 'দলের নেতৃত্বে থাকবে অলোক। কারণ, অলোক আমার ক্লাবের প্লেয়ার।'

তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। একদিকে প্রবল ব্যক্তিত্ব, পাশাপাশি স্নেহপ্রবণ মন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ববান কর্মকর্তা আমি অন্তত দেখিনি। আজকের দিনে, বিশেষ করে বাংলার ফুটবলের দুঃসময়ে প্রদ্যুতদার মতো একজন কর্মকর্তার অভাব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি।

প্রতিদান দিতে পারিনি

বিপ্লব মজুমদার

(প্রাক্তন ফুটবলার, জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব)

১৯৭৫ সালে কলকাতা লিগে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে খেলেছিলাম। ম্যাচে আমরা ২-০ গোলে জিতেছিলাম। মনে হয় ভালোই খেলেছিলাম, গোলও করেছিলাম। সেদিন মাঠে প্রদ্যুতদা হাজির ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর নজর কেড়েছিলাম। কারণ পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে জর্জ টেলিগ্রাফের হেরম্ব চক্রবর্তী জর্জে খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি তখন কলেজ স্ট্রিটে থাকতাম। প্রথম দিন হেরম্বদাকে কথা দিতে পারিনি। সময় চেয়েছিলাম। তারপর কিছুদিন বাদে জলপাইগুড়িতে নিজের বাড়িতে যাওয়ার পর একদিন সেখানেও গিয়ে হাজির হলেন হেরম্বদা। বললেন, আর সময় নিতে পারব না। এ বারে আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতেই হবে। আমাদের বাড়িতে ক'দিন থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে এলাম। তখন বুঝলাম সত্যিই জর্জ টেলিগ্রাফ আমাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী।

প্রথমে কথা দিতে পারিনি যার একটিই কারণ হল অমল দত্ত। অমলদা তখন টালিগঞ্জের কোচ ছিলেন। তাঁর কোচিংয়ে খেলার সুযোগ ছাড়তে চাইনি। এদিকে কলকাতায় আগে থেকেই খবর ছিল অমলদা হয়তো ১৯৭৬ সালে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিচ্ছেন। কলকাতায় এসে খবরটা নিশ্চিত জানার পর জর্জ টেলিগ্রাফে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে গেলাম। শিয়ালদার জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিউটের অফিসে গিয়ে প্রদ্যুতদার সঙ্গে দেখা করার সময়ই অমলদা যে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন খবরটায় নিশ্চিত হয়েছিলাম। প্রথমদিনই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম সত্যিই তাঁরা আমার ব্যাপারে প্রবলভাবে আগ্রহী। প্রথমদিনই প্রদ্যুতদার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম তিনি এককথার মানুষ। প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা। কোনওরকম ভনিতা তাঁর মধ্যে ছিল না।

সেই সময় অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক্যাল ফুটবল প্রতিযোগিতায় দল গঠনের জন্য কলকাতার প্র্যাকটিস চলছিল। আমাদের অফিসের অনেকেই দেখলাম জর্জ টেলিগ্রাফের দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছেন। খবরটা জানার পর আমারও আর জর্জে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা রইল না। প্রদ্যুতদাও সেই সময় আমাদের প্র্যাকটিস দেখতে মাঠে এসেছিলেন। তখনই একদিন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত

হয়ে গেল। আমি তখন পেটের রোগে ভুগছিলাম। খবরটা জানার পর প্রদ্যুতদা আমাকে তুলে এনেছিলেন তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে (৩১ এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড) সেখান থেকেই আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পারিবারিক চিকিৎসকই আমাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। এদিকে আমাদের অফিস দলের ম্যানেজার ছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের কর্তা। তিনি কোচ অমলদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, অমলদাও আমাকে জর্জ টেলিগ্রাফে খেলার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন।

সুস্থ হয়ে ওঠার পরও আমি প্রদ্যুতদার ভবানীপুরের বাড়িতেই থাকতাম। এদিকে আমি জর্জ টেলিগ্রাফে যাচ্ছি খবরটা শুনে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাবের দু-একজন কর্মকর্তা আমাকে ধরে রাখার জন্য ভবানীপুর থানায় ডায়েরি করেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, আমাকে নাকি 'কিডন্যাপ করে প্রদ্যুতদার বাড়িতে রাখা হয়েছে।' সেই ডায়েরির ভিত্তিতে একদিন ভবানীপুর থানার পুলিশ হানা দিয়েছিল প্রদ্যুতদার বাড়িতে। আমি যে ঘরে থেকেছি সেই ঘরে জর্জের আরও কয়েকজন ফুটবলারকে রাখা হয়েছিল। দু-তিনজন পুলিশ অফিসার জানতে চাইলেন 'বিপ্লব মজুমদার কে?' আমি তখন উঠে দাঁড়ালাম। ওরা তখন বললেন, 'আপনাকে থানায় যেতে হবে।' সেই সময় রাতে আমরা (বিভু চক্রবর্তী, শিবব্রত নাথ এরকম কয়েকজন) তখন খোশমেজাজে আড্ডা মারছি। পুলিশ আমাকে তুলে নিয়ে যায় ভবানীপুর থানাতে।

ঘটনা হল, প্রদ্যুতদার বাড়ির উল্টোদিকেই হল ভবানীপুর থানা। পুলিশ আমাকে ওখানে জেরা করছিল। এদিকে খবরটা প্রদ্যুতদার কানে পৌঁছতেই তিনিও আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। কারণ তাঁরা হলেন কলকাতা তথা গোটা দেশের এক সম্ভ্রান্তশালী পরিবারের সদস্য। খেলাধুলো এবং সর্বোপরি শিক্ষাজগতে জর্জ টেলিগ্রাফ একটা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। তাই প্রদ্যুতদা পোশাক পরিবর্তন না করে লুঙ্গি পরা অবস্থায় ছুটে এলেন থানাতে। পুলিশের কাছে জানতে চাইলেন অভিযোগটা কী? ওরা বললেন, 'আমাকে নাকি রাতে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। আমি এখানকার বাসিন্দাই নই।' প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে প্রদ্যুতদা বললেন, 'এখানকার বাসিন্দা নয় ঠিকই, তবে ও আমার বাড়িতেই থাকে।'

আমিও তখন মনে জোর পেয়ে গেলাম। আমার অপরাধটা কী জানতে চাইলাম। ওরা বললেন, 'আপনি রাতে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেন।' প্রবল প্রতিবাদ করলেন প্রদ্যুতদা। তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি হল বেশ কিছুক্ষণ। তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করতে না পেরে তখন একটু নরমও হলেন থানার অফিসাররা। পরে যখন শুনলেন তিনি বিশ্বনাথ দত্তর ছোট ভাই তখন ওরা জানালেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিপ্লব মজুমদারকে ''কিডন্যাপ'' করে আপনার বাড়িতে আটকে রেখেছেন।' তখন আমিও ঠিক না থাকতে পেরে বলেছিলাম, আমি কি মহম্মদ হাবিব যে 'কিডন্যাপ' করতে হবে? তখন আমার কথার সায় দিয়ে থানার ইনচার্জ অফিসারও বললেন,

উনি তো ঠিকই বলেছেন। পাশাপাশি টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কর্মকর্তাদের ধমকের সুরে বলেছিলেন 'এভাবে আমাদের অযথা বিরক্ত করবেন না। আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে।'

সেদিনই বুঝেছিলাম কত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন আমাদের প্রদ্যুতদা। অথচ তখনও তাঁর তেমন নামডাক হয়নি। মাত্র দু-বছর আগে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তবু তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস ও সততা থানার অফিসারদেরও মুগ্ধ করেছিল।

থানা থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রদ্যুতদার মুখে দেখেছিলাম স্বস্তি। বলেছিলেন, 'তুমি আজ আমার এবং আমাদের পরিবারের সম্মান রাখলে। যদি বলতে ''কিডন্যাপ'' করেছি তাহলে মুখ দেখাতে পারতাম না।'

প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রদ্যুতদাকে বাইরে থেকে খুব কঠিন মনে হত, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র এই মানুষটির অকৃত্রিম ভালোবাসা কোনও দিন ভুলতে পারব না। প্রদ্যুতদার ভবানীপুরের বাড়িতেই বিভু, শিবু (শিবব্রত) এবং আমি একসঙ্গে থাকতাম। সেই সময় খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন বড় দাদার মতো। গোটা দলকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। তার রেজাল্টও আমরা পেয়েছিলাম। কলকাতা লিগ, আই এফ এ শিল্ড, দার্জিলিং গোল্ডকাপ – প্রতিটি আসরেই জর্জ টেলিগ্রাফ ছিল সাড়াজাগানো একটা দল। তিন বড় দলও সমীহ করত জর্জ টেলিগ্রাফকে। যার নেপথ্যে কারিগর ছিলেন স্বয়ং সচিব প্রদ্যুত দত্ত।

কিন্তু আমার আক্ষেপ প্রদ্যুতদার স্নেহ-মমতার প্রতিদান সেভাবে দিতে পারিনি। পায়ে চোট পেয়েছিলাম বলে ১৯৭৭ সালে সেভাবে খেলতে পারিনি। অস্ত্রোপচারের পরেও স্বাভাবিক ছন্দ আর ফিরে পাইনি। তবু প্রদ্যুতদা আমাকে ভুলে যাননি। তিনি আই এফ এ-র সচিব হওয়ায় পরই আমাদের জলপাইগুড়ির বাড়িতে এসেছিলেন। তখনই শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল। সত্যি, এরকম একজন বড় মাপের মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। স্বভাবতই আমিও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

পুনঃ – আমি যেবার প্রথম জর্জে এসেছিলাম সেবার ফরোয়ার্ডে মনীশ মান্না, শিবব্রত নাথও ছিল। প্রদ্যুতদা বলেছিলেন, 'তুমি জান না, কত বড় ফুটবলার হতে পারবে।'

আন্তরিকতায় কোনও ফাঁক ছিল না

জগদীশ ঘোষ

(প্রাক্তন ফুটবলার, জর্জ টেলিগ্রাফ)

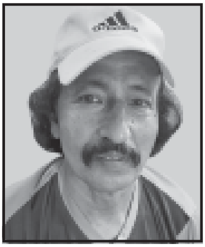

১৯৭৫ সালে খিদিরপুর ক্লাবের হয়ে আমরা বেশ কয়েকজন ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছিলাম। ১৯৭৩ থেকে একটানা তিন বছর খিদিরপুরেই খেলেছি। স্বভাবতই ক্লাবে আমার একটা আলাদা প্রভাবও ছিল। তবু ১৯৭৬ সালে জার্সি বদলে যোগ দিয়েছিলাম জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে। সে বছর এরিয়ান ক্লাবও আমার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। আমার মামা কোল ইন্ডিয়াতে চাকরি করতেন। সেখানে মামার সহকর্মী ছিলেন এরিয়ান ক্লাবের সচিব অশোক মিত্র (নন্টুদা)। সেই সূত্রে আমাকে এরিয়ানে সই করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমার মামারও সেরকমই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নন্টুদা আমার সঙ্গে টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। অ্যাডভ্যান্সও দেননি। তাই আমিও কোনও পাকা কথা দিইনি। সেই সময় (ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে) একদিন দুপুরে আমার কর্মস্থল জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন ময়দানের একজন পরিচিত রিক্রুটার আদিত্য চৌধুরী। আমাকে বললেন, গাড়িতে ওঠো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুতে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত দত্ত। দু-একটা কথা বলার পরই বললেন, আমাদের ক্লাবে খেলতে হবে। শুরুতেই এরকম একটা প্রস্তাব শুনে আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কারণ আমার মামার সঙ্গে এরিয়ানের অশোক মিত্র-র অন্তরঙ্গতা। বলেছিলাম আমি তো এরিয়ানকে কথা দিয়েছি। কিন্তু একথা জানিয়েও তাঁর হাত থেকে ছাড়া পেলাম না। কারণ ময়দানের সব খবর তাঁর নখদর্পণে থাকত। তিনি জানতেন এরিয়ানের সঙ্গে কথা হলেও তারা আমাকে তখনও অ্যাডভান্স করেনি। তাই প্রদ্যুতদা জানতে চাইলেন অ্যাডভান্সের ব্যাপারটাও। পরক্ষণেই বললেন, 'অ্যাডভান্সই যখন দেয়নি তখন আবার কথা কীসের?' আমাকে আর একটা কথা বলারও সুযোগ দিলেন না। তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা চলে এলেন ভবানীপুরে ৩১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। সেদিনই আমার হাতে অ্যাডভান্স ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

জর্জ টেলিগ্রাফে সে বছর কোচ ছিলেন ল্যাংচা মিত্র। কিন্তু লিগের দু-তিনটে

ম্যাচ পরেই দায়িত্বে এসেছিলেন শান্ত মিত্র। শান্তদার কোচিং এবং প্রদ্যুতদার অভিভাবকত্বে শুরু থেকেই জর্জ হয়ে উঠেছিল সংঘবদ্ধ একটা দল। প্রদ্যুতদার ক্যাডারবাহিনীও খুব সক্রিয় ছিল। পুঁটেদা, বাচ্চুদা, আদিত্য চৌধুরী, বাবলু বসু – এঁরা সবাই প্রদ্যুতদার নির্দেশমতো চলতেন। ফুটবলারদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখতেন। এককথায় নিখুঁত টিমওয়ার্ক ছিল প্রদ্যুতদার।

সে বছর আমাদের অনুশীলন হত জর্জ টেন্টের পাশে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে। সিটি মাঠের অবস্থা তখনও যথেষ্ট ভালোই ছিল। একদিন প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ওষুধপথ্য কেনার জন্য প্রদ্যুতদা ডেকে ৫০০টাকা দিয়েছিলেন। এজন্য কারও কাছে তদ্বির করতে হয়নি। আমার যে টাকা দরকার তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন।

সে বছর কলকাতা লিগে দুরন্ত ফুটবল খেলেছিল জর্জ। লিগের শুরুতে পূর্ণ সময়ে মোহনবাগানকে প্রায় রুখেই দিয়েছিলাম। খেলার মধ্যেই হাবিবদা কানের সামনে বেশ কয়েকবার বলেছেন ‘ছোড়দে বাবু’। সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করেছিল মনোরঞ্জন। কিন্তু সারাক্ষণ লড়াই করেও হার বাঁচাতে পারিনি। শেষদিকে কর্নার থেকে উড়ে আসা বল যখন তালুবন্দি করার জন্য উঠতে যাচ্ছি তখন সুভাষদা আমাকে ধরে রেখেছিলেন। সেই সুযোগে আকবর গোল করেছিল। অর্থাৎ ‘অবৈধ’ গোল।

আমার কাছে সেদিনের ম্যাচ ছিল জীবন-মরণ লড়াই। ম্যাচের আগে শহর জুড়ে প্রচার ছিল জগদীশকে ‘ম্যানেজ’ করেছে মোহনবাগান। আই এফ এ শিল্ডেও আমরা মোহনবাগানের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়েছিলাম। মোহনবাগানের বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলার আগে কাশ্মীরে জুনিয়র ন্যাশনালে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে আমি, মনোরঞ্জন, বিপ্লব মজুমদার বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিলাম। ফাইনালের পরদিনই ছিল শিল্ডের সেমিফাইনাল। আমাদের তিনজনকেই বিমানে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রদ্যুতদা।

লিগে মোহনবাগান অনৈতিকভাবে হারিয়েছিল। তার একটা যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হল, কলকাতায় গিয়ে শুনলাম শহর জুড়ে আমাকে নিয়ে অপপ্রচার যে, ‘জগদীশ ঘোষ ম্যানেজ’। রাগে, অভিমানে ক্লাবে গিয়ে আমাকে দলে না রাখার জন্য কোচ শান্ত মিত্রকে ক্ষোভের কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অনুরোধকে পাত্তাই দিলেন না ওঁরা দু-জন। জামা ধরে শান্তদা বলেছিলেন, ‘ওসব আজেবাজে কথায় কান দিতে নেই।’ এমনই কথা বলেছিলেন প্রদ্যুতদাও। ‘গুজবে কান না দিয়ে, মাঠে নেমে সব মিথ্যে প্রমাণ করে দাও।’ আমার ফুটবলজীবনে অন্যতম সেরা ম্যাচ ছিল সেদিন। শেষ পর্যন্ত আমরা হারলেও আমাদের গোটা দলটাই সেদিন উজ্জীবিত ছিল।

১৯৭৭ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে ডাক পেয়েছিলাম। খবরটা আন্দাজ করেছিলেন প্রদ্যুতদা। কালীঘাটে পুজো দিয়ে চিন্ময় চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন জীবনদা। বাবার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। জর্জের হয়ে উইথড্র করাতে নিয়ে যাওয়া হল তখন আই এফ এ অফিসে। হাজির ছিলেন জীবন চক্রবর্তী ও পল্টু দাস। আই এফ এ অফিসের দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন জীবনদা-পল্টুদা। দু-জনই আমাকে উইথড্র করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন ইস্টবেঙ্গলে অনেক বেশি টাকা পাবে। কিন্তু ওদের অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাকে সেবার প্রদ্যুতদা সাত হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালেও দারুণ ছন্দে ছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। দার্জিলিং গোল্ড কাপে একটাও গোল হজম না করে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। জর্জ টেলিগ্রাফে থাকাকালীন কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত চতুর্দলীয় আন্তর্জাতিক ফুটবলে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৭৭ সালে এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় দলে খেলেছি।

ফুটবলারদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। সেখানে কোনও কৃত্রিমতা বা লোকদেখানো ব্যাপার ছিল না। যাঁরা তাঁর ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফে খেলেছেন প্রত্যেকেই তাঁর স্নেহধন্য। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। তাঁর অনেক প্রমাণ আমরা আই এফ এ সচিব থাকাকালীন সময়ে দেখেছি।

সম্ভ্রান্তশালী পরিবারের মানুষ হিসাবে তাঁর চলনে আচরণে ছিল আভিজাত্যের ছাপ। বাংলার ক্রীড়াজগতে একটা বিরাট অবদান রয়েছে দত্ত পরিবারের। আমরা এরকম একটা পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করি। প্রদ্যুতদা-র অকাল-প্রয়াণের পর সুব্রত (বাপি) এবং অনির্বাণ (জয়) সেই ধারাটা বজায় রেখেছেন। এখনও পুত্র জয় খোঁজখবর নেয়। তখন মনে হয় আমিও যেন দত্ত পরিবারের একজন।

এক পায়ের খেলোয়াড়

অরূপ বসু

(বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক)

তখন নেহরু গোল্ড কাপ গর্ব করার মতো একটা আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বহু নামকরা ফুটবল দেশ তাদের সম্ভাব্য ফুটবল তারকাদের নিয়ে খেলতে এসেছে। বিলার্ডো বিশ্ব কাপের সম্ভাব্য আর্জেন্টিনার ফুটবল দলকে নিয়ে খেলতে এসেছেন। তখন নেহরু গোল্ড কাপ মানে শুধু এশিয়ার প্রথম সারির জাতীয় দলের কাছে একটা আকর্ষণ নয়, আকর্ষণ ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর কাছে। নেহরু গোল্ড কাপে আয়োজনের জন্য ভারতে রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলো 'অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন'-এর কাছে আবেদন জানাত। সেইভাবে সেবার নেহরু গোল্ড কাপ আয়োজন করার পালা বাংলার ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোশিয়েশনের। টুর্নামেন্টের বেশ কয়েক মাস বাকি। পশ্চিমবঙ্গের খেলাধূলার পরিকাঠামো যা তাতে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও নেহরু গোল্ড কাপের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কথা ভাবাই যায় না।

নেহরু গোল্ড কাপ শুরু হয়েছিল কলকাতার ইডেন উদ্যানে। তখনও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন তৈরি হয়নি। ইডেনে তাই ফুটবল এবং ক্রিকেট— দুটোরই আন্তর্জাতিক আসর বসত। এরপর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ফুটবলের আন্তর্জাতিক আসর সল্টলেক স্টেডিয়ামেই বসতে শুরু করে। এমনকি ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান-এর পারস্পরিক ম্যাচগুলো— লিগ কিংবা শিল্ডের খেলা যুবভারতী স্টেডিয়ামেই হতে শুরু করে। আর তা নিয়েই ক্লাব কর্তা থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমের একটা বড় অংশের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয় তৎকালীন আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্তের। যুক্তি ছিল — দর্শক ও সমর্থকদের দুর্ভোগ বাড়বে, যাতায়াতের অসুবিধা। প্রথম দিকে রাজ্য পরিবহণ দফতর এজন্য বাড়তি সরকারি বাসও দিতে চায়নি। কারণ ফুটবল মাঠের দর্শকরা বাসে উঠে সাধারণত টিকিট কাটে না। এই অভিযোগ কিংবা অজুহাতে সরকার যখন দর্শকদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করছে না তখন এগিয়ে এলেন আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্ত। সরকার বাস চালাল। দর্শকদের জন্য যাবতীয় খরচ বহন করল আই এফ এ।

সল্টলেক স্টেডিয়ামে ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আয়োজন নিয়ে শুরু

থেকেই একটা অশান্তি ছিল। স্টেডিয়ামটা গড়ে উঠেছিল যতটা সরকারি খরচে তার চেয়ে অনেক বেশি সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যে। এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়ামের গড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর। স্টেডিয়াম তৈরি হওয়ার পর তা নিয়ে নানারকম অভিযোগ উঠেছে বারবার। এমনকি অমল দত্তের মতো জ্ঞানী ফুটবল কোচ মাঠের ঢাল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ আই এফ এফ সচিব প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি নানা কারণে সল্টলেক স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল ম্যাচ দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ফুটবল ম্যাচ হবে ইডেনে কিংবা ময়দানের কোনো মাঠে। সুভাষ চক্রবর্তী একবার রেগে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন — সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যে এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের এই আবেগকে আহত করলে ময়দানে ধান চাষ করিয়ে দেব।

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা মহামেডানের ম্যাচ ঘিরে মাঝেমাঝেই উত্তেজিত দর্শক সমর্থকদের মধ্যে মারামারির জেরে ধর্মতলা, বিবাদী বাগ অঞ্চলে জনজীবন বিপর্যস্ত হত। সরকারও চাইছিল উত্তেজনার বারুদ আছে এমন ফুটবল ম্যাচ ময়দান থেকে সরিয়ে স্টেডিয়ামে নিয়ে যেতে। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে প্রদ্যুত দত্ত কংগ্রেসি হলেও রাজ্য সরকারের এই ভাবনাকে যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। তাই তিনিও ময়দান থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রদ্যুত দত্ত ধীরে ধীরে খেলার জগতে সব বয়সের মানুষের কাছেই প্রদ্যুতদা হয়ে উঠেছিলেন।

প্রদ্যুত দত্তর বাবা হরিপদ দত্ত-র কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি বাড়ি ছিল বলে শুনেছি। এখন গোটা ভারতে কারিগরি শিক্ষার খুব কদর। অথচ সদ্য স্বাধীন ভারতে জর্জ টেলিগ্রাফের মতো কারিগরি শিক্ষার পথিকৃৎ সংগঠনের কর্ণধার ছিলেন এই হরিপদ দত্ত। শিক্ষার একটা অংশ খেলাধুলো। সেটা মনে করতেন বলেই হরিপদ দত্ত জর্জ টেলিগ্রাফের মতো খেলার ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়। ময়দানে তিন বড় ক্লাবকে খেলার মাঠে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তিন বড় ক্লাবকে যে কোনও সময় রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত এই জর্জ টেলিগ্রাফ। তারা কিন্তু বাংলার গ্রাম থেকে ময়দানে খেলোয়াড় তুলে আনত। খেলার মাঠের নিয়ন্ত্রণ তিন বড় ক্লাবের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার যে আন্দোলন হরিপদ দত্ত শুরু করেছিলেন সার্থক উত্তরসূরি হিসেবে সেই কাজ পরবর্তীকালে করেছেন তার দুই পুত্র বিশ্বনাথ দত্ত ও প্রদ্যুত দত্ত।

অথচ প্রদ্যুতদা ছিলেন এক পায়ের খেলোয়াড়। জগতে যে কোনও ধরনের কর্মকাণ্ডে সাফল্য পেতে গেলে দরকার সুস্থ সবল শরীর। সুস্থ সুগভীর মন ও দৃঢ় মানসিকতা। দীর্ঘদেহী প্রদ্যুতদার সবই ছিল – একটা পা ছাড়া। সেটা ট্রাম লাইনে

কাটা পড়েছিল। নিবিড় ঘনিষ্ঠতার জন্য তাঁর কাছে সেই দুর্ঘটনার গল্প শুনেছি। ছেলেবেলায় প্রচণ্ড ডানপিটে ও ডাকাবুকো ছিলেন। সব ধরনের খেলাধুলোয় দারুণ আগ্রহ। ভাইবোন মিলে বড় সংসার। দুরন্ত বলেই প্রদ্যুতকে মা চোখে চোখে রাখতেন। দুপুরে শোওয়ার সময় কাছে নিয়ে ঘুমোতেন। মা ঘুমোলে প্রদ্যুত মাঝে মধ্যেই চুপি চুপি পালিয়ে যেতেন। পরে ধরা পড়ায় বাবার কাছে কঠোর শাসনের হাত থেকে বাঁচাতেন সেই মা-ই।

এই আখ্যানের শুরু করেছিলাম নেহরু গোল্ড কাপ প্রসঙ্গ দিয়ে। আগে সেই প্রসঙ্গটা শেষ করি। কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসতেন। যা কেউ ভাবত না। সেইরকম একটি ভাবনার হাত ধরে অনেকটা পথ যেতে ভালোবাসতেন। তখন দার্জিলিং পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ঘিরে এমন অশান্ত পরিবেশ যে সাধারণ পর্যটক তো দূরের কথা জরুরি কাজ না থাকলে কেউ উত্তরবঙ্গের দিকে পা বাড়াতেন না।

সেদিন রবিবার, সংবাদ মাধ্যমের অফিসগুলোতে কাজের চাপ এমনিতে কম। সাধারণত সিনিয়রদের ছুটি থাকে। এরকম একটা দিনে রবিবার বিকেলে কালীঘাটে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। খবর বিশেষ থাকার কথা নয়। তবু আড্ডার ফাঁকে যদি দু-চার লাইন কিছু পাওয়া যায়। তখন আমি ক্রীড়া সাংবাদিক। তাঁর স্নেহধন্য একজন। 'আপনজন' থেকে চপ-কাটলেট এসেছে। চা ও ভাজা সহযোগে আড্ডা চলছে। তখনও মাঠের বড়সড় কোনও কর্তা আসেনি। ভবানীপুর ইলিসিয়াম ক্লাবের কৃষ্ণেন্দু রায় ছাড়া। প্রদ্যুত দত্ত হঠাৎ বললেন, একটা ভালো খবর লিখবি? সেই খবরে কিন্তু সরাসরি ঘটনা লিখতে হবে। কোথাও সম্ভবত কিংবা জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকবে না। রাজি হলাম। বললেন এ বারের নেহরু গোল্ড কাপ শিলিগুড়িতে হবে। আমি কেন কৃষ্ণেন্দু রায়ও শুনে থ। বললেন যা বলছি সেটা হবেই। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জ্যোতি বসুর সঙ্গেই কথা হয়েছে। এখন ওখানে যা অবস্থা তাতে এরকম একটা আসর বসাতে পারলে অশান্ত পরিবেশও অনেকটা শান্ত হবে। তখনও পর্যন্ত ক্রিকেট নয় ফুটবলই গোটা পূর্ব ভারতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা। বললেন দেরি করিস না, সোমবারের কাগজেই খবরটা ধরানো চাই।

আজকালে সিনিয়ারদের মধ্যে সরোজ চক্রবর্তী ও রতন ভট্টাচার্য শুনেই হাসতে লাগল। বলল বোকা পেয়ে একটা বড়সড় গুল মেরেছে। এসব করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে মাঝখান থেকে আমাদের ব্যবহার করছে। ধীমান দত্ত সব শুনে বলল না খবরটা বেশ ভালো। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার প্রশ্নে নেহরু গোল্ড কাপ শিলিগুড়িতে হবে কি না সেটা পরের প্রশ্ন। ধীমানের চেষ্টায় খবরটা বেরোল। ধীমান বারবার বলল অরূপকে প্রদ্যুতদা বাজে খবর দেবেন না। তা সত্ত্বেও প্রথম পাতার এক্সক্লুসিভ খবরটা খেলার পাতায় ছোট করে ধরানো হল। এমনকি

সাংবাদিকের নামও দেওয়া হল না। খবরের কাগজের পরিভাষায় যাকে বলে 'বাইলাইন'। সেজন্য পরদিন প্রদ্যুতদাও সাধুবাদ জানিয়ে ছিলেন। সেই সোমবার থেকেই মহাকরণে ঘনঘন মিটিং। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের দুই কর্তা দেবীপ্রসাদ মহাপাত্র এবং আর কে হান্ডার সঙ্গে প্রদ্যুতদার ঘন ঘন বৈঠক। তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী প্রদ্যুত দত্তকে যতটা সহযোগিতা করলেন ততটাই অসহযোগিতা এসেছিল পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। শিলিগুড়িতে নেহরু গোল্ড কাপ হল। পাহাড়ে শান্তির পরিবেশ ফেরাতে রাজ্য সরকারের সুবিধা হল। কিন্তু প্রদ্যুতদার বদনাম হল আই এফ এ-কে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য।

যেটা বলছিলাম বাংলার খেলাধুলো মানেই কলকাতা কেন্দ্রিক কিছু উদ্যোগ। এই চিরাচরিত ভাবনাকে ভেঙে প্রদ্যুতদাই নতুন দিগন্ত খুলেছিলেন। এমনকি কলকাতার বাইরে বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনায় শিল্ড কিংবা লিগের খেলার উদ্যোগও তিনিই প্রথম নিয়েছিলেন।

বাংলায় চুনী গোস্বামী থেকে শুরু করে শিশির ঘোষ সবাই আন্ডার হাইট টুর্নামেন্ট খেলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত অখ্যাত ফুটবল পাগল, ঘরছাড়া একধরনের মানুষের চেষ্টায়। মর্নিংস্টার, পাইওনিয়ার, ত্রিশঙ্কু— এরকম আন্ডার হাইট টিমের প্রসঙ্গ নিয়ে আড্ডা হত। একদিন সেরকম এক আড্ডায় বললেন – এই নার্সারি ক্লাবগুলোকে নিয়ে একটা লিগ শুরু করব। করলেনও। কিন্তু নার্সারির নামে বিভিন্ন এলাকার ক্ষমতাশালী লোকেরা ময়দানে এনট্রি নিল। সেটা তিনি আটকাতে পারলেন না। অখ্যাত ফুটবল পাগলদের কিছুটা সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করলেন। একদিন আমাকে ডেকে বেহালার অমিয় ঘোষের খোঁজ নিতে বললেন। আমার কাছেই অমিয় ঘোষ সম্পর্কে শুনেছিলেন। এই ধরনের মানুষ যাদের হাতে যুগ যুগ ধরে বিনা খরচে শিশু প্রতিভা লালিত হয়েছে, ভবিষ্যৎ তারকার জন্ম হয়েছে, এমন মানুষদের কিছুটা স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। সেবারই বাংলার সাব-জুনিয়ার দলে কোচ হলেন – বিভু চক্রবর্তী, সহকারী অমিয় ঘোষ। পরে এই অমিয় ঘোষকেই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল তাদের সাব-জুনিয়ার দল তৈরির জন্য ডেকে নেয়।

বাংলার ফুটবলে তখন একচেটিয়া দুই কোচের দাপট – অমল দত্ত ও পি কে ব্যানার্জি। আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্ত ঘরোয়া আড্ডায় নতুন কোচের কথা বলতেন। তাঁর মতে, ক্লাব ফুটবলে এই দুই কোচ থাকতে থাকতে এদের মত সাহসী, বেপরোয়া, জ্ঞানী কোনও ফুটবল কোচকে তুলে আনা দরকার। ক্লাবগুলো সমর্থকদের চাপে সেরকম নতুন কাউকে জায়গা করে দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আই এফ এ-র এগিয়ে আসা উচিত।

সুভাষ ভৌমিক তখন ফুটবল নিয়ে আজকালের পাতায় দারুণ লিখছেন। এমনকি বহুবারই ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ম্যাচের আগে সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে

যা লিখছেন সেটাই মিলে যাচ্ছে। কালীঘাট মন্দিরের কাছে খাঁচায় টিয়াপাখি নিয়ে একটা লোক বসে থাকত। খাঁচার সামনে অনেকগুলো খাম সাজানো। কেউ পয়সা দিয়ে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে খাঁচায় মালিকের ধাক্কা অনুসারে পাখিটা বেরিয়ে আসত। ঠোঁটে একটা খাম তুলে নিয়ে মালিকের হাতে তুলে দিত। খামের ভিতরে কাগজে লেখা কথাগুলো শুনে ভাগ্যান্বেষী মন্তব্য করত অনেক কিছুই মিলে যাচ্ছে। প্রদ্যুৎ দত্ত বলতেন — ভৌমিক অনেকটা ওই টিয়া পাখির মতো। কতদিন দেখেছি অপূর্ব মিত্র রোডের ফ্ল্যাটে সুভাষ ভৌমিককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানতে চাইছেন পি কে আর অমল দত্তের মধ্যে কার কী গুণ কী দোষ। এক্ষেত্রে সুভাষ ভৌমিক নিজে কোচ হলে কী করতেন? আসলে প্রদ্যুতদা সুভাষ ভৌমিককে বাংলার কোচ করার জন্য বাজিয়ে নিচ্ছেন।

অনেক দিন পর সেবার বাংলায়, কলকাতায় সন্তোষ ট্রফির আসর বসল। সুভাষ ভৌমিককে কোচ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লেন প্রদ্যুৎ দত্ত। তখন নিয়ম হয়ে গিয়েছে কোচ হতে গেলে এন আই এস ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সুভাষ ভৌমিক-এর সেটা নেই। সেই ডিগ্রির অধিকারী হতে সুভাষ ভৌমিকের যথেষ্ট অনীহা আছে। সমস্যার সমাধানে প্রদ্যুতদা একটা পথ বের করলেন। কোচ নিমাই গোস্বামী, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর করলেন অরুণ সিন্‌হা কে। ম্যানেজার সুভাষ ভৌমিক। বাস্তবে দেখা গেল মাঠের ধারে চেয়ার নিয়ে বসে আছেন অরুণ সিনহা। কোচের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করছেন সুভাষ ভৌমিক। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সেবার বাংলার অধিনায়ক। তাঁর খেলা কোচের পছন্দ হচ্ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিশ্বজিৎকে বসিয়ে দিয়ে অশান্তিতে জড়িয়ে ছিলেন। সেটা সম্ভব হয়েছিল সুভাষ ভৌমিকের যাবতীয় কাজে প্রদ্যুত দত্তের পূর্ণ সমর্থন ছিল। কেরলের পালাকাড়ে সন্তোষ ট্রফির আসর। জাতীয় ফুটবলে তখন বাইশ বছরের কম বয়সি ফুটবলারদের খেলানোর নিয়ম চালু হয়েছে। বাংলা দলে বয়স লুকিয়ে কুলজিৎ সিংকে খেলানো হয়েছিল। কলকাতা থেকে প্রদ্যুতদার নির্দেশ গিয়েছিল — কুলজিতের বয়সের নথিতে গোলমাল থাকলে খেলাবেন না। কেরল দলে সেবারই আই এম বিজয়নের উত্থান। কেরলে দেখেছি সুভাষ ভৌমিকের খুব ভক্ত আছে। অনেক পুরনো খেলোয়াড় তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করছিল। কর্মজীবনে সুভাষ ভৌমিক তখন জর্জ টেলিগ্রাফের অতি উচ্চপদস্থ কর্মী। ক্লাব ফুটবলে সুভাষ ভৌমিকের সাফল্য দেখে খুবই আনন্দ পেতেন প্রদ্যুত দত্ত।

ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর সুভাষ ভৌমিক তখন সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত। প্রদ্যুতদা সুভাষ ভৌমিককে জর্জের কোচ করলেন। জর্জ ইনস্টিটিউটের উচ্চপদে নিয়োগ করলেন। সুভাষ ভৌমিককে নতুন জীবন পেতে সাহায্য করেছিলেন। বাংলার কোচ হিসেবে সাফল্যের পর কলকাতার ফুটবল মরশুম

এমন একটা সময়ে যে প্রখর গ্রীষ্ম কিংবা অতি বর্ষণকে এড়িয়ে চলা যায় না। খবরের কাগজে প্রখর দাবদাহে ময়দানি ফুটবলকে সমালোচনা করে নানারকম লেখা বের হত। প্রদ্যুতদা নিজে ব্যাপারটা উপলব্ধি করার জন্য মাঠে যেতেন। বেশিরভাগ সময় কিছুদিনের জন্য খেলা বন্ধ রেখেছিলেন। সাংবাদিকদের শুধু বলতেন প্রচণ্ড গরমে ক্রিকেট ম্যাচ যখন হয় তখন কি তোমাদের কলমের ধার পড়ে যায়? আবার অতি বর্ষণে মাঠ যখন থকথকে কাদায় খাটালের চেহারা নিয়েছে কৃত্রিম পায়েই ভর দিয়েই ছাতা মাথায় কিছুটা দূর থেকেই মাঠের অবস্থা দেখে প্রতিযোগিতায় সাময়িক বিরতি দিতেন।

কলকাতায় তিন প্রধান ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান চিরকালই আই এফ এ-র যাবতীয় নিয়মকানুনের বাইরে নানারকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল। ম্যাচের ফলাফল তাদের অনুকূলে না গেলেই নানা অছিলায় তিন বড় দলের খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে এমন আচরণ করতেন যে উত্তেজিত দলীয় সমর্থকেরা উদ্দাম উল্লাসে মাঠে ঢুকে পড়ত। রেফারিকে মারত। মাঠের গণ্ডগোল শহরে ছড়িয়ে দিত। পুলিশ প্রশাসনও তখন এই তিন দলের খেলোয়ার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতেন না। কারণ ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পেছনে আছে সমাজের কেষ্টবিষ্টুরা, মন্ত্রীসান্ত্রীরা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। মহামেডানের পেছনে আছে মাইনরিটির লাল চোখ।

প্রদ্যুত দত্ত বললেন – এসব চলবে না। নিয়মকানুন সবার জন্য সমান। সল্টলেক স্টেডিয়ামে মহামেডানের ম্যাচ। যতদূর মনে পড়ে রেফারি প্রদীপ নাগ মহামেডানের বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। চিবুজোর-সহ মহামেডানের একাধিক খেলোয়াড় প্রদীপ নাগকে আঘাত করে। মাঠের ধারে বসা মহামেডান কর্মকর্তাদের এক অংশ মাঠে ঢুকে পড়ে। সেদিন মাঠে আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্ত-সহ অনেক কর্তাই হাজির ছিলেন। গ্যালারিতে সমর্থকদের মধ্যে মারামারিতে বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হন। আই এফ এ মহামেডানের বিরুদ্ধে এমন শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের সুপার ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে নেমে যেতে হয়। এছাড়াও মহামেডানের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের আর্থিক জরিমানা হয়। এর ফলে গোটা ময়দানে এমন তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে লিগের খেলা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসান আই এফ এ সচিব প্রদ্যুত দত্ত-কে ডেকে মহামেডানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। প্রদ্যুত দত্ত রাজ্যপালকে বলেন – এটা একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। গভর্নিং বডির সভায় আলোচনা হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি মাইনরিটির অজুহাতে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলাকে আই এফ এ প্রশ্রয় দেবে না। তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী আই এফ এ সচিবকে বলেন — আপনারা এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে

পারেন না যাতে আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সচিব হিসাবে তিনি জবাব দেন— আইনশৃঙ্খলা দেখাটা রাজ্য প্রশাসনের কাজ। আই এফ এ খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্যই এই শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলে আই এফ এ অধিগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে বলে খেলার মাঠের অপরাধীকে আই এফ এ শাস্তি দেবে না একথা বলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার আই এফ এ-কে দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করাতে পারেনি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত খেলার মাঠে মহামেডানের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা প্ররোচনামূলক বিশৃঙ্খলা আচরণ করেনি।

কলকাতা ময়দানের একটা প্রচলিত মিথ – ইস্টবেঙ্গল কিংবা মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের কখনওই আই এফ এ কিংবা প্রশাসন কোনও কারণেই স্পর্শ করবে না। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের মারমুখী আচরণ পরস্পরকে আঘাত, প্রত্যাঘাত ঘিরে গ্যালারি বারবার তপ্ত হয়েছে। মানুষ মারা গেছে কিন্তু তাদের আচরণের বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। একবার তো ইডেন গার্ডেনে ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের ম্যাচে বিদেশ বসু ও দিলীপ পালিত পরস্পরকে এমন আঘাত করলেন যে গ্যালারিতে আগুন ধরে গেল। আঘাতে কিংবা ভিড়ের চাপে বেশ কয়েকজন মারাও গেলেন। প্রদ্যুত দত্ত ঠিকই ধরেছিলেন দু-দলের তারকা খেলোয়াড়রাই আগুন ধরায়। সুযোগ পেলে এদের কয়েকবার শাস্তি দিলে মাঠের আবহাওয়া বদলে যাবে। হয়েও ছিল তাই। সুব্রত ভট্টাচার্য, শিশির ঘোষ, আবদুল মজিদ, চিমা ওকেরির মতো খেলোয়াড়দের আর্থিক জরিমানা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাসন দিতেই বড় দলের আচরণও মাঠে বদলে গিয়েছিল।

খেলার মাঠের আরেক গভীর ক্ষত গট-অপ ম্যাচ। এই গট-আপ ম্যাচ নানাভাবে হয়ে আসছিল। মূলত তিন ভাগে (১) রেফারিকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করা (২) একটি দলের কর্তারা বিপক্ষের কয়েকজন খেলোয়াড়কে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করত (৩) একটি দল আরেকটি দলকে ম্যাচ ছেড়ে দিত। নানাভাবে প্রদ্যুত দত্ত এই ক্ষত সারাতে শুরু করেন। রেফারিদের মান বাড়িয়ে প্রথম ধাপের কাজটা সারেন। ফলে অপেক্ষাকৃত তরুণ রেফারিরা বড় ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পান। রেফারিদের রিপোর্টের ভিত্তিতে বড় দলের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেন। সংবাদ মাধ্যম ও অন্যান্য সূত্রে কোন দল কীভাবে ম্যাচ গট-আপ করবে তার আগাম খবর রাখতেন এবং সেই বুঝে ব্যবস্থা নিতেন। একবার তাঁর নিজের ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফ বি এন আর কে পয়েন্ট ছেড়ে দেয়। ম্যাচ রিপোর্ট করতে গিয়ে অন্তত এই প্রতিবেদকের সেটাই মনে হয়েছিল। পরদিন সাতসকালে ম্যাচ রিপোর্ট পড়ে আমার বাড়িতে ফোন করেন – সরাসরি জানতে চান মাঠে আমি নিজে ছিলাম কি না? সেদিনই বিকেলে জর্জের অন্যতম কর্তা বাচ্চুবাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বলতেন – ফুটবল

মাঠের নোংরা দূর করতে করতেই আমার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। ভালো খেলার আয়োজন হয়তো এ জীবনে করতে পারব না। শেষ দিকে তিনি ক্রিকেট মাঠের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। জগমোহন ডালমিয়াকে সরিয়ে নির্বাচনে তিনি সি এ বি দখল করার পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন। ঘুটি সাজাতে দিল্লি গেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া খেলার মাঠের দখলও যে নেওয়া যায় না ততদিনে তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। সন্তোষমোহন দেবকে সভাপতি ও নিজেকে সচিব পদে প্রার্থী করে এ আই এফ এফ দখল করতে গেছিলেন। রাজীব গান্ধির হস্তক্ষেপে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান সন্তোষমোহন দেব। একা কুম্ভের মতো লড়াই করে নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। অসুস্থ শরীরে দিল্লি থেকে টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন — এই নির্বাচনে ধরেই নে সি এ বি তে ডালমিয়াকে সরিয়ে আমরাই ক্ষমতায় আসছি। ততদিনে মমতা ব্যানার্জি ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরত্বপূর্ণ নাম। যখন তখন প্রদ্যুতদার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। একবার তো প্রদ্যুতদার বাড়িতে বসে থাকার সময়েই খবর এল তিনি আসছেন। মমতা একবার যাদবপুর কেন্দ্রে প্রদ্যুত দত্তকে দাঁড় করানোর জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির বিরোধিতার জন্য তিনি টিকিট পাননি। তিনি বেঁচে থাকলে আজ মমতা ব্যানার্জি অত্যন্ত সম্মানজনক জায়গায় তুলে ধরতেন। একদিন সকালে মোহনবাগান মাঠ থেকে অমিয় ঘোষের ফোন পেলাম, প্রদ্যুতদা নেই। কলকাতায় তাঁর মরদেহের উপর অনেক মালার ভিড়ে এক আশ্চর্য শ্রদ্ধাকে উঁকি মারতে দেখেছিলাম। একদা নামী খেলোয়াড় ও কোচ জহর দাস একটা সাদা-কালো ফুটবল তার বুকের ওপর রেখে প্রণাম করলেন।

যথার্থই একজন টিমম্যান

শতদল গুপ্ত
(প্রাক্তন কর্মকর্তা, জর্জ টেলিগ্রাফ)

১৯৭৫ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন অজয় শ্রীমানী, নিশীথ ঘোষের দল। আমরা সেই নির্বাচনে শ্রীমানীদার সঙ্গে ছিলাম। নির্বাচনের আগেই বিশুদা আমাদের আগাম সতর্ক করে বলেছিলেন, 'তোমরা জিততে পারবে না।' পরবর্তীতে বিশুদার কথাই মিলে গিয়েছিল। ময়দানে আমার পরিচিতি বিশুদা-র (বিশ্বনাথ দত্ত) অনুগামী হিসাবে। জীবনদা (চক্রবর্তী), পল্টুদা (দাস) বিশুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জর্জ টেলিগ্রাফের তখন (১৯৭৫) সচিব প্রদ্যুৎদা। ক্লাব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পাশে থাকার জন্য কিছু কর্মী দরকার ছিল, বিশেষ করে তখন যাঁরা ময়দানে আসতেন। বিশুদা বিচক্ষণ প্রশাসক। এ ব্যাপারে তাঁর নজর পড়ল আমাদের দিকে। আমরা অর্থে আমি, পুঁটে, বাবলু। পরবর্তীতে আদিত্য। ১৯৭৫ সাল থেকেই জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদ্যুতদার সঙ্গে পথ চলা শুরু হল আমাদের। প্রথম দেখার দিনটা আজও চোখের সামনে ভাসে। সেদিন তিনি আসবেন বলে আমরাও বিকেলে জর্জ তাঁবুতে হাজির ছিলাম। দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে দীর্ঘকায় একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন জর্জ তাঁবুর দিকে। তাঁবুতে প্রবেশপথের গেটটা একটু নিচু বলে মাথা নিচু করেই তিনি ঢুকলেন। লক্ষ করলাম একটু টেনে হাঁটছেন। পুঁটেকে বললাম হাঁটাটা কেমন একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! পুঁটেও আমার কথায় সায় দিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম শিয়ালদার কাছে ট্রাম লাইনে পড়ে গিয়ে তাঁর একটা পা জখম হওয়ার জন্য বাদ দিতে হয়েছিল। পরে পুণেতে গিয়ে কাঠের পা লাগানো হলেও কৃত্রিম পায়ে হাঁটতে একটু জড়তা থাকতই।

এতবড় একটা দুর্ঘটনার পরেও প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলেন প্রদ্যুতদা। একটানা ২০ বছর জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব সামলেছেন। ৯ বছর আই এফ এ-তে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। এতটাই মনের জোর, দৃঢ়তা ছিল তাঁর মধ্যে।

বিকেলে প্রায় প্রতিদিনই ক্লাবে আসতেন। সব সময়ই হাসিঠাট্টা করে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। আমাদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ক্যারম খেলতেন। সকালে ভবানীপুর মাঠে প্রায়ই ক্লাবের প্র্যাকটিসেও হাজির থাকতেন। জর্জ তাঁবু সকালে-বিকালে গমগম করত। সেই সময়ে পয়লা বৈশাখ জর্জের বারপূজোতে বিশিষ্টরা হাজির থাকতেন।

প্রদ্যুতদার বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি আড়ালে থেকে ক্লাব চালাতেন না। আমাদের সঙ্গে তিনি সামনে থেকেই পরিচালনা করতেন। দলগঠনের সময় সব সময়ই সঙ্গে থাকতেন। ফুটবলারদের বাড়িতে হাজির হতেন। নিজেই কথা বলতেন।

কোনও ফুটবলার ভালো খেলছে খবর পেলে সেই ফুটবলারের খেলা দেখতে হাজির হতেন। তারপর পছন্দ হলে তাকে টার্গেট করতেন। সেই ফুটবলারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দিতেন। যেমন মহম্মদ মুকিম।

তিনি ছিলেন যথার্থই একজন টিমম্যান। বাইরে যখন ক্লাব খেলতে যেত, তিনি সঙ্গে যেতেন। দলগড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে থাকলেও মাঠে প্রথম একাদশ বাছার ক্ষেত্রে কোচের উপর নিজের পছন্দ বা অপছন্দ চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর সময়ে ল্যাংচা মিত্র থেকে শান্ত মিত্র, সুভাষ ভৌমিক বিভিন্ন সময়ে দলের দায়িত্ব সামলেছেন। কখনও-সখনও হয়তো দু-একটা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব দিতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল কোচের। পাশাপাশি ফুটবলারদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যাপারে যোগ্যতা অনুযায়ী দাবি মেটাতেন। কখনও বঞ্চিত করতেন না। কয়েকজন ফুটবলার যেমন মহম্মদ মুকিম, বিপ্লব মজুমদারের সঙ্গে কখনও আর্থিক চুক্তি হত না। কারণ, ওরা জানতেন প্রদ্যুতদা ঠকাবেন না।

১৯৭৬ সালে কলকাতা লিগে এবং আই এফ এ শিল্ডে মোহনবাগানের বিপক্ষে উজ্জীবিত ফুটবল খেলেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। দুটি ক্ষেত্রেই প্রেরণাদাতা ছিলেন প্রদ্যুতদা। গোটা দলটাই দু-দিন ছিল টগবগে মেজাজে। ১৯৭৮ সালে সব ম্যাচে জিতে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি মোহনবাগান। শেষ ম্যাচে রুখে দাঁড়িয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ।

১৯৭৯ সালে ৩–৩ গোলে ম্যাচ অমীমাংসিত ছিল ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। বেশ কয়েকটি ট্রফি-ও জিতেছিলাম ১৯৭৭ থেকে। দার্জিলিং গোল্ড কাপ, পদ্মজং ট্রফি, সিকিম গভর্নর্স কাপ। ১৯৮৪ সালে সঞ্জয় গান্ধি গোল্ড কাপে রানার্স হয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল।

প্রদ্যুতদা সচিব থাকাকালীন ১৯৮০ সালে কলকাতা ক্রিকেট লিগে প্রথম ডিভিসনে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। অর্থাৎ ক্রিকেটেও নজর থাকত তাঁর। তবে প্রথম পছন্দ নিঃসন্দেহে ছিল ফুটবল।

বদলে গেল শিলিগুড়ি

বিশ্বজিৎ দাস

(ক্রীড়া সংগঠক, শিলিগুড়ি)

শিলিগুড়িতে ৩৪ বছর আগে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে এখন যদি কেউ আসেন তাহলে দেখবেন ঝকঝকে একটা শহর। শহর জুড়ে বিশাল বিশাল সব অট্টালিকা। এককথায় এখনকার শিলিগুড়ি দেখলে চমকে যাবেন। পাশাপাশি মুগ্ধ হবেন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম দেখে। নিঃসন্দেহে রাজ্যের এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম সেটি। আগেও একটা ছোট স্টেডিয়াম ছিল। মাঠের পশ্চিম দিকে ছোট কংক্রিট গ্যালারি। তখন এই ক্রীড়াঙ্গনের নাম ছিল তিলক ময়দান। পশ্চিম দিকে একফালি জায়গায় গ্যালারি। বাকি তিন দিকে ছিল টিনের ব্যারিকেড।

১৯৮৮ সালে রাতারাতি তিলক ময়দানের খোলনলচে বদলে গেল। তিলক ময়দানে আন্তর্জাতিক মানের একটা স্টেডিয়াম, সঙ্গে ঝকঝকে ড্রেসিংরুম সব কিছুই তৈরি হয়ে গেল। এর নেপথ্যে যে মানুষটির নাম সবার আগে বলতে হবে তিনি হলেন আই এফ এ-র তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত কুমার দত্ত। কারণ তিনিই এমন একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে একটা আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম করতেই হত রাজ্য সরকারকে। তবে হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রাজ্য সরকার সেই সময় যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে এই মাঠ এবং স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। রাজ্য সরকার পরে নিশ্চয়ই শিলিগুড়িতে স্টেডিয়াম নির্মাণ করত। তবে মানতেই হবে প্রদ্যুতদা যদি নেহরু আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য শিলিগুড়িকে নির্বাচন না করতেন তাহলে এত তাড়াতাড়ি তিলক ময়দান কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে পরিণত হত না।

শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ আয়োজনের স্থান হিসাবে নির্বাচনের পর থেকেই তিনি ছুটে এসেছেন এই শহরে। কাজের তদারকির পাশাপাশি কীভাবে প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করতেন।

এরকম বৃহৎ একটা কর্মযজ্ঞকে সফল করতে গেলে সবার আগে জরুরি অর্থ। এই দিকটা মাথায় রেখে তিনি এখানকার সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংস্থা FOCIN-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। সেইসময় শিলিগুড়ির চেম্বার অফ কমার্স অর্থাৎ FOCIN-এর তরফ থেকে আমরা ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম সঙ্গে ৮ লাখ টাকার টিকিটও কিনেছিলাম। ঘটনা হল চেম্বার অফ কমার্স অর্থাৎ FOCIN-এর

সচিব হিসাবে তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাদের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নন্দ দা (নন্দভূষণ দাঁ) বরাবরই বলতেন ব্যবসায়ীরা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু খেলাকে সফল করার দায়িত্ব ক্রীড়া সংগঠকদের। কথাটা ঠিক। তবু এতবড় একটা মহাযজ্ঞ সফল করার জন্য অর্থদাতাদেরও একটা ভূমিকা পালন করতেই হয়। সফল না হলে আর্থিক দিক থেকে সহযোগিতার ব্যাপারটাও যে মূল্যহীন হয়ে যাবে। তাই FOCIN-এর সচিব হিসাবে আমারও একটা দায়িত্ব পালন করতে হত। সেজন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হত। প্রদ্যুৎদাও প্রতিদিন ডেকে পাঠাতেন। সেই সূত্রে মানুষটিকে খুব কাছে থেকে বোঝার সুযোগ পেয়েছি। তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্ববান। খেলা আয়োজন করতে গিয়ে অনেকরকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও লক্ষে তিনি ছিলেন অবিচল। অসম্ভব জেদি, কর্মঠ। কোনরকম অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। সেই সুবাদে সাফল্যও পেয়েছেন। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ নিশ্চয়ই ১৯৮৮ সালের নেহরু গোল্ড কাপের কথা ভুলতে পারবেন না। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম নির্মাণই নয়, পাশাপাশি গোটা শহরের চেহারাটাই বদলে গেল জওহরলাল নেহরু গোল্ড কাপকে কেন্দ্র করে। আলোয় ঝলমল হয়ে উঠল গোটা শহর। বাস টার্মিনাল তৈরি হল, শহরের সদর রাস্তা হিলকার্ট রোডের পাশাপাশি তৈরি হল তথ্য কেন্দ্র। সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা ছিল শিলিগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন রেল গেট। প্রায় সবসময়ই যানজটের জন্য সমস্যা হত। সেখানে রাস্তাও চওড়া হওয়াতে সমস্যা মিটে গিয়েছিল। সবমিলিয়ে স্টেডিয়াম তথা গোটা শহরের উন্নয়নের নেপথ্যে বিশাল অবদান ছিল প্রদ্যুতদার।

তিনি আজ আর আমাদের কাছে নেই। প্রায় ২৯ বছর আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তবু মানুষটিকে যেন সবসময়ই দেখতে পাই। আজও চোখে ভাসে যেদিন প্রথম ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনে’র শীর্ষ কর্তা ক্ষীরোদ করকে সঙ্গে নিয়ে এই শহরে পা রেখেছিলেন। ভুলতে পারি না নেহরু গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের সেই দিনগুলি।

নেপথ্যের নায়ক

পরিতোষ ভৌমিক

(প্রাক্তন সচিব, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ)

আমার বাড়ি শিলিগুড়িতে। জন্মলগ্ন থেকেই আমরা এই শহরের বাসিন্দা। এই শহরের অতীত আমাদের চোখের সামনে এখনও ভাসে। সেই শিলিগুড়ির চেহারা এখন আমূল বদলে গেছে। আমি বলছি ৩৫ বছর আগের শিলিগুড়ির কথা। সেদিনের শিলিগুড়ির সঙ্গে আজকের এই শহরের কোনও মিল নেই। শিলিগুড়ি স্টেশনের রেলগেট থেকে হিলকার্ট রোড বিশাল রাস্তা। স্টেডিয়াম, বাস টার্মিনাল সব কিছুই এখন ভারতের যে কোনও শহরের সঙ্গে তুলনীয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই তা হল, শহরের আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের একটা বড় ভূমিকা ছিল। শহরের ইতিহাস সে কথাই বলবে। তাই বলে কি নেপথ্যের নায়কটির নাম ভোলা যাবে? এ বারে সেই মানুষটির কথা বলছি।

তিনি আই এফ এ-র তৎকালীন সচিব প্রদ্যুত কুমার দত্ত। আমাদের সবার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা।

আমি তখন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব। তাই প্রথম যখন শুনতে পেলাম যে, শিলিগুড়িতে জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম, তার আগে এই শহরের তিলক ময়দানে আই এফ এ শিল্ডের খেলা মাঝেমধ্যে হয়েছে। ওই পর্যন্তই। সেখানে একলাফে আন্তর্জাতিক আসর! কী করে সম্ভব হবে? সেরকম পরিকাঠামো এখানে ছিল না। প্রতিযোগী দলগুলোর প্র্যাকটিসের জন্যই তো দরকার ৮/১০টি মাঠ। আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম। বিমান বন্দর। এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরকে বেছে নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, স্থান নির্বাচন ঘোষণা করেই তিনি বসে থাকেননি। প্রতিযোগিতা শুরুর অনেক আগে থেকেই সবদিক তৈরি করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। খেলার মাঠ থেকে রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর – সর্বত্র চষে বেরিয়েছেন। পাশাপাশি শহরের দুই বিলাসবহুল হোটেল সিনক্লিয়ার এবং মৈনাক হোটেলে –

সুইমিং পুল তৈরি হয়েছিল প্রদ্যুতদার বিশেষ উদ্যোগে। বিদেশি দলগুলো যেখানে খেলতে আসবে সেখানে আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল অত্যন্ত জরুরি। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটাও তিনি মাথায় রেখেছেন। প্রতিযোগিতার আয়োজন যাতে সবদিক থেকে সফল হয় এজন্য এক বছরেরও বেশি সময় তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন। তার সুফলও পেয়েছেন। শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ আয়োজনের জন্য যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। খেলা উপলক্ষে প্রথম যেদিন শিলিগুড়িতে পা রাখলেন, সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে শহরের অনেক গণ্যমান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি হাজির ছিলেন। কিন্তু দেখলাম তিনি সোজা এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। তারপর আমার ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসলেন। সেই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা শুরু হল। সেটা বজায় ছিল তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

অনেক রকম প্রতিকূলতা, বাধা বিপত্তি কাটিয়ে নেহরু কাপের খেলা শুরু হল। মাঠে ঢোকার সময় প্রতিদিনই আমাকে বলতেন তাঁর দিকে নজর রাখতে। আর হাফ টাইমের পর চোখের ইশারায় আমাকে জানাতেন যে এ বারে তিনি উঠবেন। দু-জনই তখন বেরিয়ে আসতাম। গাড়িতে বসার পর যখন কোথায় যাবেন জানতে চাইতাম, প্রতিদিনই একটা কথাই বলতেন, যেদিকে তোমার মন চাইবে সেদিকেই চলো। সেই সময় ৭০/৮০ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালাতাম। গাড়িতে বসেই নাক ডেকে ঘুম লাগাতেন। আসলে দিবা-রাত্র এই প্রতিযোগিতাকে সফল করার জন্য টেনশনে মানসিক দিক থেকে ভীষণ ক্লান্ত থাকতেন। গাড়িতে ওঠার পর কোনও চাপ থাকত না বলে আর বসে থাকতে পারতেন না। ঘুম ভাঙার পর যখন শুনতেন ৮০/১০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছি তখন গাড়ি ঘোরাতে বলতেন। ঘুম ভাঙতেই বলতেন পাঁচ বছর আয়ু বেড়ে গেল। বলেছিলেন, এই বিশ্রামটুকু সবসময়ই দরকার। তাতে শরীর চনমনে থাকে।

এরকমই একদিন মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়েছি। সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি বিজিত গুহ। একটা পেট্রল পাম্পে তেল ভরার জন্য গাড়ি থেকে নেমেছি। গাড়ি থেকে নেমে বিজিতদার কাছে ১০টা 'গোল্ডেন কার্ড' চাইলেন। যখন বুঝলাম কার্ডগুলো আমার জন্য চেয়েছেন। বলেছিলাম, আমার কোনও কার্ড লাগবে না। তখন ধমকের সুরে তাঁর যুক্তি ছিল, 'তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকছ, অথচ তোমার কাছে কার্ড থাকবে না! বন্ধু-বান্ধবরা শুনলে কী ভাববে?' এরকমই মাঝেমধ্যে স্নেহমিশ্রিত ধমক দিতেন।

প্রতিদিনই খেলার পরে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন ফুরফুরে মেজাজে। তখন

একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হত। খাবারের টেবিলে হাসি, ঠাট্টা, মজা সবকিছুই চলত।

কলকাতায় গেলে সদানন্দ রোডের পাশে ৪বি, অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়িতে যেতে ভুল হত না। সেখানেও রসালো সব খাবার থাকত। ওঠার সময়ই বলতেন, 'টিফিন করে যাও।' এভাবে আরও কিছু সময় আটকে রাখতেন। প্রায় প্রতিদিনই অনেক খ্যাতনামা ফুটবলার আসতেন। সবাইকে পাশে বসিয়ে চলত চুটিয়ে আড্ডা। সেই আড্ডার আসর ছেড়ে ওঠা যেত না।

প্রায় ২৯ বছর হয়ে গেল। সেই জমকালো আড্ডাটা ভুলতে পারিনি।

রাজীব গান্ধি কাল হয়েছিলেন এআইএফ সচিব হওয়ার পথে

পার্থসারথি ঘোষ
(ক্রীড়া সাংবাদিক)

সারা দেশের ফুটবলে একটা রাজ্য সংস্থার সচিব হয়েও প্রদ্যুত দত্ত ছিলেন একটা তুফান, একটা বিপ্লব, একটা নতুন বাতাস। আই এফ এ-র চেয়ারে তাঁর আগে বসেছেন বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্ব। যেমন – বিশ্বনাথ দত্ত, অশোক ঘোষ, অশোক মিত্র বা তাঁদেরও আগে আই এফ এ-তে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন বেচু দত্ত রায় প্রমুখ। প্রদ্যুত দত্তকে বাদ দিলে অন্য প্রশাসকদের সময় আই এফ এ ছিল কার্যত উপগ্রহ (স্যাটেলাইট)। কিন্তু গ্রহ হয়ে বিরাজ করত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান প্রভৃতি তারকাখচিত ফুটবলার দলগুলি বা তাদের কর্মকর্তারা। যেমন – জ্যোতিষ গুহ, নৃপেন দাস, মোহনবাগানের শৈলেন মান্না, ধীরেন দে বা মহামেডান স্পোর্টিং-এর এরফান তাহের বা মীর মহম্মদ ওমর প্রমুখ।

এমনকি ক্রিকেট মাঠে তখন জ্বল জ্বল করছেন জগমোহন ডালমিয়া – বিশ্বনাথ দত্তরা। প্রদ্যুত দত্তের সবচেয়ে বড় কীর্তি তিনি আই এফ এ-কে স্যাটেলাইটের স্তর থেকে গ্রহ বা তারার স্তরে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের আলোয় আই এফ এ-কে চেনা যাবে – এই বদনাম থেকে তিনি বের করেন আই এফ এ-কে নিজস্ব পরিচয়ে পরিচিত হতে, পরিচালনা করতে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে চলার যোগ্য করে তুলেছিলেন রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে।

প্রদ্যুত দত্তের সময়ই আই এফ এ প্রকৃতপক্ষে এ আই এফ এফ-এর সমতুল্য মর্যাদায় স্বীকৃত হতে শুরু করে। যেমন ভোলা যাবে না ১৯৮৭ সালে এ আই এফ এফ ইলেকশনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিকে প্রদ্যুত দত্ত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব, অন্যদিকে রাজীব গান্ধি মন্ত্রিসভার আর এক সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি এবং অশোক ঘোষ। মুম্বইয়ের আরব সাগরের তীরে তাজ ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদের লড়াই হচ্ছে। নির্বাচন শুরুর আগেই প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল প্রদ্যুত দত্ত, শিবির জয়ী হয়ে সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ামক হতে চলেছে। বাজি ফাটানো এবং আবির খেলা শুরুর যখন অপেক্ষা অকস্মাৎ বজ্রপতন

ঘটল। জানা গেল, দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি সন্তোষমোহন দেবকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যাতে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। মহাভারতে কর্ণের রথের চাকা মেদিনীতে বসে যাওয়ার মতোই প্রদ্যুত দত্তের ভাগ্যের সেদিন একই পরিণতি হয়েছিল।

প্রদ্যুতবাবুর কর্মকালে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে অহরহই বিরোধ লেগে থাকত। বামফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীর চেষ্টা ছিল কীভাবে আই এফ এ-কে তার নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। প্রদ্যুতবাবুর সময়কালে সুভাষবাবুর সে ইচ্ছা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রদ্যুতবাবু ও সুভাষবাবুর মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে দৌত্যকার্য করেছিলেন কোনও এক বড় ক্লাবের শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা। ময়দানে তখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পল্টু দাস, মোহনবাগানের টুটু - অঞ্জন, আই এফ এ-তে প্রদ্যুত দত্ত, মহমেডান স্পোর্টিং-এ ওমর এবং মহাকরণে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী – এই ছয় রথীর সমন্বয়ে বাংলা এবং দেশের ফুটবল মঞ্চ সরগরম। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কোনও বড় ক্লাবের দাদাগিরির কাছে তিনি মাথা নোয়াননি। রাজত্বের শেষপর্বে অকৃত্রিম বন্ধু ইস্টবেঙ্গলের পল্টু দাসের সঙ্গেও তার প্রবল মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। ওমর তখন সবুজ ময়দানের ত্রাস। সেই ওমরের মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আই এফ এ বেশ কিছুদিন সাসপেন্ড করে দিয়েছিল। মহমেডানকে সাসপেন্ড করলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, এই আশঙ্কায় রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাদের অনুরোধেও প্রদ্যুতদা মাথা নোয়াননি।

চিমা ওকোরি থেকে সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য – ফুটবলারদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন এবং আড়াল করতেন। কিন্তু ফুটবল খেলার নব্বই মিনিটে এরা যদি কোনও ফুটবল বিরোধী কাজ করতেন তাদের তিনি শাস্তি দিতে পিছপা হতেন না। আবার অজস্র ঘটনা আছে, সামান্য কারণে দোষ করেছেন ফুটবলার, তাকে তিনি বড় শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সবশেষে বলব, অসম্ভব ভালোবাসতেন সাংবাদিকদের। তিনি হিসাব রাখতেন কোনও একটি দৈনিক খবরের কাগজ যার স্থান একনম্বরে তাকে হয়তো একটা ‘স্কুপ’ দিলেন, হয়তো আরও পর পর তিনদিন তিনটে ‘স্কুপ’ তৈরি হল। তিনি কখনই সেগুলি বড় কাগজের সাংবাদিকদের দিতেন না। মাঝারি পর্যায়ের কাগজ বা কোনও উঠতি সাংবাদিক – তাদের মধ্যে সেগুলো ভাগ করে দিতেন যাতে তাদের কেরিয়ারের উন্নতি হয়। আই এফ এ-র গভর্নিং বডিতে তাঁর সময় যত বজ্রগম্ভীর আলোচনা হয়েছে। সঙ্গে রসনাতৃপ্তি (খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন) – সেখানেও তিনি এক নম্বর।

সময়টা ১৯৮৪, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সবে যাদবপুর

লোকসভা কেন্দ্র থেকে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে সারা দেশের বিস্ময় এবং চোখের মণি। প্রদ্যুত দত্ত তখনই টের পেয়ে ছিলেন — এ মেয়ে বাঘিনি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সাংসদ মমতা চলে আসতেন প্রদ্যুতবাবুর ৪বি, অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়ি এবং অফিসে। চলত ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা। আজ যদি প্রদ্যুত দত্ত বেঁচে থাকতেন কর্ণের মতো তাঁর রথের চাকা মাটিতে বসে যেত না। মমতা তাঁকে তুলে এনে বসাতেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির চেয়ারে। বাংলা তথা ভারতের ফুটবলের এই হতোদ্যম দশা আমাদের দেখতে হত না।

চিৎকার শুনে বউদি ছুটে এসেছিলেন

আলোকেশ কুন্ডু

(প্রদ্যুত দত্তর ভ্রাতৃসম)

১৯৮৩-৮৪ সালের ঘটনা। আমি তখন গগনদা (চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী)-র ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত। কলকাতা লিগে প্রবল বর্ষণে মহামেডান মাঠে আমাদের ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেই সময়ে আমাদের ক্লাব লিগ খেলার দিনে জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবু ব্যবহার করত। সেদিন খেলা থেকে যখন জর্জ তাঁবুতে গেলাম প্রদ্যুতদা অফিস ঘরে বসেছিলেন।

জর্জ ক্লাবের কয়েকজন আমাকে প্রদ্যুতদা ডাকছেন বললেও আমি যাইনি, কারণ প্রদ্যুতদাকে ভয় পেতাম। পরে বাচ্চুদা অভয় দিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন। বাচ্চুদাকে আমার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর নিতে বললেন। আমাকে আই এফ এ অফিসে দেখা করতে বললেন। তবে আমি যেতে পারিনি। এরপর একদিন শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানালেও যাইনি। কারণ একটাই প্রদ্যুতদার সামনে দাঁড়াবার সাহস আমার ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে পারলাম না। সেদিন আই এফ এ অফিসে ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ক্লাবের কিছু ব্যাপারে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে যখন নেমে আসছি তখন পিছন থেকে বিপিনদা (পাল) আমাকে ডেকে নিয়ে প্রদ্যুতদা-র ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আই এফ এ-র প্রাক্তন সচিব রঞ্জিত গুপ্ত এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। আমি ঘরে ঢোকার পরে রঞ্জিতদা বাদে অন্যরা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে রঞ্জিতদা এবং আমাকে নিয়ে প্রদ্যুতদা-ও উঠে পড়লেন। লেক মার্কেটের সামনে রঞ্জিতদার সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম। পরদিন দুপুর একটার সময়ে আবার দেখা করতে বললেন। প্রসঙ্গত আই এফ এ-তে স্বচ্ছতা আনার জন্য প্রদ্যুতদা, গগনদা এবং রঞ্জিতদা লড়াই করছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁদের কর্মসূচি আমাকে বুঝিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে প্রদ্যুতদা সচিব পদে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। চেয়ারে বসার পর থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল আই এফ এ পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার দিকে। রঞ্জিতদা যে পরিকল্পনাগুলোর কথা বলেছিলেন সেই দিকগুলোতে প্রথমেই নজর দিয়েছিলেন। বরাবরই ক্লাবগুলোর প্রতি সহৃদয় ছিলেন তিনি। নিজে ক্লাব করতেন বলে ক্লাবগুলোর সমস্যাগুলো তিনি জানতেন। যেমন ফুটবলারদের সাজ-সরঞ্জাম। প্রতিটি ক্লাবেই জার্সি ঠিক থাকলেও অনেক ক্লাবে

ফুটবলার বিভিন্ন রঙের প্যান্ট ও মোজা পায়ে খেলতেন। এই ব্যাপারে প্রদ্যুতদা আই এফ এ থেকে একই রঙের প্যান্ট ও মোজার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরো অর্থ আই এফ এ-র ফান্ড থেকে ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি ক্লাবগুলো প্যান্ট এবং মোজা ব্যবহার করছে কি না এই ব্যাপারেও নজর রাখার জন্য নিতাই এবং আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পাশাপাশি আমাদের দায়িত্ব ছিল মাঠগুলো সম্পর্কে খবর রাখার। এককথায় চমৎকার টিমওয়ার্ক। খেলার পরে ফুটবলারদের টিফিনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাবগুলোর আর্থিক দুরবস্থার দিকটা তিনি জানতেন। সবমিলিয়ে ক্লাবগুলোর খেলতে যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা করেছেন।

১৯৮৫ সাল থেকেই তাঁর খুব কাছে থাকার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের স্নেহ করতেন, আবার কোনও বে-নিয়ম দেখলে ধমক দিতেন। একবার সালকিয়া বনাম ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ম্যাচকে কেন্দ্র করে আমার বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রাগে আমার দিকে পেপারওয়েট ছুড়েছিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে বউদি ছুটে এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার প্রদ্যুতদাই রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ম্যাচটা ড্র-অবস্থায় বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল পরদিনই রি-প্লে দিয়েছিলেন। রাতেই ফুটবলারদের খবর দিতে হয়েছিল। তবে ম্যাচটা আমরা ১-০ গোলে জিতেছিলাম।

নিজে আই এফ এ সচিব হওয়ার আগে দলগঠনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। অন্য ক্লাব থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দক্ষ ফুটবলার তুলে এনে শক্তিশালী দল গড়েছেন। সেই তিনিই আই এফ এ-র সচিব হওয়ার পরে জর্জের দল গঠনের ব্যাপারে সাহায্য করতেন না। মনে আছে একবার ভ্রাতৃ সঙ্ঘ থেকে তিন জন ফুটবলারকে জর্জ সই করিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সুযোগ পেয়ে সই প্রত্যাহার করিয়েছিলাম। রিক্রুটাররা প্রদ্যুতদা-র কাছে অভিযোগ করলে তাদের ধমক দিয়ে বলেছিলেন ‘এটা তো তোমাদের ব্যর্থতা। আলোকেশ সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে।’

খেলা নিয়ে ‘গড়াপেটা’ অর্থাৎ মাঠে নেমে খেলার অভিনয় করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। বলতেন ‘যে কোনও ফুটবলারের কাছে জার্সি হল মা। সেই মায়ের সম্মান রক্ষা করাটাই একজন ফুটবলারের নৈতিক কর্তব্য।’

তিনি বিশ্বাস করতেন ক্লাবগুলোই হল ক্রীড়া সংস্থার আসল শক্তি। ক্লাবগুলো যদি নড়বড়ে থাকে তাহলে আই এফ এ-র ভিতটাও নড়বড়ে হয়ে যাবে।

বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম

দেবব্রত সরকার (নীতু)

(দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক)

প্রদ্যুতদা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অনিবার্য ভাবে যাঁর নামটি বলতে হয় তিনি হলেন আমাদের প্রয়াত দাদা পল্টু দাস। সত্যি বলতে কি জীবনে যতটুকু পরিচিতি, ভালোবাসা পেয়েছি সবই পল্টুদার জন্যে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এখন যে সব দায়িত্ব পালন করছি সবই পল্টুদা-র সান্নিধ্যে থেকে শিখেছি। সেরকমই প্রদ্যুতদার সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসার পিছনেও বড় ভূমিকা ছিল পল্টুদা-র।

১৯৭৮ সাল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচনে ডাক্তার নৃপেন দাস হেরে যান। ডা. দাসের অনুগামী ছিলেন পল্টুদা। এদিকে জর্জ টেলিগ্রাফে তখন দায়িত্বে প্রদ্যুতদা। ময়দানের বেশ কয়েকজন উদ্যোগী কর্মীকে নিয়ে ঘর সাজাচ্ছেন তিনি। সেই দলে ছিলেন বাচ্চু গুপ্ত। বাচ্চু গুপ্তকে অবশ্য আগেই জর্জে এনেছিলেন প্রদ্যুতদার মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত। বাচ্চু গুপ্তকে বিশ্বাস করতেন বিশ্বনাথ দত্ত।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর পল্টুদার গ্রুপের অনেকেরই ডেরা ছিল তালতলা ক্লাবে। সেক্ষেত্রে আমরা বেছে নিয়েছিলাম জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবু। সেই সময় একদিন পল্টুদা আমাকে নিয়ে যান প্রদ্যুতদার কাছে। আমার নাম সুপারিশ করেছিলেন তাঁর কাছে। বলেছিলেন, ‘নীতু খুব ভালো ছেলে, আপনার প্রয়োজনে জর্জ টেলিগ্রাফে নিতে পারেন।’ সেই সময় আমার কিন্তু খুব অভিমান হয়েছিল পল্টুদার ওপরে। সরাসরি জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কি আমাকে জর্জ টেলিগ্রাফে দান করতে চাইছেন? না, না আমি শুধু আপনার সঙ্গেই থাকব। আসলে ময়দানে আমি পল্টুদাকে ছাড়া নিজেকে ভাবতেই পারতাম না। তবে এটাও ঘটনা যে পল্টুদার সঙ্গে থেকেও আমি প্রদ্যুতদারও বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম। তাঁর ক্লাব পরিচালনায় জড়িত না হলেও অনেক ব্যাপারেই যখনই ডেকেছেন হাজির থাকতে ভুল করিনি।

ময়দানি রাজনীতিতে প্রদ্যুতদার খুব কাছের ছিলেন পল্টুদা। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পল্টুদার পরামর্শ নিতেন প্রদ্যুতদা। আই এফ এ-তে তখন একটা টালমাটাল অবস্থা চলছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পল্টুদা বুঝেছিলেন ওই অবস্থায় প্রদ্যুতদার মতো একজন ব্যক্তিই হাল ধরতে পারেন। আই এফ এ-র হাল ধরার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন পল্টুদা। তবে প্রথমদিকে প্রদ্যুতদা রাজি হননি।

তখন তিনি জর্জ টেলিগ্রাফকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি রাজি হয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে তিনি সচিব পদে নির্বাচিত হন। যাঁরা ময়দানি রাজনীতিতে জড়িত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন প্রদ্যুতদার সচিব হওয়ার পিছনে অন্তরালে বড় ভূমিকা ছিল পল্টুদার।

তার আগে ১৯৮৪ সালে আই এফ এ-তে ভোটাভুটি না করে কোষাধ্যক্ষ পদ নিয়ে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না প্রদ্যুতদা। সেই সময়ও তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন পল্টুদা।

আগেই বলেছি প্রদ্যুতদার বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আমিও অনেক সময় জড়িত থেকেছি। যখনই ডেকেছেন হাজির হতে ভুল করিনি।

যেমন মমতা ব্যানার্জির ডাকে 'সবুজ বাঁচাও' আন্দোলনে, ভ্রাতৃ সংঘ ক্লাবের কর্ণধার চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (গগনদা) ছিলেন কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। আন্দোলনে লোক জড়ো করার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে প্রদ্যুতদাকে সঙ্গে পেয়েছিলেন তিনি। আমাকে সকাল সাতটার মধ্যে ম্যাটাডোর ভাড়া করে লোক নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাশামতো জনসমাগম হচ্ছে না দেখে হতাশ হয়েছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। তখন তাঁকে আস্বস্ত করেছিলেন প্রদ্যুতদা। বলেছিলেন, 'আর কেউ না আসুক নীতু ঠিক আসবেই।' হ্যাঁ এই বিশ্বাসটুকু অর্জন করেছিলাম। চার ম্যাটাডোর ভর্তি লোক নিয়ে যখন হাজির হলাম তখন দেখলাম প্রদ্যুতদা হাসছেন। চন্দ্রনাথবাবুকে বলেছিলেন, 'কী? এ বারে খুশি তো।' কথা রাখতে পেরে আমিও তখন খুব গর্ববোধ করছিলাম। স্বভাবতই উৎসাহিত হয়ে ম্যাটাডোর ভাড়ার টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাকে ধমক দিয়ে প্রদ্যুতদা বলেছিলেন, 'আদর্শ সংগঠক হতে গেলে যেমন জনসংযোগ রাখতে হবে পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। দুটো ব্যাপারেই পারদর্শী হতে হবে।' প্রদ্যুতদার ওই কথাগুলো যে সর্বদা সঠিক পরবর্তীতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপলব্ধি করেছি।

প্রদ্যুতদার কাছে আমি কৃতজ্ঞ

সুনীল মুখোপাধ্যায়

(প্রাক্তন সহ-সচিব, আই এফ এ)

অনেক বছর আগেকার কথা। সবটা সেভাবে মনে নেই। যাই হোক তিনি আই এফ এ-তে আগমনের আগের ঘটনা তুলে ধরছি। বিশুদাকে দেখেছি কীভাবে সচিব হয়েছেন। সেই সময় বিশুদার হয়ে ঘুরেছি ভোট আদায়ের জন্য। বিশুদা সচিব পদে আসার পর প্রত্যেক ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এরপর বিশুদা অশোক ঘোষকে আই এফ এ-তে সচিব পদে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে অশোকদা আই এফ এ-র সভাপতি হয়েছিলেন এবং অশোক মিত্র যিনি নন্তু মিত্র নামে আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন, তিনি এবং বরুণ পাল যুগ্ম -সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর পরবর্তী অধ্যায় প্রদ্যুত দত্তর আবির্ভাব। হঠাৎ একদিন আমার ক্লাবের (উত্তরপাড়া স্পোর্টিং) খেলার পর জর্জ টেলিগ্রাফ টেন্টের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছি পান্নালাল চ্যাটার্জি (পানুদা) বললেন, তোমাকে প্রদ্যুতবাবু ডাকছেন, একবার দেখা করো। আমি সেই সময় দেখা করলাম। উনি বললেন, আমি আই এফ এ-র ভোটে লড়ব, তোমার সাহায্য চাই। আমি বললাম বিশুদা ও অশোকদা বিরাট ক্ষমতাশালী, হারানো দূর অস্ত। যাইহোক উনি বললেন, আমাকে লড়তেই হবে। তখন আমি রঞ্জিতদা (গুপ্ত) ও পানুদাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি। প্রত্যেকেই আশ্বাস দিয়েছিল লড়াই করার জন্য।

এরপর আই এফ এ-র ভোট হল। প্রত্যেক ডিভিশনে আমাদের প্যানেল হারল। ভোটের পর প্রদ্যুতদা গাড়িতে আই এফ এ-র কাছাকাছি ছিলেন। আমাকে বললেন কী হল? আমি বললাম, সব ডিভিশনে পরাজিত হয়েছি। শুনে বললেন, তাহলে আর পরের বছর লড়ছি না। তখন বলেছিলাম যে রবার্ট ব্রুস ৯ বার পরাজিত হয়েছিলেন, দশম বার তিনিই সফল হয়েছিলেন। আমাদের হাল ছাড়লে হবে না। এই কথা শোনার পর তিনি মনে জোর পেয়ে বললেন, ঠিক আছে লড়ব। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার পরের বছরই আমাদের যারা বিরোধী ছিল, সবাই তখন আমাদের দিকে চলে এল। ভোটে আমাদের প্যানেল জিতল এবং প্রদ্যুতদাকে গভর্নিং সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে সচিব হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

প্রদ্যুত দত্ত যেদিন আই এফ এ-র সচিব পদে বসলেন সেদিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সুস্পষ্ট আলোয় আমাদের পথ ছিল ভাস্বর। তারই মাঝে আপন বৈশিষ্ট্যে নিজেকে

ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না সেদিন। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে তিনি নিজেকে কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা, দক্ষ প্রশাসক, বিরাট ব্যক্তিত্ব, অ্যাসোসিয়েশনের বিচক্ষণ চিন্তাশীল দূরদর্শী পরামর্শদাতা।

তিনি ছিলেন গট আপের বিরোধী। তাঁর সময়ে গট আপ খেলা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল। প্রত্যেকেই জানেন রঞ্জিতদার দল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং বনাম ইন্টারন্যাশানাল গট আপ খেলার জন্য দু'বছর করে নির্বাসিত হয়েছিল। যদিও রঞ্জিতদা ছিলেন তাঁর পরম বন্ধু ও পরামর্শদাতা।

তিনি নার্সারি ডিভিশনের প্রবর্তন করেন। সেই সময়ে নার্সারি দলের থেকে দশ হাজার করে টাকা নেওয়া হয়েছিল খেলার জন্য। আমি এত টাকার ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু উনি তখন কর্ণপাত করেননি। পরে সেই টাকা দিয়ে প্রত্যেক দল আই এফ এ-র অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। তারপরে বলেছিলেন, তুমি বলেছিলে, কী হল সবাই তো টাকা দিল। সেই নার্সারি ডিভিশন এখনও চালু আছে।

শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি, তাঁর আমলে স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়। এছাড়া ইন্টার সাব-ডিভিশনাল (১৫ বছর) টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করেন। এই টুর্নামেন্ট থেকে বাছাই করে সাবজুনিয়র দল (১৫ বছরের নীচে) তৈরি হয় এবং ধানবাদে বাংলা দল বিজয়ী হয়েছিল। যে দলে খেলেছিল অর্পণ দে, সঞ্জয় মাঝি, সুবীর ঘোষ, গৌতম দে এবং আরও অনেকে যারা পরবর্তীকালে বাংলা ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

বিশুদার আমলে ১৪টি এ-ক্লাস ক্লাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গর্ভনিং বডিতে স্থান পেত, সেটি উনি বিলুপ্ত করেছেন। আগে জেলার ক্ষেত্রে W B Dist. Federation থেকে ১২ জন প্রতিনিধিত্ব করতেন এখন সব জেলা থেকে গভর্নিং বডিতে আসতে পারে রোটেশন অনুযায়ী। উনিই জেলার দলগুলিকে মর্যাদায় বসিয়েছেন।

তিনি ভালো কবিতা লিখতে পারতেন, তাঁর হাস্যরস কোনও দিনই ভোলার নয়। সুবক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। A I F F এর সভায় উপস্থিত থাকলে তাঁর সুবক্তব্যে প্রত্যেককে মোহিত করে দিতেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিজাল বার বার পরাস্ত করেছে A I F F এর কর্তৃপক্ষকে।

তাঁর নীতি আদর্শ ও আই এফ এ-র প্রতি একনিষ্ঠ আন্তরিকতা আমার কাছে উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকবে। আমোদপ্রিয়, উদার ও নম্র এক দৃষ্টিভঙ্গি যা সহজেই মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে পারত।

১০ বছর ধরে I F A সংক্রান্ত কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার জন্য প্রদ্যুতদার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অনেক কিছু শিখেছি। সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আস্থা অর্জন করেছিলাম

দিলীপ নারায়ণ সাহা

(আই এফ এ-র অন্যতম কর্মকর্তা)

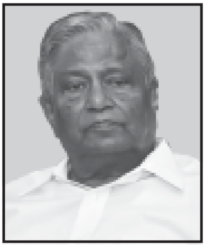

প্রদ্যুত দত্ত সম্পর্কে লেখার জন্য যখন অনির্বাণ (প্রদ্যুত দত্ত-র জ্যেষ্ঠ পুত্র) প্রস্তাব দিল তখন নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। তাঁর মতো একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নির্ভীক, সৎ, মানুষকে নিয়ে কিছু কথা বলতে পারব বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

তাঁর সম্পর্কে কলম ধরার আগে শুরুতে কয়েকটা কথা বলতেই হবে। কথাটা হল ফুটবল। ছোটবেলা থেকেই আমি ফুটবল অনুরাগী। পরিষ্কারভাবে জানাতে দ্বিধা নেই ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ সমর্থক। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা দেখতে ময়দানে ছুটে যেতাম। ক্লাবের ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের মেস ছিল দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটে ডোভার লেনে। কৃষ্ণস্বামী কিট্টু, বালসুব্রামনিয়ম, ধনরাজ প্রমুখ তারকা ফুটবলার থাকতেন ডোভার লেনের মেসে। অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে ডে-স্লিপ নিয়ে খেলা দেখেছি। আবার ময়দানে লাইন দিয়েও টিকিট কেটেছি। বিশেষ করে মোহনবাগান এবং মহামেডানের বিপক্ষে চ্যারিটি ম্যাচে।

সেই সময় যে ক্লাবগুলো তিন বড় ক্লাবের রাতের ঘুম কেড়ে নিত যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব। ইস্টার্নরেল, এরিয়ান, রাজস্থান ক্লাবের মতো জর্জ টেলিগ্রাফকেও বলা হত 'জায়ান্ট কিলার'। বড় তিন দলের কাছে জর্জ টেলিগ্রাফ ছিল শক্ত বাধা।

জর্জ টেলিগ্রাফ হল প্রদ্যুত দত্তদের পারিবারিক ক্লাব। মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্তর যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু হয় ১৯৮৫ সাল থেকে। তবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় যাটের দশকের শেষ দিকে। ১৯৮৭ সালে।

আমি তখন সুভাষদীপ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। ক্লাবের কর্ণধার মণি রায় একদিন আমাকে ৪বি অপূর্ব মিত্র রোডে প্রদ্যুত দত্ত-র বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেই সময় কালীঘাট রোটারি ক্লাবের কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মনে হয় রোটারি ক্লাবের কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। মণিদা আমাকে আই এফ এ-তে জড়িত হতে বলেছিলেন। আমি যেমন প্রদ্যুতদার আস্থা অর্জন করেছিলাম সেরকম তিনিও আমার শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। আমার বাবার পরে যে মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতাম তিনি হলেন প্রদ্যুত দত্ত। যা কয়েকটা কথা বলে প্রকাশ করা যাবে না।

তিনি ছিলেন কর্মযোগী। এককথায় কাজের মানুষ। একটা সময় অনেকে কালীঘাট রোটারি ক্লাব ছেড়ে অন্য একটি রোটারি ক্লাব গঠন করলেও আমি প্রদ্যুতদা-র সঙ্গ ছেড়ে যাইনি। ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। খুব বেশিদিন তাঁর পাশে থাকার সুযোগ হয়নি। ১৪/১৫ বছর পাশে থেকে যতটুকু শিখেছি সংগঠক হিসাবে সেটাই আমার পাথেয়। আমার মতে তিনিই বড় সংগঠক যে ব্যক্তিকে আদর্শ করে উত্তরসূরি উঠে আসেন। প্রদ্যুতদা ছিলেন এরকমই একজন সংগঠক। তাঁকে আদর্শ করেই ভ্রাতৃসুলভ সুব্রত দত্ত এবং পুত্র অনির্বাণ দত্ত এখন জর্জ টেলিগ্রাফ এবং আই এফ এ-তে সদর্পে বিচরণ করছেন। এদের কারওকেই কিন্তু প্রদ্যুত দত্ত হাতে ধরে চেয়ারে বসাননি। নিজেদের যোগ্যতাবলেই তাঁরা যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে উঠেছেন। যে রকম তাঁর মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত তাঁকে চেয়ারে বসাননি। নিজস্বতা না থাকলে কেউই চেয়ারে বসতে পারেন না।

তাঁর বড় গুণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল হার-না-মানা মনোভাব। যত কঠিন কাজই হোক তিনি কখনও পিছিয়ে যেতেন না। একবারই তাঁকে সরে দাঁড়াতে দেখেছি সেটা এ আই এফ নির্বাচনে। সেক্ষেত্রে তিনি প্রবল চাপ এবং পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আমি বাবার পরই যাঁকে শ্রদ্ধা করতাম তিনি হলেন প্রদ্যুত কুমার দত্ত।

স্বল্প জীবন, উজ্জ্বল নক্ষত্র

হারাধন চট্টোপাধ্যায়

(প্রাক্তন ফুটবল সচিব, জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব)

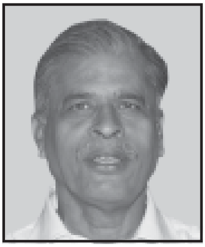

প্রদ্যুতদার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, যে আমি তাঁর সম্পর্কে কতটুকু জানি?

আমার প্রিয় ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফ। এই ক্লাবে আমার যৌবন কেটেছে। এখন জীবন বার্ধক্যে এসেছে। এই দীর্ঘ জীবনের একটা সময় স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দময় জীবন ছিল আমার এই জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে।

তখন ছিল চাঁদের হাট। একাধারে পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ দত্ত ও উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রদ্যুত দত্ত।

তখন আমাদের ক্লাবে ময়দানের গুণিজনদের আসা যাওয়া পরিপূর্ণ ছিল। সবসময় আমাদের ক্লাব গমগম করত। যাঁর উদ্দেশ্যে এই লেখা, সেই কর্মবীর প্রদ্যুত দত্ত এই ভিড়ের মধ্যমণি ছিলেন। যিনি ছিলেন একাধারে অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, পাশাপাশি রসিক, অসাধারণ প্রশাসক ও স্নেহশীল।

যখন প্রশাসনিক কর্মের মধ্যে ডুবে যেতেন তখন কারও সাহস হত না তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল মহামেডান ক্লাবকে সাসপেন্ড করা। কত তাবড় তাবড় নেতা ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং রাজ্যপালের (নুরুল হাসান) অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। কোনও বৃহৎ শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। দুই বড় ক্লাবের দুই মহান খেলোয়াড়দেরও শাস্তি দিয়েছেন।

আই এফ এ-র চরম আর্থিক দুরবস্থা। কর্মচারীদের দু মাসের বেতন বাকি, পুজো বোনাস দেওয়া হয়নি। পুজোর বাকি এক সপ্তাহ। প্রদ্যুতদা টাকার ব্যবস্থা করলেন নিজের উদ্যোগে এবং বেতন ও বোনাস দিলেন। আই এফ এ-র কর্মচারীরা আমার সন্তান তুল্য। ওদের পুজোর সময় কিছু না দিয়ে আমাদের পরিবারের পুজোর বাজার করা উচিত নয়।

আমার পুত্র সম্রাট আমার ক্লাব রুমে নিজের থেকে ঢুকে একটা ফুটবল খেলছিল। আমি ও আমার স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে ওকে নিষেধ করি এবং ফুটবলটা কেড়ে নিই। আমাদের পিছনে স্নেহময় প্রদ্যুতদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা দেখিনি। সম্রাটের

কাছ থেকে বলটা নিতেই আমার স্ত্রীর সামনেই আমাকে বললেন বলটা আমার ছেলেটাকে দিতে এবং আরও বললেন যে 'এই বলটা তোর বাবার নয়।' এইরকম স্নেহশীল ছিলেন উনি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় সন্তানদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য জর্জ টেলিগ্রাফের জন্ম। একসময় স্বার্থপর উগ্র আন্দোলনের জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তখন পাশে থেকে দেখেছি। ঠান্ডা মাথায় নিপুণতার সঙ্গে ওই ভয়ঙ্কর উগ্রবাদীদের হটিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ চালু করেছিলেন। তাই তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই।

সেইসময় প্রদ্যুতদা নিজে জর্জ টেলিগ্রাফের দল গঠন করতেন। খেলোয়াড়ের খোঁজে উত্তম মজুমদারের বাড়িতে রাতে গিয়েছিলাম। তখন প্রদ্যুতদার এত নাম ডাক হয়নি। তাই উত্তম মজুমদারকে আমি শ্রীমানীদার নাম করে ডাকছেন বললাম। প্রদ্যুতদাকে একথা বলতেই উনি অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে বললেন, 'আমি প্রদ্যুত দত্ত হয়ে থাকতে চাই। কারও নাম নিয়ে চলতে চাই না'। একথা বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। উত্তম মজুমদারের সঙ্গে দেখা করলেন না। এবং রাগে আমাকে গাড়িতে তুললেন না। এমতাবস্থায় গভীর রাতে একদিকে পাড়ার কুকুরের দল অন্যদিকে উত্তম মজুমদারও তাঁর বাড়ি থেকে আসছে, আমি কী করব বুঝতে পারছি না। দূরে দেখি প্রদ্যুতদার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

একবার জর্জ টেলিগ্রাফ ফুটবল টিম নিয়ে গোয়ায় গোল্ড কাপ ও বোম্বাইতে রোভার্স কাপ খেলে বাড়িতে ফিরে শুনি আগের দিন আমার বাড়ির সামনে একটা খুন হয়েছে। প্রদ্যুতদা আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের ডিডিদের দিয়ে আমাকে নিয়ে একটা গল্প বানিয়ে ফেললেন। পরের দিন আমি ক্লাবে আসামাত্রই ক্লাবে উপস্থিত পুলিশ ইনস্পেকটরদের মধ্যে একজন আমাকে পাড়ার খুনের কেসে গ্রেফতার করতে এলেন। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কেঁদে ফেলি এবং বলি যে আমি নির্দোষ এবং সেদিন আমি ছিলাম না। তাঁরা আমার কথা শুনতে রাজি হন না। আমার কান্নাকাটির পর প্রদ্যুতদা পুলিশ কর্মীদের চলে যেতে বললেন এবং তাঁরা চলে গেলেন। পরে জানা গেল যে এটা প্রদ্যুতদার এক চরম রসিকতা।

প্রদ্যুতদার আমলে রেফারিদের সাহায্য করা বিষয়টি চালু হয়। 2nd রেফারিদের করা এবং কোনও ক্লাব রেফারির প্রতি বিরূপ ব্যবহারকারী তাদের চরম শাস্তির বিধান দেওয়া হত। এবং খেলার সময় দৌড়ের ফলে রেফারিদের জলের প্রয়োজন হয়; উনিই প্রথম মাঠে রেফারিদের জল দেওয়া চালু করেন। এবং ময়দানে মহিলা ফুটবলও চালু করেন। অ্যালেন লিগ তুলে দিয়ে ৫ম ডিভিসন চালু

করেন। এছাড়া তাঁর একটি সিদ্ধান্ত কলকাতার ফুটবলের গড়াপেটা বন্ধ করার জন্য ৩ পয়েন্ট চালু করলেন। যা পরবর্তীকালে এই নিয়ম ফিফাও গ্রহণ করে।

জর্জ টেলিগ্রাফকে গৌরবান্বিত করেছেন ১৯৭৮ সালে দার্জিলিং গোল্ডকাপ জয় করে। ওই সময় ময়দানে অনেক বড় বড় ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফকে সমীহ করে চলত।

একদিন ক্লাবে জমজমাট অলোচনা চলছে আই এফ এ নিয়ে। সেই সময় ধীলন দাও ছিলেন ওই আলোচনায়। হঠাৎ আমাকে প্রদ্যুতদা বললেন জীনত আমনকে ডেকে নিয়ে আয়। ধীলনদা বললেন 'এটা ওর দ্বারা হবে না'। আমি ক্লাবের বাইরে জীনত আমনকে খুঁজি। এমন সময় দেখি খুব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছেন বুলিদা। আমি বুলিদাকে প্রদ্যুতদার নাম করে ওঁর ঘরে নিয়ে আসি। বুলি ঘরে ঢোকা মাত্র বিরাট হাসির রোল পড়ল।

আমার ভাগ্নে ভারত সরকারের একটা চাকরি পায়। সেখানে যোগ দিতে হলে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের সার্টিফিকেট চাই। অথচ হাতে মাত্র একদিন সময়। এই অবস্থায় আমি ভাগ্নেকে নিয়ে প্রদ্যুতদার শরণাপন্ন হই। তিনি সব শুনে আমার ভাগ্নেকে শাবাশ বলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং ওঁর ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললেন লালবাজারে আইপিএস অফিসার স্বরূপ মুখার্জির কাছে গিয়ে এই কার্ডটা দেখাতে এবং উনি নিজে ওঁকে ফোন করবেন বললেন। আমি লালবাজারে যাওয়া মাত্র উনি আমাকে বসতে বললেন এবং কিছুক্ষণ পরে কমিশনারের সার্টিফিকেটটা এনে দিলেন। পরদিন আমার ভাগ্নে চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রদ্যুতদাকে প্রণাম করতে এলে প্রদ্যুতদা বললেন 'মা বাবাকে দেখো'। এমনই মানবিক ছিলেন।

একবার কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল মাঠে জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে ইস্টার্নরেলের খেলা ছিল। সেই খেলায় ইস্টার্নরেল অফসাইডে থাকা খেলোয়াড়ের গোলে জয় লাভ করে। আমরা মাঠে উপস্থিত জর্জ টেলিগ্রাফের সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। খেলা শেষে রেফারির সঙ্গে তুমুল বচসা হয় এবং আমি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি। তখন রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সন্তোষ সেন আমার নামে আই এফ এতে অভিযোগ করেন যে এই ঘটনার ব্যবস্থা না নিলে উনি আর মাঠে রেফারি পাঠাবেন না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি কিছুদিন গা ঢাকা দিই এবং ক্লাবে আসা বন্ধ করি। এমতাবস্থায় একদিন দেবু মুখার্জি তাঁর গাড়ি করে আমাকে প্রদ্যুতদার বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে দেখি সন্তোষ সেন ও সেই রেফারি রয়েছেন। আমি প্রদ্যুতদাকে সব কথা বলি। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন 'তুই রেফারিকে হেনস্থা করলি কেন? ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।' আমি ওঁর

অফসাইডে গোলের কথা বলায় রেফারি উত্তেজিত হয়ে আমাকে বললেন 'তুমি টেকনিক্যাল ব্যাপার কী বোঝ? প্রদ্যুতদার কথামতো আমি রেফারির কাছে ক্ষমা চাই এবং রেফারিও আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মাথা ঠান্ডা করতে বললেন।

আমরা সবাই প্রদ্যুতদার কাছে কৃতজ্ঞ। এবং বর্তমান বাংলার অগ্নিকন্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শপথ গ্রহণের সময় চারজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ছিলেন। তাঁরা হলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়; বরুণ সেনগুপ্ত, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আমাদের প্রদ্যুত দত্ত।

দীর্ঘদিন প্রদ্যুতদার সঙ্গে ছিলাম। তাঁকে যেমন দেখেছি সেই কথা বলে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

প্রদ্যুতদার জন্যই আইএফএ আসা শুরু করেছিলাম

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার যৌবন কাল থেকেই গড়ের মাঠ করা শুরু। আমি তখন আমাদের কালিঘাট এম এস ক্লাব নিয়ে মাঠে পড়ে থাকতাম। কিন্তু আইএফএ অফিসে খুব একটা যেতাম না। প্রয়োজন হলে তবেই যেতাম। না হলে যেতাম না। আটের দশকের শুরুর কথা। ময়দানের বিভিন্ন মাঠে তখন প্রদ্যুতদাকে দেখতাম। তাঁদের জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের ফুটবলটা মুলত তখন প্রদ্যুতদাই দেখতেন। ওই সময় আবার বিশুদা (বিশ্বনাথ দত্ত) সিএবি-র সভাপতি হয়েছেন। একদিন বিকেলে প্রদ্যুতদার সঙ্গে আমার মাঠে দেখা হল। দেখা হতেই আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন,'ষষ্ঠী তুমি তো ভালই ক্লাবটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছো। আমি খোঁজ রাখি। শুধু নিজের ক্লাব করলে হবে? আইএফএ-তে আসো না কেন? মাঠে যেমন আসছো তেমনি আইএফএ-তেও এসো। তোমাদের মতো মানুষদের আইএফএ-র দরকার।' সেদিন প্রদ্যুতদার কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত আন্তরিকতা ছিল। আমিও তাঁর সম্পর্কে জানতাম। খুব সৎ মানুষ। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার মানুষ। রাশভারী, কঠিন ব্যক্তিত্ব হলেও প্রদ্যুতদার মনে কোথাও একটা শিশুর সারল্য ছিল। মানুষটাকে আমিও খুব পছন্দ করতাম। প্রদ্যুতদার সেই কথা শুনে আইএফএ যাওয়া শুরু করলাম। আস্তে আস্তে প্রদ্যুতদাকে আরও কাছ থেকে দেখার ও মেশার সুযোগ হল।

কলকাতা লিগে দল গড়তে ক্লাব কর্তাদের যে কি আর্থিক চাপ থাকে তা তারাই বোঝে যারা ক্লাব চালায়। তখন ওই সময় এখনকার মতো স্পনসর, ইনভেস্টর বলে কিছু ছিল না। এর, ওর কাছে সাহায্য নিয়ে দল গড়তে হত। একদিন হঠাৎ প্রদ্যুৎদা আমাকে ডেকে পাঠালেন বাবুঘাটের কাছে একটি হোটেলে। সম্ভবত হোটেলটার নাম 'গে'। মাঠ, ময়দানের সঙ্গে আমার দল গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে আলো (অলোকেশ কুন্ডু) হাজির। আলো এসে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে বলল, 'এই খামটা প্রদ্যুতদা পাঠিয়েছেন। পারলে পরে দেখা করে নেবেন।' আলো যাওয়ার পর খাম খুলে দেখলাম টাকা। পরের দিন প্রদ্যুতদার সঙ্গে দেখা করতে তিনি বলেন, 'টাকাটা ক্লাবের জন্য। ভাল

করে দল তৈরি কর।' পরবর্তীকালে লিগের আগে অনেক বার আমার ক্লাবের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছিলেন প্রদ্যুতদা। পরে জেনেছিলাম ময়দানের অনেক ক্লাব আছে যারা টাকার অভাবে ফুটবল দল করতে পারছে না, প্রদ্যুতদা তাদের মাঝে মধ্যেই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই সব দিন কখনও ভুলতে পারব না।

তিনি অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। আর সমস্যা সামনে এলে পালিয়ে যেতেন না। সমস্যাকে সামনে থেকে মোকাবেলা করতেন। ভয়ডর কিছু ছিল না তাঁর। একবার লিগের একটি ম্যাচ থেকে দল তুলে নিয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং। তখন মহামেডানের সচিব ছিলেন দোর্দন্ডপ্রতাপ মীর মহম্মদ ওমর। সেই সময় মহামেডান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সেই সময় দল তুলে নেওয়ার জন্য মহামেডানকে সাসপেন্ড করে দিয়েছিলন। মহামেডানকে সাসপেন্ড করার দুই দিন আগে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী প্রদ্যুতদাকে ডেকে বলেছিলেন, 'প্রদ্যুতবাবু, আপনি যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তাতে কিন্তু ল অন অর্ডার প্রবলেম হতে পারে। ভাল করে ভেবে নিয়ে মহামেডান স্পোর্টিং নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন।' ওই কথা শুনে সুভাষ চক্রবর্তীকে মুখের উপর প্রদ্যুতদা বলে এসেছিলেন, 'ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হলে আপনি কি জন্য আছেন। ওই সব তো আপনারা দেখবেন। ওটা আমার দেখার কাজ নয়। মাঠে অন্যায় করেছে, তাদের শাস্তি পেতেই হবে।' এই ধরনের কথা প্রদ্যুতদাই বলতে পারেন।

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ন্যাশনালে যাবে বাংলা দল। ট্রায়াল হল। পরে শিবিরও হল। তখন কোচ ছিল অমৃতলাল চক্রবর্তী। শিবিরে ভাল খেলার পর অলোক দাস বলে এক ফুটবলারকে বাদ দিয়ে দল শিলিগুড়ি চলে গেল। আমি প্রদ্যুতদাকে অলোকের কথা বললাম। নির্ধারিত হওয়ার পরও কি করে অলোক বাদ যায়? প্রদ্যুতদা সব শুনলেন। ওই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ছিল চুচুঁড়ায়। প্রদ্যুতদার জন্য অলোক দলে ফিরল। আর সেই অলোকের গোলেই বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

মমতার সঙ্গে আমিই প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে প্রদ্যুতদা ও মমতা দাদা-বোনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কোনও সমস্যা হলে প্রদ্যুতদার কাছে যেতেন। রীতিমতো আবদার করতেন। আর প্রদ্যুতদাও মমতাকে ছোট বোন ভেবেই খুব স্নেহ করতেন। সবুজ বাঁচাও আন্দোলন করে এই দাদা-বোন তো রবীন্দ্র সরোবরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সে সব ইতিহাস। এআইএফএফ সচিব নির্বাচন নিয়ে প্রদ্যুতদার সঙ্গে কিছু কর্তা পিছন থেকে ছুড়ি মেরেছিলেন। অন্তর্ঘাতটা যখন জানতে পারা গেল তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি জানি মমতাও তখন খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় প্রদ্যুতদাকে যদি এআইএফএফ-এর সচিব হতে না আটকাতো তাহলে ভারতীয় ফুটবল অন্যখাতে বইতো।

তবে তিনি আইএফএ-তে থেকে যে সব কাজ করে গিয়েছেন তা বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। তাঁর মৃত্যু যেন আমাদের পরিবারের নিকট আত্মীয় বিয়োগের সমান।

আমি প্রদ্যুতদাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, মিশেছি। পরবর্তীকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জয় (অনির্বান দত্ত)-কে একই ভাবে দেখছি। জয়ের মধ্যে প্রদ্যুতদার গুণ আছে। বাবার মতোই জয়ও সৎ ছেলে। ভয়ডরহীন। ব্যক্তিত্ব আছে। বাংলার ফুটবল নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে জয়। অনেক পরিকল্পনা আছে। নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে জয়।

তিন প্রধানকে ‘তেল’ দিয়ে আইএফএ-র সচিব থাকতে চাননি প্রদ্যুতদা

সরোজ চক্রবর্তী

সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়। আমি তখন আকাশবানীতে ফ্রিল্যান্সার। খেলার খবর দিতাম। সেই সময় থেকে আমার ময়দানে ক্রীড়া সাংবাদিকতা শুরু। আকাশবানীর পাশাপাশি বসুমতি, দেশ পত্রিকায় লেখালেখিও করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ১৯৭৬ সালে পাটনায় সন্তোষ ট্রফি। আমি বসুমতির হয়ে কভার করতে পাটনা গেলাম। ওই বছর বাংলা দলের কোচ ছিলেন অরুণ ঘোষ। অধিনায়ক সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ১৯৭৮ সালে কোয়েম্বাটোরে ফেডারেশন কাপ। আমি কভার করতে গেলাম ‘দেশ’ পত্রিকার হয়ে। ‘দেশ’ পত্রিকা মাসিক পত্রিকা। ফেডারেন কাপের পুরো কভারেজটা একটা সংখ্যায় ছাপা হবে। কোয়েম্বাটোরে গিয়ে পেলাম দ্য স্টেটসম্যানের শ্যামসুন্দর ঘোষ ও টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ভাস্করণকে। ফুটবলের মূল স্রোতে ঢুকে পড়লাম। আমার পরিচিতিও একটু বাড়ল। কোয়েম্বাটোর থেকে ফিরে আসার পর বরেণ্য ক্রীড়া সাংবাদিক মুকুল দত্ত বললেন, ‘তুমি অশোক দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করো। অশোক একটা খেলার ম্যাগাজিনের দায়িত্ব নিয়েছে। তুমি যোগাযোগ করো’। মুকুলদার নির্দেশ মতো ক্যামাক স্ট্রিটের শান্তিনিকেতন বিল্ডিংয়ের দশ তলায় গিয়ে অশোকদার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ম্যাগাজিনটার নাম - ‘খেলার কথা’। আর এই ম্যাগাজিনটার মালিক হলেন প্রদ্যুত দত্ত। এই প্রথম জানলাম, কোনও ফুটবল কর্তা কোনও খেলার ম্যাগাজিন করছেন।

‘খেলার কথা’য় যোগ দিলাম। এবং কোয়েম্বাটোরের ফেডারেশন কাপের লেখাটা আর ‘দেশ’ পত্রিকায় ছাপা হয়নি। বড় করে ছাপা হল ‘খেলার কথা’য়। তখনও আমি আকাশবানীতে ফ্রিল্যান্স কাজ করি। একদিন খবর পেলাম, প্রদ্যুত দত্ত আমাকে ময়দানের জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব তাঁবুতে দেখা করতে বলেছেন। খবর পাওয়া মাত্র পৌঁছে গেলাম। রাশভারী মানুষ। আমাকে দেখে প্রদ্যুতদা গম্ভীর কন্ঠস্বরে বলে উঠলেন,’ আমি কিন্তু তোমাকে চিনি।’ সেই দিনই জানলাম প্রদ্যুতদা একটা কৃত্রিম পা নিয়ে হাঁটাচলা করেন। তাঁর সঙ্গে আমার সেই শুরু। পরিচয় থেকে দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। বেশ কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর যে একটা বৃত্ত ছিল, আস্তে

আস্তে আমি সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তখন শুধু জর্জ ক্লাব নয়, নিয়মিত যাতায়াত শুরু হল প্রদ্যুতদার ৪ বি অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়িতে। চমৎকার মানুষ। রসিকতা করতেন। মজা করে কথা বলে বাস্তবটাকে তুলে ধরতেন। কারও সমস্যায় পাশে দাঁড়াতেন কাউকে না জানিয়েই। পরবর্তীকালে আমার মতামতকে গুরুত্বও দিতেন। 'আজকাল' পত্রিকা ফুটবলের অনেক এক্সক্লুসিভ খবর করতে পেরেছে প্রদ্যুতদার জন্যই।

প্রদ্যুতদা কখনও তিন প্রধান ক্লাব (মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান) কে 'তেল' দিয়ে আইএফএ সচিব হতে চাননি। এই তিন প্রধানের কর্তাদের ভয় পেতেন না। কর্তাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কোনও ক্লাবের অন্যায় আবদার মেনে নেননি। কখনও মাথা নিচু করেননি। প্রশাসক হিসেবে নিজেকে উর্দ্ধে রাখতেন। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম, প্রদ্যুতদা সব সময় অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করায় গর্ব অনুভব করতেন। এটাও তাঁর কাছে শিক্ষণীয়। এটাই তাঁর চরিত্র। ফলে শত্রুরাও প্রদ্যুতদাকে শ্রদ্ধা করতেন।

দোর্দন্ডপ্রতাপ মহামেডানকে শাস্তি দেওয়া, শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ করার আগে স্টেডিয়াম তৈরি করা থেকে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে লড়াই করার ঘটনা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। জীবনে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পেতেন না। ক্রীড়ামন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেহেরু কাপ করা, স্টেডিয়াম করা - আমার ৪৬ বছরের ক্রীড়া সাংবাদিকতায় কোনও কর্তাদের মধ্যে দেখিনি এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। প্রশাসক হিসেবে এম দত্ত রায়, পঙ্কজ গুপ্ত, বিশ্বনাথ দত্ত, অশোক ঘোষ, জগমোহন ডালমিয়া, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি যদি বাংলার ক্রীড়া মহলকে তুলে ধরে থাকেন তাহলে প্রদ্যুতদা লড়াই করে বাংলার ফুটবলকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার চোখে ফুটবল প্রশাসক হিসেবে প্রদ্যুতদাই সেরা। তারপরে থাকবেন অশোক ঘোষ। প্রদ্যুতদা

হলেন ফুটবল প্রসারের দিশারি। তিনি যদি আর ৫ বছর বেঁচে থাকতেন তাহলে বাংলার ফুটবলের মানচিত্রটাই বদলে দিতেন এবং সর্বকালের সেরা আইএফএ সচিব হতেন। আজকের দিনে মনে হয়, ব্যক্তি যদি প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়, তাহলে প্রদ্যুত দত্তই অনুপ্রেরণা।

তাঁর হাত ধরে জর্জ টেলিগ্রাফ ঘুরে দাঁড়াল

বিশেষ প্রতিবেদন : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারার সঙ্গে মিল ছিল জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ দত্তর। কবিগুরু মনে করতেন লেখাপড়ায় সাফল্য অর্জন করতে হলে শরীর ও মন সুস্থ থাকা জরুরি। শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলে তবেই লেখাপড়ায় মন বসবে।

জর্জ টেলিগ্রাফের প্রতিষ্ঠাতাও মনে করতেন কৃতী ছাত্র হতে গেলে খেলাধূলা অত্যন্ত জরুরি। জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। ১৯২৯ সালে তৎকালীন জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জর্জ ক্লাব। প্রসঙ্গত ট্রেডস কাপে সেই সময় সাহেবদের শক্তিশালী দলগুলোর পাশাপাশি অংশগ্রহণ করত মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান। এই তিন বড় ক্লাবেরও সাফল্যের শুরু ট্রেডস কাপ জয় দিয়ে।

পাঁচের দশকের গোড়া থেকেই কলকাতা ফুটবলে এমন কয়েকটি দল ছিল যারা বড় দলের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াত। সেইজন্য এইসব দলকে বলা হত 'জায়ান্ট কিলার।' এরকমই একটি দল ছিল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব।

পাশাপাশি অনেক তরুণ প্রতিভাবান এই ক্লাবে খেলেই পরবর্তীতে তারকা হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। জর্জ ক্লাবের এই কৃতিত্ব বংশপরম্পরা হয়ে আসছে দীর্ঘ ৯ দশক ধরে। তবে সংখ্যাটা বেশি বিশ্বনাথ দত্ত সচিব থাকাকালীন সময়ে। প্রতি বছরই তারকা ফুটবলার উপহার দিয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ।

গোলরক্ষক মণিলাল ঘটক থেকে শুরু করে রুনু গুহঠাকুরতা, স্বরাজ চ্যাটার্জি, সনৎ শেঠ, প্রসূন ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অলোক মুখার্জি, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলারদের উত্থান এই ক্লাব থেকে। পাশাপাশি গোলরক্ষক কমল সরকার, ডিফেন্ডার চন্দন ব্যানার্জির মতো বড় দলে অপরিহার্য ফুটবলারদেরও উত্থানও জর্জ থেকে।

বলতে দ্বিধা নেই পরবর্তীতে বিশ্বনাথ দত্ত আই এফ এ-র সচিব হওয়ার পরে বেশ কয়েকটা বছর জর্জ টেলিগ্রাফ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কলকাতা তথা বাংলার ফুটবল সামলাতে তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে জন্য ক্লাবের ক্ষেত্রে বেশি সময় দিতে পারতেন না। কয়েকটা বছর একটু দুঃসময় গেলেও জর্জ আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে ১৯৭৪ সাল থেকে। সেই সময়ে সচিব হিসাবে দায়িত্বে আসেন বিশ্বনাথ দত্ত-র কনিষ্ঠতম ভ্রাতা প্রয়াত প্রদ্যুত কুমার দত্ত। প্রথম বছর একটু

পরখ করে নিয়েছিলেন দলটাকে। ১৯৭৫ থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন শক্তিশালী দল গড়ার কাজে। সঙ্গে পেয়েছিলেন বেশ কয়েকজন সক্রিয় কর্মী। প্রদ্যুতবাবুর সঙ্গে তাঁরা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। প্রদ্যুতদার টার্গেট ছিল তরুণ প্রতিভাবানদের পাশাপাশি বড় দলে বঞ্চিত ফুটবলারদের দিকে। যাঁরা দলে নিয়মিত সুযোগ না পেয়ে ফুঁসছেন। জুনিয়রদের সঙ্গে এইসব পোড়খাওয়া সিনিয়রদের সমন্বয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ হয়ে উঠেছিল একতাবদ্ধ একটা দল। প্রাক্তন ফুটবলার শম্ভু মুখার্জি, অনিল সাহা-র মতো প্রবীণদের সঙ্গে পেয়েছিলেন বেশ কয়েকজন তরতাজা ক্যাডারকে। প্রদ্যুত দত্ত-র অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোনও শব্দ ছিল না। তাঁর ক্যাডারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন শতদল গুপ্ত (বাচ্চু), পুঁটে ঘোষ, আদিত্য চৌধুরী প্রমুখ। বাচ্চু গুপ্তর অবশ্য আগমন বিশ্বনাথ দত্ত-র হাত ধরেই।

প্রদ্যুত দত্ত-দার দলগঠন পদ্ধতি আগেই বলেছি। বড় ক্লাব থেকে তাঁদেরই টানতেন যাঁদের মধ্যে একটা 'দেখে নেব' – চ্যালেঞ্জ থাকত। যেমন ১৯৭৬ সালে ইস্টবেঙ্গলের লেফট ব্যাক মৃদুল মুৎসুদ্দি, সাতাত্তরে মোহনবাগানের নিমাই গোস্বামী। আটাত্তরে ইষ্টবেঙ্গল থেকে স্টপার রমেন ভট্টাচার্য, মিডফিল্ডার রতন দত্ত এবং স্ট্রাইকার প্রদীপ দত্ত। এইসব বড় দলের ফুটবলাররা কিন্তু জর্জ ক্লাবে এসেও হারিয়ে যাননি। তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন, বিশেষ করে তাঁদের পুরনো দলের বিরুদ্ধে।

প্রদ্যুত দত্তর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জর্জ টেলিগ্রাফের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সাল থেকেই। সে বছর বড় দল থেকে যোগ দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান খেলা স্টপার স্বপন দত্ত। ১৯৭২ শিল্ড সেমিফাইনালে ম্যালয়েশিয়ার স্টেট অব সেলেঙ্গারের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গলের নায়ক ইনসাইড ফরোয়ার্ড শম্ভু মৈত্র। ১৯৭৫-এ জর্জ টেলিগ্রাফের ফরোয়ার্ডরা তিন বড় দলের দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগকে রীতিমতো বেগ দিয়েছিলেন। সে বছর জর্জের আক্রমণভাগে খেলতেন মনীশ মান্না, নিমাই দালাল, শম্ভু মৈত্র ও মহম্মদ মুকিম। মণীশ মান্না ও মহম্মদ মুকিম এসেছিলেন ছোট দল থেকে। কিন্তু দু-জনই প্রথম বছরেই নজরকাড়া ফুটবল খেলেছিলেন।

সে বছর কলকাতা লিগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল তিন বড় দলের মধ্যে। একদিকে একটানা ছ-বছর লিগ জয়ের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল, অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল যাতে তাদের রেকর্ড টপকে যেতে না পারে সে জন্য মহামেডানের মরিয়া লড়াই। পাশাপাশি একটানা পাঁচ বছর লিগ জিততে না পারার যন্ত্রণা মোহনবাগানের।

এরকম একটা হাড্ডাহাড্ডি মরশুমে প্রবলতম শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে প্রথমার্ধে ফালাফালা করে দিয়েছিলেন মণীশ, নিমাই, শম্ভুরা। অন্তত তিনবার নিশ্চিত পতন থেকে বাঁচিয়েছিলেন গোলরক্ষক তরুণ বসু। কিন্তু জর্জের রক্ষণভাগ সে তুলনায় শক্তিশালী ছিল না। তাই সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, সুরজিৎ সেনগুপ্তদের

পালটা আক্রমণ সামলাতে পারেননি জর্জের ডিফেন্ডাররা।

দলের দুর্বলতা নজর এড়ায়নি সচিব প্রদ্যুত দত্ত-র। ছিয়াত্তরে প্রথমেই নজর দিয়েছিলেন রক্ষণ সংগঠনে। ইস্টবেঙ্গল থেকে মৃদুল মুৎসুদ্দিকে দলে টানার কথা আগেই বলেছি। স্টপারে টানলেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিভু চক্রবর্তী এবং পুলিশ এ সি-র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৭৫ সালে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দলের রক্ষণে দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলেছিলেন বিভু চক্রবর্তী। পুলিশ এ সি থেকেই জুনিয়র ন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিলেন মনোরঞ্জন। দাপটের সঙ্গে খেলেছিলেন গোটা মরশুম। সেই সূত্রে সুযোগ পেয়েছিলেন ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় দলেও।

সাইড ব্যাকে দলে টেনেছিলেন খিদিরপুর থেকে পার্থ সরদারকে। ১৯৭৫ সালে পার্থ দাপটের সঙ্গে খেলেছিলেন খিদিরপুরে।

মাঝমাঠও মজবুত ছিল সে বছর। দুই তরতাজা মিডফিল্ডার খিদিরপুর থেকে সুবিমল ঘোষ এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে প্রবীর ঘোষ। সুবিমল তার আগে সন্তোষ ট্রফিতে রানার্স ভারতীয় রেলওয়ে দলের সদস্য ছিলেন ১৯৭৪ সালে। এছাড়াও দলে ছিলেন প্রতিশ্রুতিমান উত্তম মজুমদার।

ঢেলে সাজালেন আক্রমণভাগকেও। মোহনবাগান থেকে সই করালেন লেফট স্ট্রাইকার শিবব্রত নাথ এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে বিপ্লব মজুমদারকে।

রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি বিভাগেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন স্টপারে বিভু চক্রবর্তীর পাশে মনোরঞ্জন। ঠান্ডা মাথায় খেলতেন বিভু। চমৎকার অ্যান্টিসিপেশন। খেলায় কখনও হাকডাক ছিল না। পাশে ছিলেন লড়াকু মনোরঞ্জন। বয়সে তরুণ, ভয়ডর বলতে কোনও শব্দ তাঁর অভিধানে লেখা ছিল না।

মাঝমাঠে সুবিমল ছিলেন পরিশ্রমী। ৭০ মিনিট মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চষে বেড়াতেন। পাশে প্রবীর ঘোষও ছিলেন লড়াকু। দলকে খেলাতেন।

আক্রমণে ভয়ঙ্কর ছিলেন শিবব্রত নাথ। দ্রুতগতি সম্পন্ন স্ট্রাইকার ছিলেন শিবব্রত নাথ। পাশে এসেছিলেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিপ্লব মজুমদার। বিপ্লব ছিলেন শিল্পী ফুটবলার। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রত্ন বিপ্লব। বলকে কথা বলাতে পারতেন। তাঁর ফুটবলশৈলী মুগ্ধবিস্ময়ে উপভোগ করতেন বিশেষজ্ঞরা। টালিগঞ্জ অগ্রগামীতে থাকাকালীন মন জয় করেছিলেন কোচ অমল দত্তর। এক কথায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন বিদগ্ধ কোচ। বিপ্লবকে ঘিরে বিশাল প্রত্যাশা ছিল 'ডায়মন্ড' কোচের। শোনা যায় সেই সময়ে তাঁকে রাজপ্রাসাদে থাকার জন্য বলেছিলেন ভুটানের রাজা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিপ্লবের চোট আঘাতের কারণে বেশিদিন খেলতে পারেননি। দুর্ভাগ্য বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলেরও। তবে ১৯৭৬-এ চুটিয়ে খেলেছিলেন বিপ্লব।

প্রবীণ এবং নবীনদের সমন্বয়ে দলটাকে সংগঠিত করেছিলেন কোচ শান্ত মিত্র। প্রথম দিকে অবশ্য তিনি দায়িত্বে ছিলেন না। প্রথমে নিয়োগ করেছিলেন সদ্য সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের কোচ ল্যাংচা মিত্র-কে। কিন্তু প্রথম দিকে দল আদৌ সুবিধা করতে পারেনি। সেই সময়ে নতুন কোচ হিসাবে নিয়োগ করলেন প্রাক্তন ফুটবলার ইস্টবেঙ্গলের 'লাকি ক্যাপ্টেন' শান্ত মিত্রকে। কোচ হিসাবে শান্ত মিত্রর ইনিংস শুরু হল প্রদ্যুত দত্ত-র হাত ধরে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকেই। আগে কোনও দলকে ট্রেনিং করাননি শান্ত। কিন্তু ম্যান ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। সেই কারণে মানতেই হবে কোচ হিসাবে শান্ত মিত্রকে নিয়োগ করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন জর্জ সচিব প্রদ্যুত দত্ত। পরবর্তীতে তার সুফলও পেয়েছিলেন। লিগে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেন জর্জের ফুটবলাররা।

কেমন দিলাম

বিপ্লব দাশগুপ্ত

(জর্জ টেলিগ্রাফের প্রাক্তন কর্মী)

কেমন দিলাম। কথাটা মাঝেমধ্যেই শুনতাম তাঁর মুখে। তিনি একদা জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের কর্ণধার প্রদ্যুত কুমার দত্ত। আজ থেকে ২৯ বছর আগে ১৯৯৪ সালের ১৬ নভেম্বরে তিনি প্রয়াত হয়েছেন, যখন তাঁর বয়স ছিল ৫৩। এককথায় অকালমৃত্যু। কিন্তু ২৯ বছর বাদেও একবারও মনে হয় না তিনি নেই।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৪ সালে জুন মাসের একদিন। আমি তখন জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে টাইপ এবং শর্টহ্যান্ড শিখছি। আমার শেখার সময় ছিল বিকাল তিনটে থেকে পাঁচটা। কিন্তু একটা সমস্যা ছিল যে তখন মাঝেমধ্যেই আমাকে কলকাতা লিগের খেলা দেখতে ময়দানে যেতে হত। আমি তার একবছর আগে থেকেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ফুটবলের ধারাবিবরণী দিচ্ছি। আকাশবাণী থেকে নির্দেশ ছিল ধারাবিবরণী দিতে হলে খেলা দেখতে হবে। খেলা দেখার ব্যবস্থা অবশ্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষই করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সমস্যা হল তখন কলকাতা লিগের খেলা শুরু হত বিকাল ৪-৩০ মিনিট থেকে। তাই টাইপ-শর্টহ্যান্ড শিখে মাঠে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। মাঝেমধ্যেই ক্লাস করতে পারিনি। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি টাইপ ইনচার্জের। মাঝেমধ্যে অনুপস্থিতির কারণটা জানতে চাইলেন। সব শুনে রেজিস্ট্রারকে একটা চিঠি লিখতে বললেন।

সেইমতো একদিন বাদে তিনি আমাকে নিয়ে রেজিস্ট্রার প্রদ্যুত দত্তর কাছে নিয়ে গেলেন। আমার সমস্যার কথা শুনে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল। ‘তোমার বয়স কত?’ ২৫ এর কাছাকাছি শুনে যেন কিছুটা খুশি হলেন। ‘অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্য, পুস্পেন সরকারের পাশে বসে ধারাবিবরণী দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছ। তুমি তো ভাগ্যবান। এগিয়ে যাও কোনও সমস্যা হবে না।’ পরদিন টাইপিস্ট ইনচার্জ আমাকে জানালেন, শর্টহ্যান্ড ক্লাসটা ২টা থেকে ৩টার মধ্যে

করতে হবে। টাইপের ক্লাস ৩টা থেকে ৪টে। তবে যেদিন খেলা দেখতে যাবে একটু আগেই যেতে পারবে।

সেই ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪, দেখতে দেখতে ২০টা বছর কেটে গেছে। ঠিক একজন দাদার মতো আগলে রেখেছেন। খুব কাছে থেকে মানুষটিকে দেখেছি। দীর্ঘাকায়, স্বাস্থ্যবান এক পুরুষ। বাইরে থেকে খুবই কঠিন মনে হত। এমনিতে তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু আসলে তাঁর মনটা ছিল শিশুর মতো সরল। পরিবারের বাইরেও তিনি ছিলেন ত্রাণ-কর্তা। অফিসের একজন সাধারণ কর্মীর জন্যও তিনি ছিলেন দায়িত্বপরায়ণ, স্নেহশীল।

আমি বিস্তারিত বিবরণে যাব না। তবে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরছি।

তিনি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি ছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের সচিব। বলতে গেলে ক্লাবের খোলনলচে পালটে দিয়েছিলেন। জর্জের ফুটবল দল সেই সময় ভালো অবস্থায় ছিল না। সেই দল প্রদ্যুত দত্ত-র তত্ত্বাবধানে ঘুরে দাঁড়াল ১৯৭৫ সাল থেকে। স্বপন দত্ত, শম্ভু মৈত্র, নিমাই দালাল — এরপর বড় দল থেকে বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে দল গড়লেন। সঙ্গে মণীশ মান্না, জগদীশ ঘোষ, মহম্মদ মুকিম — এরকম কয়েকজন তরুণ প্রতিভাবানদের। ফলস্বরূপ ১৯৭৫ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৯ জর্জ টেলিগ্রাফ বড় তিন দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। একটা সময় 'জায়ান্ট কিলার' খ্যাত জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছিল প্রদ্যুত দত্ত-র সময়ে। মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত সচিব থাকাকালীন যেমন জলপাইগুড়ি থেকে গোলরক্ষক মণিলাল ঘটক এবং ইনসাইড ফরোযার্ড রুনু গুহঠাকুরতাকে তুলে এনেছিলেন, তাঁরা পরবর্তীতে দুই বড় দল তথা বাংলা এবং ভারতীয় দলে সদর্পে বিচরণ করেছেন। পরবর্তীতে গোলরক্ষক সনৎ শেঠ, কমল সরকার, চন্দন ব্যানার্জি, প্রসূন ব্যানার্জি। বিশ্বনাথ দত্তর আমলেই জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে বড় দলে সুযোগ পেয়েছেন। সেই ধারা আবার ফিরে এল প্রদ্যুত দত্তর হাত ধরে। জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে বড় দলে এবং রাজ্য তথা জাতীয় দলে সদর্পে বিচরণ করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অলোক মুখার্জি, জগদীশ ঘোষ, সঞ্জীব চৌধুরী, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি প্রমুখ। প্রদ্যুত দত্তর আকর্ষণেই মোহনবাগানের অধিনায়ক নিমাই গোস্বামী, ইস্টবেঙ্গল থেকে রমেন ভট্টাচার্য, মৃদুল মুৎসুদ্দি, প্রদীপ দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা তারকা যোগ দিয়েছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ এই সময়ে জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রফিও জিতেছে যথাক্রমে ১৯৭৭ সালে দার্জিলিং গোল্ড কাপ এবং ১৯৭৮ সালে আগরতলায় পদ্মজং ট্রফি। ১৯৮৪ সালে পাটনায় সঞ্জয় গান্ধী ফুটবলে রানার্স হয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। সুযোগ পেয়েছিল ডি সি এম ট্রফিতে।

কতগুলো নীতি তিনি পালন করতেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতেন না। অনৈতিক গড়াপেটা খেলা ঘৃণা করতেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আই এফ এ-র সচিব হিসাবে তিনি বড় তিন দলের অন্যায় আবদার যেমন মেনে নেননি। প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি দিতেও দ্বিধা করেননি, পাশাপাশি সরকারি অসহযোগিতাতেও থেমে থাকেননি। এইসব ব্যাপারে অন্যদের লেখাতে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন। গড়াপেটা ম্যাচ তিনি কতটা ঘৃণা করতেন এবং এ ব্যাপারে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটা ফুটবল জগতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ঘটনা ১৯৭৬ সাল। ছ-বছর বাদে কলকাতা লিগ জয়ের দোরগোরায় মোহনবাগান। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ব্যবধান মাত্র ১ পয়েন্টের। লিগ তখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিন-চারটি ম্যাচ বাকি ছিল দুই বড় দলের। তাই প্রতিটি ম্যাচই চ্যালেঞ্জ ছিল সবুজ-মেরুন জার্সিধারীদের কাছে। এরকম একটা টেনশনের সময়ে মোহনবাগানের মুখোমুখি জর্জ টেলিগ্রাফ। শেষ মুহূর্তে এসে তরী যাতে না ডোবে এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন মোহন-কর্তারা। ময়দানের বাতাসে তখন খবর, জর্জ টেলিগ্রাফকে ম্যানেজ করেছে মোহনবাগান। হ্যাঁ। এরকম একটা গুজব ছড়ানোর একটা কারণ তো ছিলই।

প্রদ্যুত দত্তর আশঙ্কা ছিল তিন চারজন ফুটবলারকে হয়তো মোহনবাগান ম্যানেজ করে নিতে পারে। তাই একটা কৌশল অবলম্বন করলেন তাহল, মোহন-কর্তাকে আশ্বস্ত করলেন। শোনা যায়, ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে। সেইমতো অর্থও নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মোহনবাগান আর কোনও বিশেষ ফুটবলারের পিছনে ছুটবে না। তবে তাঁর অপারেশন এখানেই শেষ ছিল না। পাশাপাশি দলের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ম্যাচের দু-দিন আগেই তুলে আনলেন নিজের বাড়িতে জর্জ টেলিগ্রাফের ডেরায়।

এদিকে ময়দানে রটে গেছে মোহনবাগানকে ছেড়ে দিচ্ছে জর্জ টেলিগ্রাফ। মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে এসেছেন প্রচুর দর্শক। লিগ জয়ের পথে মোহনবাগানের সামনে 'জায়ান্ট কিলার' খ্যাত দুই দল জর্জ টেলিগ্রাফ এবং

এরিয়ান। স্বভাবতই জর্জ টেলিগ্রাফ ম্যাচ ঘিরে টেনশন ছিল সবুজ-মেরুন শিবিরে। সেই টেনশন আরও বাড়িয়ে দিলেন জর্জ-সচিব প্রদ্যুত দত্ত। দল নিয়ে মাঠে পৌঁছেই মোহন-কর্তাকে বললেন, 'সরি দাদা, স্ট্রেট ফাইট।' সেই সঙ্গে টাকাটাও ফেরত দিলেন। ম্যাচে মোহনবাগানের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। শেষদিকে গোল করে জিতেছিল মোহনবাগান। আর একটি ঘটনা ১৯৭৭ সালে। কুমারটুলি ক্লাব তখন অবনমনের কবলে। ঘটনা হল, ঐতিহ্যশালী এই ক্লাবের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল জর্জ-সচিবের। তাঁর দলের বেশ কয়েকজন সক্রিয় কর্মীর যোগাযোগ ছিল কুমারটুলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে। পাশাপাশি ময়দানে কুমারটুলি ক্লাবের ডেরা ছিল জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুর সংলগ্ন কবাডি তাঁবুতে। সেই হিসাবে কুমারটুলি ক্লাব প্রায় নিশ্চিত ছিল জর্জের কাছ থেকে দু-পয়েন্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু এ বারেও নীতিতে অবিচল ছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। ম্যাচটা জর্জ টেলিগ্রাফ জিতেছিল। আসলে মাঠের বাইরে হৃদ্যতা যতই থাকুক, খেলার ক্ষেত্রে তিনি 'ছেলে খেলা' বরদাস্ত করতেন না। তাই গড়াপেটা খেলাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন।

বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসতেন। অনেকেই যে কাজ অসম্ভব, অবাস্তব বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন সদিচ্ছা থাকলে কোনও কাজই অসম্ভব নয়। যেমন ১৯৮৮ সালে জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। সেবার দায়িত্ব পেয়েছিল আই এফ এ। সংস্থার সচিব প্রদ্যুত কুমার দত্ত। জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধনী বছর ১৯৮২ এবং ১৯৮৪ দুবারই তাক লাগিয়ে আয়োজন করেছিল বাংলার নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ। যার নেপথ্যে মুখ্য অবদান ছিল আই এফ এ-র তৎকালীন সচিব এবং পরবর্তীতে এ আই এফ এফ-এর সচিব অশোক ঘোষ। অর্থাৎ নেহরু কাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে দুবারই দারুণভাবে সফল ছিল বাংলার ফুটবলে নিয়ামক সংস্থা। তাই এ বারে নতুনত্ব কিছু দরকার। প্রদ্যুত দত্ত সিদ্ধান্ত নিলেন এ বারের প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র, জেলা শহর শিলিগুড়িতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেরালা রাজ্যের মতো ফুটবলকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার। এই ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরি মেজদাদা প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে আই এফ এ শিল্ড এবং জাতীয় জুনিয়র ফুটবল আয়োজন করেছিলেন কলকাতার বাইরে শিলিগুড়ি, পুরুলিয়া, বার্ণপুর, কৃষ্ণনগর এরকম কয়েকটি জেলা শহরে। কিন্তু কোনও আন্তর্জাতিক আসর আগে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। এই ব্যাপারে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী

১৯৮৭ সালে আই এফ এ-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে বলেছিলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম তিনি স্বপ্নবিলাসী। এখন দেখছি তিনি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতাও রাখেন।’

প্রসঙ্গত শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ আয়োজনের সময় তাঁর সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর অনেক ব্যাপারেই মতান্তর হয়েছিল। রাজ্য সরকার শিলিগুড়িতে স্টেডিয়াম গড়া থেকে শুরু করে শহরটাকে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বতভাবে সাহায্য করলেও প্রতিযোগিতার আয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেনি। তবু তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। হ্যাঁ, নেহরু কাপ আয়োজনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও অনেকরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনওটাই সেভাবে লক্ষ করা যায়নি। বাংলার তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত কুমার পাঁজা আর সাংসদ মমতা ব্যানার্জি ছাড়া বাংলার আর কোনও সাংসদকে সেভাবে কাছে পাননি। নেহরু কাপের অতিথি তালিকায় এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম ছাপা হলেও শেষ পর্যন্ত একমাত্র মন্ত্রী শীলা দীক্ষিত (পরবর্তীতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী) ছাড়া আর কোনও সাংসদের চরণধুলি শিলিগুড়িতে পড়েনি।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল, এ আই এফ এফ-এর তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি পাহাড় থেকে সাগর যাওয়ার পথে শিলিগুড়ি শহরে দেশবন্ধু নগরে এসেও কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামমুখো হননি।

ঘটনা হল হরেকরকম বাধা এবং অসহযোগিতা সত্ত্বেও প্রদ্যুত দত্তকে থামানো যায়নি। তখন তাঁর জেদ বেড়ে যেত। দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছেন। লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল এবং সাফল্য অর্জনও করেছিলেন। একটা কথা সবসময়ই বলতেন, সততার সঙ্গে লক্ষ্যে অবিচল থাকলে যে কোনও কঠিন কাজেও সাফল্য পাওয়া যায়।

আর একটা ব্যাপারে তিনি অনেকের থেকে ব্যতিক্রম। এই ব্যাপারে শিলিগুড়িতে খেলা আয়োজনের সময়ের একটা ঘটনা জানাচ্ছি।

তাহল, তিনি কখনওই পালিয়ে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তবে তাঁর একটা অভ্যাস ছিল খোলামেলা আড্ডায় এমন অনেক কথা বলেছেন, যে কথাগুলো সংবাদপত্রে ছেপে দু-একজন সাংবাদিক বাজার গরম করতে চেয়েছেন। তাতে সেই সাংবাদিকরা হয়তো বাহবা কুড়িয়েছেন কিন্তু ক্ষতি হয়েছে প্রদ্যুত দত্ত-র। কারণ খোলামেলা আড্ডায় তিনি যে কথাগুলো বলতেন সেগুলো সংবাদপত্রে ছাপার জন্য বলেননি। কারণ, সেইসব আড্ডায় বেশিরভাগই থাকতেন অন্য পেশার লোকজনও।

এরকমই একদিন নেহরু কাপ শুরুর প্রাক্কালে যখন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে কয়েকটি কথা অভিমানে বলে ফেলেছিলেন। সেই কথাগুলো কোনও একটি সংবাদপত্রে ছেপেছিলেন সেই কাগজের দায়িত্বশীল একজন সাংবাদিক। কথাগুলো তিনি কিন্তু ছাপার জন্য বলেননি। একেবারে ঘরোয়া কথাবার্তা। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরই তৎকালীন শাসকদল নেহরু কাপ বয়কট করে। সেই সময়ে নেহরু কাপের খেলা জোরকদমে চলছে। প্রদ্যুত দত্তর চেয়ারে অন্য যে কেউ যদি থাকতেন তিনি হয়তো সেই সময় সেই খবরকে অস্বীকার করতেন। তাতে বিপদে পড়তেন সেই সাংবাদিক। প্রদ্যুত দত্ত কিন্তু সেই পথে হাঁটেননি। ছাপার জন্য না বললেও সেই সংবাদ/প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি। কারণ সেই সাংবাদিককে তিনি স্নেহ করতেন।

তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন ফুটবলপ্রেমী। ১৯৮৬ সালে মহমেডান ক্লাবকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গিয়েছিল। সেই সময় অনেকরকম চাপের সামনেও তিনি ছিলেন অবিচল। মহামেডান ক্লাবের অখেলোয়াড়ি মনোভাবকে প্রশ্রয় দেননি। পাশাপাশি একথাও বলতেন, 'মহামেডান সমর্থকরাও যথার্থই ফুটবলপ্রেমী। ওদের জন্য কষ্ট হয়, কিন্তু আমরা নিরুপায়।' কথাটা বলেছিলেন ১৯৮৬ সালে মহামেডানকে সাসপেন্ড করার পর একদিন রেড রোড ধরে আই এফ এ অফিসে যাওয়ার পথে ক্লাবের তাঁবুর বাইরে প্রাচীরে শুয়ে থাকা হতাশ মহামেডান সমর্থকদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন। 'ওদের দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু .....।'

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। কলকাতায় অল এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে আসছি। অল এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ ছিল একটা সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। কিন্তু এরকম একটা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ-র অনুমোদন নেয়নি এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ কমিটি। আই এফ এ-র সম্মান বাঁচাতে কঠোর হয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত। শেষমেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ আই এফ এ-র অনুমোদন নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালে আই এফ এ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল অংশগ্রহণ করল না। আই এফ এ-কে একটু টাইট দেবে ভেবেছিল। ইস্টবেঙ্গলকে বাইরে রেখে শিল্ড পরিচালনা করতে পারবে না আই এফ এ-র এরকম বদ্ধমূল ধারণা ছিল লাল-হলুদ কর্তৃপক্ষর। কিন্তু এই মানুষটি তো অন্য ধাতের। ইস্টবেঙ্গলকে বাইরে রেখে শিল্ড আয়োজন করলেন।

১৯৯১ সালে আবার উলটো ছবি। আই এফ এ শিল্ডের শতবর্ষ। এ বারে নানান বাহানা তুলে চাপ সৃষ্টি করেছিল মোহনবাগান। ভেবেছিল ১৯১১ সালে ঐতিহাসিক জয়ী দলকে বাদ দিয়ে কিছুতেই শতবর্ষের শিল্ড আয়োজনের পথে আই এফ এ হাঁটবে না। সচিব প্রদ্যুত দত্ত অনেক চেষ্টা করেও মোহনবাগান কর্মকর্তাদের রাজি করাতে পারেননি। এ বারে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল আই এফ এ সচিবের। সিদ্ধান্ত নিলেন মোহনবাগানকে বাদ দিয়েই শিল্ডের খেলা হবে। শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল খেলেছিল। জোর লড়াই হয়েছিল ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে। ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর টাইব্রেকারে জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রসঙ্গত সে বছর ফাইনাল ম্যাচের আগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা ফুটবলারদের সমন্বয়ে একটা প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন। এই ঘটনাগুলোই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার সাক্ষ্য বহন করে। আই এফ এ সচিব হিসাবে এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছেন অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে থামানো যায়নি। আই এফ এ-র সম্মান রক্ষা বা মর্যাদা রাখার জন্য তিনি কখনও আপস করেননি। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন একরোখা।

অনেক গঠনমূলক কাজ করে গেছেন। নেহরু কাপের কথা আগেই বলেছি। নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে যে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে তার পিছনে তৎকালীন রাজ্য সরকার এবং ক্রীড়ামন্ত্রীর সদিচ্ছা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। পাশাপাশি নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছিল শিলিগুড়ি। নেহরু কাপের আগের শিলিগুলির পরিবেশ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন পরবর্তীতে গড়ে ওঠা এই শহরের পরিবর্তনের কথা। হ্যাঁ। পরবর্তীতে নিশ্চয়ই এই জেলা শহরে স্টেডিয়াম তৈরি হত। কিন্তু এই গঠনমূলক কাজটা আগেই হওয়ার জন্য সবার আগে প্রদ্যুত কুমার দত্তর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

স্বাধীনতার ৪০ বৎসর উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে নেহরু কাপকে বর্ণময় করে তুলেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ট্যাবলোতে।

অমলাশঙ্করের তত্ত্বাবধানে মনমাতানো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন স্টেডিয়ামে তো বটেই শহর জুড়ে শোনা যেত বাংলা এবং হিন্দিতে দেশাত্ববোধক গান। গানগুলো একসূত্রে বাঁধা হয়েছিল। এখন স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস এবং নেতাজির জন্মদিনে যে গানগুলো আমরা শুনি এক সুতোয় (ক্যাসেটে) বাঁধা

হয়েছিল নেহরু কাপের সময়। এই ব্যাপারটা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

নিজে যেমন চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসতেন সেরকম লড়াকু মানুষদের পছন্দ করতেন। যেমন সুভাষ ভৌমিককে ভীষণ পছন্দ করতেন। তিনি সচিব থাকাকালীন জর্জ টেলিগ্রাফের কোচিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সুভাষকে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ চার বছর দলের দায়িত্বে ছিলেন সুভাষ।

তিনি সচিব থাকাকালীন বাংলা প্রথম সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল ১৯৮৬-৮৭ সালে। সে বছর বাংলা দলের কোচ ছিলেন নিমাই গোস্বামী, সঙ্গে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর অরুণ সিনহা। তবে প্রদ্যুত দত্তর পছন্দ ছিলেন সুভাষ ভৌমিক। এই ব্যাপারে দল সামলাবার জন্য সুভাষকে তিনি ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘটনা হল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দল পরিচালনার ক্ষেত্রে সুভাষই সিদ্ধান্ত নিতেন। কোচিংয়েও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

কারণ পি কে যখন কোচ তখন ম্যানেজারের কাজটা তিনিই সামলে নেবেন। প্রসঙ্গত পি কে এবং অমল দত্ত দু-জনকে তিনিই প্রথম বাংলা দলের কোচ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি সচিব থাকাকালীন বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতেছে ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৯-৯০ সালে। কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি আয়োজন করেছেন ১৯৮৬-৮৭ সালে। সে বছর স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় সংহতির কথা মাথায় রেখে প্রধান অতিথি হিসাবে এনেছিলেন দুর্ভেদ্য ডিফেন্ডার জার্নেল সিং-কে।

ফুটবলাররা প্রদ্যুতদাকে দাদার মতো বিশ্বাস করতেন। ফুটবলারদের তিনিও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা জানাচ্ছি। ১৯৭৭ সাল, জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মনোরঞ্জনের দলত্যাগ মেনে নিতে পারেননি তাঁর প্রধান দুই সেনাপতি বাচ্চু গুপ্ত (শতদল) এবং পুঁটে ঘোষ। মনোরঞ্জনকে ধরে রাখার জন্য ওই দু-জন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি প্রদ্যুতদাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা মনোরঞ্জনের বাড়ি পর্যন্ত হানা দিয়েছিলেন। তবে দেখা পাননি। সঙ্গে গেলেও তাতে সায় ছিল না জর্জ-সচিবের। একদিন বাদে মনোরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ একজনকে ডেকে বলেছিলেন, 'মনোরঞ্জন যেন সই প্রত্যাহার না করে। ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুযোগ যেন হাতছাড়া না করে।' এক বছর বাদে মনোরঞ্জনকে ইস্টবেঙ্গল রাখবে না ভেবেছিল। তাদের টার্গেট ছিল মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্য। খবরটা কানে যেতেই প্রদ্যুতদা

আসরে নামলেন। কারণ, তিনি জানতেন ইস্টবেঙ্গল সুব্রতকে পাবে না। শেষ পর্যন্ত মনোরঞ্জনের কাছেই ইস্টবেঙ্গল ছুটে আসবে। তার মধ্যে মনোরঞ্জন যাতে ভুল করে দল ছাড়ে সেই আশঙ্কায় প্রদ্যুতদা নিজেই মনোরঞ্জনকে তাঁর বাড়িতে তুলে এনেছিলেন। সামান্য ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দেখা গেল সুব্রতকে না পেয়ে ইস্টবেঙ্গল ছুটে এল মনোরঞ্জনের কাছে।

এই ঘটনা দুটোই তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ। তাঁর সময়ে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে আরও দু-জন ফুটবলার সদর্পে জাতীয় দলে বিচরণ করেছেন দীর্ঘ দিন। রক্ষণভাগে অলোক মুখার্জি এবং মাঝমাঠে সত্যজিৎ চ্যাটার্জি। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ অলোক মুখার্জি এবং মাঝমাঠে সত্যজিৎ চ্যাটার্জি ১৯৮৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত একনাগাড়ে খেলেছেন মোহনবাগানে।

খ্যাতনামা প্রাক্তন ফুটবলার শান্ত মিত্র এবং সুভাষ ভৌমিকের কোচিং জীবন শুরু জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব থেকে। ১৯৭৬ সালে শান্ত মিত্র এবং ১৯৮৬ সালে সুভাষ ভৌমিককে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে কোচ হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রদ্যুত দত্ত।

জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে তাঁর হাত ধরে অনেক ফুটবলার এসেছেন। ফুটবলারদের কাছে তিনি ছিলেন যথার্থই একজন দাদা, অভিভাবকের মতো। ফুটবলারদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসা। তাঁদের মধ্যে বিশেষ জায়গা ছিল আক্রমণ ভাগের ফুটবলার মহম্মদ মুকিমের। মুকিমও তাঁকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করতেন।

ফুটবল জগতের বাইরে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতার লড়াকু, হার না মানা মনোভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মমতা আগামীদিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মমতার ওপর এতটাই আস্থা ছিল তৎকালীন আই এফ এ সচিবের। কথাটা তিনি বলেছিলেন আটের দশকের শেষ দিকে। প্রায় ২২/২৩ বছর বাদে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছিল। এতটাই দূরদর্শী ছিলেন তিনি।

সরাসরি রাজনীতি না করলেও মনে হয় একটু কংগ্রেস ঘেঁষা ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে অনেক অজানা কাহিনী শুনেছি। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে জ্যোতি বসু এবং কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়েকে দেশপ্রেমিক বলে মনে করতেন। বঙ্গীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বাংলার রূপকার ডা. বিধানচন্দ্র রায়।

‘কেমন দিলাম’

এই কথাটি তিনি প্রায় বলতেন, শুরুতেই সে কথা বলেছি। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা তুলে ধরছি। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হত। এরকম একদিন সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই আলোচনায় বিশাল জায়গা নিয়েছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। কথায় কথায় মহানায়ক অভিনীত ‘স্ত্রী’ ছবির প্রসঙ্গ এসেছিল। তিনি সিনেমাটা দেখেছিলেন। বললেন, ‘শুরুতেই উত্তমকুমারের পুজোটা লক্ষ করেছিস?’ নায়েব মশাই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও এসেছিল। তাঁর হিসাবের খাতা না দেখেই সই করতেন মাধব দত্ত-র চরিত্রে অভিনীত উত্তমকুমার। ঘটনাটা মনোযোগ সহকারে দেখেছিলেন সেটা বুঝলাম কয়েকদিন বাদেই। সেদিন অফিসে পৌঁছে দেখলাম যথারীতি ধবধবে সাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবী পরিহিত প্রদ্যুতদা আমাকে বলেছিলেন ‘দেখ তো, আমাকে মাধব দত্ত-র মতো লাগছে কি না? একটু বাদেই চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিহির কানুনগো হিসাবপত্র নিয়ে আসতেই বললেন, ‘দিন আজকে না দেখেই সব সই করে দেব।’ একেবারে মাধব দত্ত-র মতো।

তিনি ছিলেন ভোজনরসিক। প্রতিদিন বিকালে ‘আপনজন’ – দোকানের তেলেভাজা ছিল তাঁর খুব প্রিয়। সেই সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সময় একদিন বলেছিলাম বারাসাতের করুণাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের তেলেভাজা আপনজনের মতো সুস্বাদু। ছোটবেলায় দেখেছি ব্যারাকপুর থেকে ‘অ্যাংলো ইন্ডিয়ান’রা প্রায়ই বিকালে গাড়ি করে এসে করুণাময়ীর সুস্বাদু খাবার খেতেন।

আমার কথা শেষ হতেই ডাক পড়ল তাঁর সারথি শিপুজানের। বললেন, গাড়ি রেডি করো। আমাদের কয়েকজনকে বললেন চল। তাঁর পরনে ছিল সাদা পা-জামা এবং পাঞ্জাবী। গাড়িতে উঠে শিপুজানকে বললেন, ‘বারাসাত কলোনি মোড় চলো।’ সেখানে তৃপ্তি সহকারে আমরা সবাই খেলাম। প্রদ্যুতদা বাড়ির জন্য ঝুড়ি ভর্তি সিঙ্গারা, কচুরি এবং মিষ্টি নিলেন। নামার সময়ে আমার হাতে বাড়ির জন্য একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন।

প্রবল বর্ষার দিনে অফিসে গোবিন্দভোগ চাল এবং সোনা মুগ ডালের সমন্বয়ে খিচুরির ব্যবস্থা করতেই হত। সঙ্গে থাকত ইলিশ মাছ ভাজা।

জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কর্মীদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলছি। সেদিনটা ছিল সোমবার। সকালে খবর পেলেন যে অফিসের কর্মী অমর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। প্রতিদিন সকালে অমর ফাইল-কাগজপত্র সই করাতেন। সোমবারে অমরের অবর্তমানে

অন্য একজন কর্মী যখন সই করাবার জন্য ফাইল-পত্র নিয়ে হাজির হলেন, কলম হাতে প্রদ্যুতদা কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'না, আজ আমি সই করব না। আজ জর্জ টেলিগ্রাফের সব সেন্টারে ছুটি।' একজন সাধারণ কর্মীর প্রতিও এতটাই মমতা ছিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রারের। আই এফ এ - সচিব হওয়ার ক্ষেত্রে মেজদাদা বিশ্বনাথ দত্ত-র অনুগামীদের রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভোটে জিতেছিলেন। আই এফ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে লড়াই হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার কোনও প্রভাব পরিবারে পড়েনি। বিশুদা যখন অফিসে আসতেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন। এরকমই একদিন ৪বি অপূর্ব মিত্র রোডে বিশ্বনাথ দত্ত আসছেন খবর পেয়ে যখন চেয়ার ছেড়ে নেমে আসছেন, বিশুদা একটু মজা করেই বলেছিলেন, 'বেশি বাড় বেড়ো না।' একটু হেসে ছোট ভাই প্রদ্যুত দত্ত জবাব দিয়েছিলেন, 'বৃদ্ধ শাহজাহান বন্দি করে রাখব।' প্রথমবার নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বিশ্বনাথ দত্তর পার্ক সার্কাসের বাড়িতে পুত্র জয়কে (অনির্বাণ) কোলে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ছোট ভাই। বিশুদার কোলে জয়কে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'ইলেকশন, ইলেকশন। নাথিং অ্যাবাভ রিলেশন।'

বড় শ্যালিকার পুত্র দীপু ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী। ছোটবেলা থেকেই দীপু থাকতেন প্রদ্যুতদা-র স্ত্রী-র কাছে। সব সময়ই দীপু তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

বিরোধিতার জন্য সব কাজে কারও বিরোধিতা করতেন না। একটা ঘটনা বলছি। ১৯৮৮-৮৯ সালের ঘটনা। রাজ্যের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ থেকে শুরু করে কলকাতা লিগ এবং শিল্ডের খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সমস্যা তৈরি করেছিলেন। কিছু স্তাবক ক্রীড়ামন্ত্রীকে মিসগাইড করেছেন। এদিকে এরকমই কয়েকজন প্রায় প্রতিদিনই সুভাষ চক্রবর্তী সম্পর্কে মুখরোচক কিছু খবর বলতেন। তাঁদের কথা যে সবটাই সত্যি নয় বুঝেছিলেন বিচক্ষণ আই এফ এ সচিব। একদিন তো রি-অ্যাক্ট করে দু-জনকে বলেছিলেন, 'চুপ করো, সুভাষ হতে হিম্মত লাগে।' পরবর্তীকালে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই মধুর ছিল। সুভাষ চক্রবর্তী একবার অসুস্থ হওয়ার পরে ছুটে গিয়েছিলেন আই এফ এ সচিব।

ম্যাগাজিন করার শখ ছিল ১৯৭৭ সাল থেকে। তাঁর স্বপ্ন সফল করেছিলেন 'আজকাল' কাগজের সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে 'খেলার কথা' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। তিন বছর রমরমিয়ে প্রকাশের পর অবশ্য বিজ্ঞাপনের অভাবে পত্রিকা ১৯৮১ সালে বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত ১৯৭৮ থেকে ১৯৭৯ একটা সময়ে পত্রিকা ৭০ হাজার সার্কুলেশন ছিল। পরবর্তীতে

‘মেমসাহেব’ নামে একটি পত্রিকাও শুরু হয়েছিল।

আই এফ এ সচিব হিসাবে একটা ফুটবল অ্যাকাদেমি গড়ার স্বপ্ন ছিল। মধ্যমগ্রামের কাদিহাটীতে জমিও দেখেছিলেন। পি কে ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে সেই অ্যাকাদেমি গড়বেন ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন সফল করতে পারলেন না। অকালেই ঝরে গেলেন।

সবসময়ই তিনি ছিলেন প্রাণখোলা একজন মানুষ। তাঁর ড্রইংরুমে হাসি ঠাট্টা করেই সময় কাটাতেন। আবার এই মানুষটিই যখন স্নানাহার সেরে আই এফ এ বা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটদের দিকে রওনা দিতেন তখন তিনি ছিলেন একেবারে অন্য একজন। পুব আকাশের দিকে প্রণাম করে গাড়িতে ওঠার পর আর কোনও হালকা কথা শোনা যেত না তাঁর মুখ থেকে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমার ধারণা, এ আই এফ এফ-এর নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সরে দাঁড়ানো ব্যাপারটা তাঁকে ভীষণ আঘাত দিয়েছিল। দু-তিনজন নেতা গাছে তুলে মইটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবু কারও ওপর ক্ষোভ বা অভিমান প্রকাশ করেননি।

তাঁর অসুস্থতার খবর শোনার পর বিশ্বাস ছিল ঠিক সুস্থ হয়েই ঘরে ফিরবেন। কিন্তু ভাগ্য বলেও একটা কথা থাকে। এই ব্যাপারে ভাগ্য সহায়ক ছিল না।

তাঁর শেষযাত্রায় আমিও সঙ্গী ছিলাম। প্রায় সহস্রাধিক মানুষ তাঁর অন্তিমযাত্রায় সঙ্গী ছিলেন। তখন মনে হচ্ছিল মাথা থেকে ছাদটা সরে গেল। আর তিনি যেন আবার বলছেন ‘কেমন দিলাম।’

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৪

নতুন অনেক কিছু করেছেন প্রদ্যোত

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় দশ বছর। পঁচাশির মার্চ থেকে চুরানব্বইয়ের নভেম্বর। এই এক যুগ আই এফ এ এবং প্রদ্যোত দত্ত ছিলেন সমার্থক শব্দ। দেশের প্রাচীনতম ফুটবল সংস্থাটির সর্বেসর্বা হিসেবে রাজ্যের ফুটবলের উপর যে তাঁর ছিল সীমাহীন কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য তা পরবর্তী তিনটি নির্বাচনেই প্রমাণিত। যত দিন গিয়েছে, আই এফ এ থেকে প্রদ্যোত-বিরোধীরা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। গণতান্ত্রিক দেশে, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি বজায় রেখে এ রকম নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ইদানীং কালের কোনও ক্রীড়া প্রশাসক দেখাতে পারেননি। আর এর জন্য তাঁকে বারবার সংবিধান সংশোধন করতে হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের এক নম্বর খেলাটির এক নম্বর কর্তাটির বিরুদ্ধে গত দু বছর ধরেই একটা অভিযোগ ছিল, কলকাতার ফুটবলকে তিনি শেষ করে দিয়েছেন। দেখা যাক, চলে যাওয়ার মুহূর্তে বাংলার ফুটবলকে তিনি কী অবস্থায় রেখে গেলেন।

ট্রফি জয় যদি কোনও প্রশাসকের সাফল্যের মাপকাঠি হয় তবে প্রদ্যোত দত্ত সফল। ভীষণভাবে সফল। এই দশ বছরে ক্লাব ফুটবলের সর্বভারতীয় ট্রফিগুলিতে বাংলার ক্লাবগুলিরই রমরমা। ইস্টবেঙ্গলের ত্রিমুকুট জয়, মোহনবাগানের টানা তিনবার ফেড কাপ জয় সবই তাঁর আমলে। সন্তোষ ট্রফিতে সাফল্য তুলনায় কম। দশ বছরে তিনবার। অন্য বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলিতে বাংলার সাফল্য একেবারে ফেলে দেওয়ায় মতো নয়। জাতীয় দলে বাংলার ফুটবলারের সংখ্যা আগের মতোই অনেক। সচিব হওয়ার সময় বাংলার ফুটবল, সর্বভারতীয় [illegible] তার থেকে কমেনি। প্রদ্যোত নিজে অবশ্য সর্বভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে খুব বেশি দূর যেতে পারেননি। একবার সচিব পদে দাঁড়িয়ে হেরে যান।

সাংগঠনিক স্তরে আই এফ এ কিন্তু প্রদ্যোতের আমলে বেশ কয়েকটি কাজ করেছে যা এ দেশের ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয়। এশিয়ার প্রথম মেয়েদের ফুটবল লিগ চালু, অপেশাদার কাঠামোর ফুটবলারদের আর্থিক জরিমানা (যা এখন এ আই এফ এফ-ও চালু করেছে), তিন প্রধানের দাদাগিরি বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, মহমেডানকে সাসপেন্ড করা, মোহন-ইস্টকে জরিমানা করা, সুপার লিগ চালু করে বড় ক্লাবের ম্যাচ কমানো, আর্থিক স্বয়ংভরতা আনবার জন্য ডোনার মেম্বার চালু করা, অনূর্ধ্ব তেইশ ফুটবলারদের ট্রেনিং-এর জন্য ক্লাব অধিগ্রহণ, বিদেশি কোচ আনা, একেবারে ক্ষুদেদের জন্য এ দেশে প্রথম নার্সারি লিগ চালু, দলবদলের সময় ফুটবলারদের বায়নাক্কা রুখতে টোকেন সিস্টেম চালু, সর্বস্তরের ফুটবলারদের জন্য বীমার ব্যবস্থা, ছোট ক্লাবকে সাহায্য করার জন্য ট্রান্সফার ফি প্রবর্তন কিংবা লিয়েন প্রথা চালু করার চেষ্টার মধ্যে প্রমাণিত প্রদ্যোত দত্ত দশ বছর ঘুমিয়ে থাকেননি।

আর্থিক দিক দিয়ে আই এফ এ-কে প্রদ্যোত দত্ত খুব ভাল জায়গায় রেখে গেছেন, তা নয়। শুরুর দিকে ডোনার মেম্বার করে যে আটত্রিশ টাকা তুলেছিলেন, তা শেষ হয়ে গিয়েছে পরিস্থিতিতে নেহরু কাপ এবং কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি করতে গিয়ে। টুর্নামেন্ট থেকে লাভ বলতে শুধু বিরানব্বইয়ের ফেড কাপ। তবে সাম্প্রতিককালে লিগ এবং শিল্ডে স্পনসর পাওয়ায় অনেকটা ভাল আই এফ এ-র আর্থিক অবস্থা। বাড়ি বন্ধক দিয়ে নেহরু কাপ করেছিলেন। ব্যাঙ্কের সেই দেনা অবশ্য শোধ হয়েছে। খুচরো কিছু দেনা আছে। তবে তা শোধ করার মতো ক্ষমতা আছে আই এফ এ-র। পাশাপাশি লিগে পুরস্কার অর্থ চালু করে আধুনিকতার স্রোতে আই এফ এ-কে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয় প্রদ্যোতের পক্ষেই কথা বলবে।

ব্যর্থতা যদি থেকে থাকে তা হচ্ছে উত্তরসূরি তৈরি করতে না পারায়। আজ তাই তাঁর অবর্তমানে আইএফ এ-তে গুঞ্জন, এ বার কে? কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় বন্ধ। প্রদ্যোতের অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো লোকের বড়ই অভাব আই এফ এ-তে। ইদানীং তিনি আই এফ এ ছাড়াও অন্য ব্যাপারে সময় দিতেন। সংস্থার কাজ চালাতেন বাড়িতে বসেই। সেটা খুব বেশি ক্ষতিকর হয় না যদি দক্ষ উত্তরসূরি থাকত। দক্ষ টিমম্যান হিসেবে প্রদ্যোত, চলে যাওয়ার আগে [illegible] ঠিক মতো করে যেতে পারেননি। [illegible] দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে প্রদ্যোত বেঁচে থাকবেন একজন সৎ, বলিষ্ঠ, একরোখা এবং ফুটবলপ্রেমী প্রশাসক হিসেবে।

আজকাল

১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৪

আই এফ এ সচিব পদে লড়াই শুরু

আজকালের প্রতিবেদন: রাজা না মরতেই সিংহাসন ধরে টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিন আগেই। আর তাঁর মৃত্যুর খবর কলকাতায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই শোকের চাদর গায়ে জড়িয়ে সেই লড়াই শুরু করে দিলেন অনেকেই। প্রদ্যুৎ দত্তের পর আই এফ এ সচিব কে? তিনটি নাম-কে সামনে রেখে তিনটি গোষ্ঠী সক্রিয়। শোনা যাচ্ছে, ময়দানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা মন্টু ঘোষের পিছনে থাকছেন জগমোহন ডালমিয়া এবং তাঁর অনুগামী ক্লাবগুলো। কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জিকে সচিব হিসেবে দেখতে চায় মোহনবাগান লবি। এঁদের সঙ্গে ময়দানের কুখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতার নায়ক এবং প্রদ্যুৎ দত্তের অল্পসংখ্যক অনুগামী। আর বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র সুব্রত দত্তকে সচিব করার উদ্যোগ নিয়েছে মোহনবাগানের বলরাম চৌধুরি গোষ্ঠী, ইস্টবেঙ্গলের পল্টু দাস গোষ্ঠী এবং প্রদ্যুৎ দত্তের বেশিসংখ্যক অনুগামী। আই এফ এ-র সাধারণ নির্বাচন আগামী মার্চে। তার আগে মাঝের সময়টুকুতে কাজ চালানোর জন্য সচিব নির্বাচন করার অধিকার আছে গভর্নিং বডি সদস্যদের। তাঁরা আই এফ এ-র বাইরের কোনও ব্যক্তিকেও বাছতে পারেন।

নীরবতা পালন কেন, কৃশানু জানতেন না

আজকালের প্রতিবেদন: বাঙ্গালোর, ১৬ নভেম্বর— প্রয়াত প্রদ্যুৎ দত্তর প্রিয় ফুটবলার কৃশানু যে জানতেনই না, কেন নীরবতা পালন করা হচ্ছে। পরে খবর শুনে হতবাক। ম্যাচের ওই ফলাফলের পরেও সাংবাদিকদের ডেকে ডেকে খবর নিচ্ছিলেন, খবরটা সত্যি কিনা। মোহনবাগান মাঠে নামার আগেই অবশ্য প্রদ্যুৎ দত্তর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে যায়। বুকে কালো ব্যাজ পরে তাঁরা শ্রদ্ধা জানাল প্রয়াত আই এফ এ সচিবকে। সংগঠকরা খবর পেয়েই স্টেডিয়ামে গানের সুর বাজানো বন্ধ করে দেয়। একটা শোকপ্রস্তাবও নেওয়া হয়। ম্যাচ শুরু হয় নীরবতা পালন করে। প্রত্যেকেই শোকাহত। অলোক মুখার্জি বললেন, 'আমাকে তিনি দেখতেন নিজের ছেলের মত। জর্জে তিনিই আমায় সুযোগ করে দিয়েছিলেন।' তনুময়, শিশির, সত্যজিৎরা বলেন, 'বাংলার ফুটবলের ক্ষতি হল।' অঞ্জন মিত্র বলেন, 'মনে হচ্ছে আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে।'

যুগান্তর

JUGANTAR

১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৪

প্রদ্যোৎ দত্তর শেষকৃত্য সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএফএ সচিব প্রদ্যোৎ দত্তের অকাল প্রয়াণে এদিনও শোকে বিহ্বল ছিলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ ও অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। বুধবার রাতে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে তাঁর মরদেহ আসার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার রোল পড়ে যায় চারিদিকে। বিমানবন্দরে উপস্থিত আইএফএ কর্মকর্তারা কষ্ট করেও ধরে রাখতে পারছিলেন না নিজেদের। প্রয়াত ফুটবল সচিবের প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী।

প্রদ্যোৎবাবুর মৃতদেহে মাল্যদান করেন তিনি। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় অপূর্ব মিত্র লেনে প্রদ্যোৎবাবুর নিজ বাড়িতে। দুঃসংবাদ পেয়ে অনেক আগে থেকেই বাড়ির সামনে জড় হয়েছিলেন তাঁর আত্মীয়-বন্ধুবরা। শেষ দেখা দেখতে হাজির হয়েছিলেন অনেক সাধারণ মানুষও, যাঁরা প্রদ্যোৎ দত্তকে চিনতেন একজন ফুটবল-সংগঠক হিসাবে। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন পরিবারের লোকজন। প্রয়াত প্রদ্যোৎবাবুর দাদা বিশ্বনাথ দত্ত একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। 'ছোটবেলার কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। অমন্তু ফুটবলকে ভালবেসে গেল... এককোণে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছিলেন বিশ্বনাথবাবু।

নিজ বাড়িতেই সারারাত রাখা হয়েছিল প্রদ্যোৎবাবুর মরদেহ। সকাল হতেই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসতে থাকেন তাঁর সহকর্মী, বর্তমান ও অতীতের ফুটবলাররা। সকাল দশটা নাগাদ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জি আসেন অপূর্ব মিত্র লেনের বাড়িতে। মৃতদেহে মাল্যদান ছাড়াও বসেছিলেন প্রয়াত প্রদ্যোৎবাবুর স্ত্রী ও দুই পুত্রের পাশে। ঘনিষ্ঠ পরিবারবর্গের মাঝে তাঁকেও বলতে শোনা যায়, 'আমার এক ভাই চলে গেল। অপূরণীয় ক্ষতি হল উপমহা ক্রীড়াজগতের।' স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মমতা বলেন, ক্রীড়ামন্ত্রী থাকার সময় মাঝেমধ্যেই আলোচনায় বসতাম দু'জনে। কিভাবে জাতীয় ফুটবলের উন্নতি সম্ভব, তা নিয়ে কথাবার্তা হত। প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি, ফুটবলের নাম শুনলেই অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে পড়তেন তিনি। দুপুর বারোটা নাগাদ মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি থেকে অন্তিমযাত্রা শুরু হয়। আইএফএ অফিস, এআইএফএফ, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান, কর্জ টেলিগ্রাফ, সিআরএ, রেল ক্লাব ঘুরে কেওড়াতলা শ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। আইএফএ-তে সহসচিবগণ, এআইএফএফের সহসভাপতি অশোক ঘোষ, গোপীনাথ ঘোষ, ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে সহসচিব পল্টু দাস ও সভাপতি বি আর সেনগুপ্ত, মোহনবাগানে শৈলেন মান্না, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জি ও কোষাধ্যক্ষ অঞ্জন মিত্র মৃতদেহে মাল্যদান করেন। মহমেডানের সচিব মীর মহম্মদ ওমর ক্লাব থেকে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত অংশ নিয়েছিলেন শেষযাত্রায়। তাঁর দলের ফুটবলাররাও সবশেষে অন্তিম কায়দায় শ্রদ্ধা জানান। প্রশান্ত চক্রবর্তী ও কয়েকজন জুনিয়র ফুটবলার বুট জার্সি পরে মাল্যদান করেন মৃতদেহে। শকটে কফিনটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। পিছন পিছন যেতে থাকে বড়ো-ছোটটি প্রাইভেট কার, ম্যাটাডোর প্রভৃতি। এছাড়াও পায়ে হেঁটেও বহু সাধারণ মানুষ সামিল হয়েছিলেন শেষযাত্রায়।

বর্তমান

১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৪

চোখের জলে শেষ বিদায় প্রদ্যোৎ দত্তকে

স্টাফ রিপোর্টার : আই এফ এ সচিব প্রদ্যোৎ দত্তের মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। কালীঘাট ও ভবানীপুর দুই জায়গাতেই, যেখানে ওঁর বাড়ি ছিল, দেখা গেছে স্বজন হারানো বেদনাভরা পরিবেশ।

ময়দানে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠননের পক্ষে বহু মানুষ চোখের জলে প্রদ্যোৎ দত্তকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন। এর মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব অভিনব প্রথায় শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সিনিয়র ও জুনিয়র ফুটবলাররা খেলার পোশাক পরে আই এফ এ সচিবকে বিদায় জানায়। সেই সঙ্গে সকলে 'প্রদ্যোৎ দত্ত অমর রহে' শ্লোগানে ভরিয়ে দেন ময়দান। শেষে একটি ছোট্ট ছেলে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে জানিয়েছে তার শ্রদ্ধা।

এদিন বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষ থেকে ফুল, মালা ও পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

কালীঘাটের অপূর্ব মিত্র লেনে সকাল থেকেই ছিল বহু মানুষের ভীড়। ফলে প্রদ্যোৎ দত্তের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোতে এক ঘন্টা দেরি হয়। এখানে প্রয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন আই এফ এ সভাপতি অজিত সেনগুপ্ত ও ফুটবলার চুনী গোস্বামী, প্রসূন ব্যানার্জি, শ্যাম থাপা ও শান্ত মিত্র। এছাড়া বহু ক্লাব ও সংগঠনের প্রতিনিধি প্রদ্যোৎবাবুর বাড়িতে গিয়ে মালা দিয়ে জানিয়ে গেছেন শ্রদ্ধা। শেষ যাত্রা তদারকি করেছেন অশোক ঘোষ।

এক সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। উনি সকাল ১০টায় পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রদ্যোৎ দত্তর বাড়ি। শোকে মমতাদেবী বলে ওঠেন, 'আমার দাদার মতো ছিলেন। অনেক দিন ধরে চিনতাম। এ এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল।'

দুপুর ১২ টায় অপূর্ব মিত্র লেন থেকে লরি করে প্রদ্যোৎ দত্তের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ওঁদের ভবানীপুরের পুরনো বাড়িতে, কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে যাওয়া হয় শিয়ালদহ জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটে। এরপর গাড়ি আসে আই এফ এ অফিসে। ওখানে ২০ মিনিট শায়িত ছিল শবদেহ। আই এফ এ'র চার সহ-সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তারা চোখের জল সামলাতে সামলাতে প্রদ্যোৎ দত্তের মরদেহে মালা দেন।

এদিন বাংলার সাব-জুনিয়র কোচ অশোক চন্দও শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। 'সেইলে'র পক্ষে শ্রদ্ধা জানাতে মৃতদেহের উপর দিয়ে আসা হয় একটি ছোট ফুটবল।

এরপর মোহন বাগান ও ইস্ট বেঙ্গল তাঁবু ঘুরে গাড়ি যায় মহমেডান স্পোর্টিং তাঁবুতে। মোহন বাগানের পক্ষে শৈলেন মান্না ও সুব্রত ভট্টাচার্য এবং ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত ও পল্টু দাস মালা দেন। মহমেডান স্পোর্টিং-এর মীর মহম্মদ ওমর মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ফুটবলারদের পক্ষে শেষ বিদায় জানান প্রশান্ত চক্রবর্তী। ওমর সারাক্ষণ মিছিলের সঙ্গে ছিলেন।

মহমেডান স্পোর্টিং তাঁবুর পর মৃতদেহ জর্জ টেলিগ্রাফ ও কলকাতা রেফারি তাঁবু হয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে চলে যায়। বিকাল সাড়ে চারটেয় শোকের মিছিল ময়দান ছেড়ে বেরোয়। শ্মশানে পৌঁছায় চারটে বেজে ৫৫ মিনিটে।

এদিকে জানা গেল, ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বুধবার রাতে এয়ারপোর্টে প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও এদিন মালা দেওয়া হয়েছে। মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব, স্পোর্টস ফটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ও রাজ্য কবাডি সংস্থার পক্ষ থেকে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৪

৺গঙ্গা

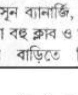

গত ১৬ নভেম্বর **প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত** আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর এই আকস্মিক প্রস্থানে আমরা মর্মাহত।

গত ১৭ নভেম্বর তাঁর শবযাত্রায় বহু গুণমুগ্ধ ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরই মতো সমব্যথী বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সেই বিষাদের মুহূর্তে শবানুগমন করে এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে আমাদের শোকার্ত হৃদয়ের বেদনার অংশীদার হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমরা আপনাদের প্রত্যেককেই এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

আগামী রবিবার ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৪ তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাই।

—**শোকার্ত পরিবারবর্গ**

৩১৪, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা - ৭০০ ০২৬

:শ্রাদ্ধবাসর:

'শিল্পা প্যালেস', ১৩এ, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড,
কলিকাতা - ৭০০ ০১৯
(বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের বিপরীতে।)

-: শ্রাদ্ধানুষ্ঠান :-
সকাল ৮ ঘটিকায়।

-: প্রীতিভোজন :-
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়।

বর্তমান

২১শে আগস্ট, ১৯৯৪

ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন
পশ্চিমবঙ্গ

আই এফ এ গভর্নিং বডির একটি জরুরী মিটিং আগামী ২২-৮-৯৪ (সোমবার) সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হইবে। আই এফ এ অফিসে।

বিষয়:— ওয়ার্ল্ড কাপ টিকিট সম্বন্ধে মোহন বাগান নিয়ে চিঠি।

প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত
অবৈতনিক সচীব আই এফ এ

ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন
পশ্চিমবঙ্গ

আই-এফ-এ গভর্নিং বডির একটি জরুরী মিটিং আগামী ২২-৮-৯৪ (সোমবার) সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হইবে। আই এফ এ অফিসে।

বিষয়:- মোহন বাগান ক্লাবের মহিলার সম্পর্কে এ আই এফ এফ-এর সভাপতির চিঠি।

প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত
অবৈতনিক সচীব আই এফ এ

সংবাদ প্রতিদিন
১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৪

একজন অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষের প্রস্থান

জয়ন্ত চক্রবর্তী

মঙ্গলবার রাত এগারটা নাগাদ বিশেষ একটি প্রয়োজনে টেলিফোন করেছিলেন আই এফ এ-র অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট রণজিত গুপ্ত। কথাপ্রসঙ্গে প্রদ্যোত দত্ত-র অসুস্থতার বিষয়টিও এল। রণজিতবাবু বললেন—"একটা সুখবর দিই, প্রদ্যোতদা আউট অব ডেঞ্জার। আর ভয় নেই। দিল্লিতে টেলিফোন করেছিলাম। আজ বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন।" রণজিতবাবুর জানা ছিল না যে আর কয়েকঘণ্টার মধ্যে জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হবে প্রদ্যোত দত্তর। প্রদীপ নিভে-যাওয়ার আগেই তো শেষবারের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে। মাত্র সপ্তাহ তিনেক আগে দিল্লির ময়ূর-মহলে প্রদ্যোতদার বাড়িতে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম—বোধহয় তার থেকেও বেশি জরুরি ছিল যে আই এফ এ সচিবের পদটি সত্যি সত্যিই তিনি ছাড়ছেন কিনা তা জানা। প্রদ্যোতদা বলেছিলেন—"একেবারে নিশ্চিত করে লিখে দিও না। কিন্তু আমি সচিবের পদ ছাড়ছি। ওরা আমাকে ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু আমি কন্টিনিউ করতে চাইছি না। কোনও কাজই যখন করতে পারছি না তখন শুধু শুধু অর্নামেন্টাল সেক্রেটারি হয়ে কি হবে? তাছাড়া একটা হতাশাও কেমন যেন আমাকে গ্রাস করেছে। বোধহয় শরীরের জন্যই এটা হয়েছে।" এরপরই প্রদ্যোত দত্ত-র স্বভাবসুলভ রসিকতার ঝোঁকটি হঠাৎই যেন খাপ থেকে বেরিয়ে এল—"একটা স্কুপ দিচ্ছি তোমাকে। আই এফ এ-র দু'জন কর্তা আগামীকালই আমার এখানে আসছেন। আমাকে বোঝাবার জন্য। নাও খবর করো।" প্রদ্যোত দত্ত-র দেওয়া শেষ "স্কুপটি" প্রতিদিন করেছিল। আমাদের কাগজেই খবর বেরিয়েছিল যে প্রদ্যোত দত্ত যাতে সচিবের পদে থাকেন তার জন্য তাঁকে বোঝাতে দিল্লি গেলেন আই এফ এ-র দুই কর্তা রণজিত গুপ্ত আর দেবু মুখার্জি।

প্রদ্যোতদা আই এফ এ-র সচিব পদে আসার পর থেকে এইরকম অনেক স্কুপই আমাকে দিয়েছেন। অস্বীকার করব না যে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ক্রীড়া প্রশাসক আর সাংবাদিকদের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেকটা কাছের হয়ে গিয়েছিল। অথচ ব্যাপারটা এইরকম হওয়ার কথা ছিল না। প্রদ্যোত দত্ত আই এফ এ-তে ক্ষমতায় আসার পর আমি তখন যে কাগজে কাজ করি সেই "যুগান্তরে" আই এফ এ-র নানা গলদ, নানা বিচ্যুতি সম্পর্কে নিয়মিত খবর বের হত। প্রদ্যোত দত্ত-র বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে তখন পরিচিত অশোক ঘোষ-প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি লবিটি। প্রদ্যোত দত্ত-র লোকজন আমাকে অকারণেই অশোক ঘোষ-প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি গোষ্ঠীর সমর্থক বলে ধরে নিয়েছিলেন। আই এফ এ অফিসে গেলেই শুনতে হত—"ওদের গ্রুপের সাংবাদিক এসে গেছে।" বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে আই এফ এ-র বিরুদ্ধে কোনও খবর লেখা হলে সবার আগে যে ভদ্রলোক অভিনন্দন জানাতেন এবং বলতেন—ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে

অ্যালবাম থেকে... : প্রদ্যোৎ দত্ত ও অশোক ঘোষ

ঠিক করেছ—তাঁর নাম প্রদ্যোত দত্ত। শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ করার সময় কার্যত দেনার দায়ে ডুবে গিয়েছিল আই এফ এ। শেষপর্যন্ত সুতারকিন স্ট্রিটের আই এফ এ-র বিল্ডিংটি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছে মর্টগেজ দিয়ে আই এফ এ টাকা নেয়। এক সোর্স মারফৎ খবর পেয়ে ইউ বি আই-এর শীর্ষস্থানীয় এক অফিসার, বোম্বাই ফিল্মের এক জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক জামাতার সঙ্গে যোগাযোগ করে খবরটা কনফার্ম করি। কাগজে খবরটা বের হওয়ামাত্র হইচই শুরু হয়ে যায়। বিধানসভায় প্রশ্ন ওঠে। আই এফ এ-তে প্রদ্যোতদার লোকেরা খবরটা মিথ্যা বলে হাওয়া তুলে দেয়। কিন্তু আবার আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রদ্যোতদাই টেলিফোনে জানান যে খবরটা একশোভাগ সঠিক। তবে, তাঁকে যেহেতু ব্যাপারটা "ডিফেন্ড" করতে হবে, তাই গভর্নিং বডির সভায় তিনি "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" ভঙ্গিতে তিনি ব্যাপারটি পেশ করবেন একটু ঘেরাটোপের মধ্যে রেখে। অতঃপর তাঁর অনুরোধ ছিল বাংলার ফুটবলের স্বার্থেই এই নিয়ে আর লেখালেখি না করার জন্য। কারণ দেনাটি তিনি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। কথা রেখেছিলেন প্রদ্যোত দত্ত। ইউ বি আইতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে আই এফ এ তাদের মর্টগেজ সংক্রান্ত দেনা অনেকটাই মিটিয়ে ফেলেছে।

সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে প্রদ্যোত দত্ত-র জুড়ি মেলা ভার ছিল। মহামেডানকে সাসপেন্ড করে তাদের বি-গ্রুপে নামিয়ে দেওয়ার মতো সাহস তিনি দেখাতে পেরেছিলেন। বড় দলের ফুটবলারদের "মিস-কন্ডাক্টের" জন্য তাঁদের সাসপেন্ড কিংবা জরিমানা করার রাস্তাটিও তিনি খুলে দেন। একটু "অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা" ছিল বলে প্রদ্যোত-দা অনেক সময় তড়িঘড়ি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনগত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আই এফ এ-কে এর জন্য কিছু অসুবিধার সামনেও পড়তে হয়। কিন্তু প্রদ্যোত দত্ত সচিব হয়ে আসার পর আই এফ এ-তে একটা সময়ে যে কাজের জোয়ারটি এসেছিল তা নিঃসন্দেহে দারুণ। নানা নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন করেছিলেন প্রদ্যোত দত্ত। তার অনেকগুলোই হয়ত রূপায়িত হতে পারেনি—কিন্তু পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল।

ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে প্রদ্যোত দত্ত সফল ছিলেন নাকি বিফল, দারুণ কিছু নাকি "মিডিওকার"—তা বিচার করার কোনও প্রয়োজন নেই—কিন্তু বাস্তবিক অর্থেই এটা ঘটনা যে প্রদ্যোত দত্ত কিছু করতে চেয়েছিলেন। ফুটবলের জন্য ভাল কিছু। গটআপ দূর করার চেষ্টায় তিনি এমন কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন যেগুলোকে স্বাগত না জানাবার কোনও কারণ ছিল না। উত্তরপর্বে সেই পদ্ধতিই কার্যকর হয়েছে ফুটবলে উন্নত অনেক দেশে।

প্রদ্যোত দত্তর মধ্যে লড়ে যাওয়ার একটা মানসিকতা ছিল। এমনকি ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সরাসরি নীতিগত লড়াইয়ে নামতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। পরে অবশ্য ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সমঝোতা করে নেন। তবে, বিনা যুদ্ধে মাটি ছাড়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এর জন্য অনেক সময় তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অসুবিধাতেও পড়তে হয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রদ্যোতদার সম্পর্কটি ছিল অনেক কাছের। তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা থাকা মানেই ছিল হাসিতে, কটাক্ষে, মজায় কাটানো। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বোম্বাই নির্বাচনে প্রদ্যোত দত্ত লড়ে গেলেন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির বিরুদ্ধে আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবকে খাড়া করে। বোম্বাইয়ে নির্বাচনের আগের দিন প্রদ্যোতদাকে বললাম—"আপনি হারছেন। প্রিয়বাবু তাঁর ক্যাম্পে ভোটারদের অনেক বেশি সংখ্যায় জোগাড় করে ফেলেছেন।" আমার কথা শুনে প্রদ্যোতদা টেলিফোন তুললেন। একটা নম্বর ডায়াল করে বললেন—"পি এম জী হ্যায়? উনকো বোলিয়ে প্রদ্যোত দত্ত লাইন মে ইন্তেজারমে হ্যায়।"

বাস এইটুকুই। নিছকই ঠাট্টা। কিন্তু অনেক সাংবাদিকই লিখে ফেললেন যে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের বিরুদ্ধে লড়ার ব্যাপার থেকে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। প্রদ্যোতদা বলেছিলেন—"কেমন দিলাম?" বোম্বাইয়ের ইলেকশনে হারার পর প্রদ্যোত দত্ত দীর্ঘদিন আই এফ এ-র কাজকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলাম—"কেন এমন করছেন। পরাজয়টা মেনেই নিন না।" প্রদ্যোতদার রসিকতাপূর্ণ জবাবটি ছিল—"মেনে কি আর কেউ নেয়? সইয়ে সইয়ে মানতে হয়।"

আমি নিশ্চিত, নিজের শহর থেকে দূরে, রাজধানী দিল্লিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় প্রদ্যোতদা যদি সজ্ঞানে থেকে থাকেন—তাহলে তিনি শিওরই একবার অস্ফুট কণ্ঠে বলেছেন—কেমন দিলাম।

আজকাল
১৭ই মে, ১৯৯৫

বানিয়েছেন মহিলা ফুটবলার বন্দনা পাল

প্রদ্যুৎ দত্তর মূর্তি বসছে আই এফ এ দপ্তরে

[illegible]

সংবাদ প্রতিদিন

১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৪

ফুলে-মালায়, চোখের জলে শেষ বিদায় জানাল ময়দান

পার্থ দত্ত : তিনি আসবেন তাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আই এফ এ জুড়ে ছিল ব্যস্ততার ছোঁয়া। ১১/১, সুতারকিন স্ট্রীটের আই এফ এর অফিসে গত কয়েক বছর ধরেই তিনি আসতেন খুবই কম। তবু যখনই আসতেন তখনই আই এফ এর কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সব কর্মীদের মধ্যেই দেখা যেত ব্যস্ততা ও কিছুটা সন্ত্রস্ত ভাবও। বৃহস্পতিবার দুপুরেও আই এফ এ অফিসে এই একইরকম পরিবেশ ছিল সচিব প্রদ্যোৎ দত্তকে শেষ বিদায় জানানোর প্রাক্কালেও। এদিন সকাল থেকেই আই এফ এ কর্মীরা নিপুণহাতে সেরে ফেলেছিলেন তাঁদের প্রিয় সচিবকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা। দুপুর বারোটা থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতীক্ষার পালা। কালীঘাটের অপূর্ব মিত্র রোডের বাসভবন থেকে বেরিয়ে ভবানীপুরে তাঁর আদিবাড়ি ঘুরে শিয়ালদহে জর্জটেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হয়ে তাঁর মুখ্য কর্মকেন্দ্র আই এফ এ অফিসে পৌঁছনোর কথা ছিল বারোটার মধ্যেই। তাই বেলা বারোটার বহু আগেই তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী ভিড় জমিয়েছিলেন আই এফ এ অফিসে। তাঁর পৌঁছতে দেরী হচ্ছিল কিন্তু প্রতীক্ষারত কয়েক'শ গুণগ্রাহী কেউই উতলা হয়ে পড়েননি, বরং নীরবেই তাঁরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে ছিলেন তাঁর আসার। বারোটার পর ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলে। অবশেষে তিনি এলেন তখন ঘড়িতে ঠিক একটা পঁচিশ। ফুলে ফুলে ঢাকা একটা লরিতে উঁচু প্লাট ফর্মের ওপর চিরশায়িত প্রদ্যোৎ দত্তের দেহটা আই এফ এ অফিসের সামনে আসতেই প্রতীক্ষারত মানুষেরা আবেগ বিহ্বল হয়ে উঠলেন। ৫১ বছর বয়সী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রদ্যোৎবাবুকে চিরশয্যায় ফুল চন্দনে ঢাকা অবস্থায় দেখা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তবু বহুকষ্টে আবেগ সংবরণ করে তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে প্রদ্যোৎবাবুকে শেষ বিদায় জানানোর অনুষ্ঠান শুরু করেন। আই এফ এর প্রাক্তন সভাপতি অজিত সেনগুপ্ত প্রথমে শব দেহে মালা দেন। এরপর একে একে আই এফ এর সব কর্তা ও কর্মীরা মালা দেন। মালা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আই এফ এর সহসভাপতি রঞ্জিত গুপ্ত ও সহসচিব দেবু মুখার্জি। এ দুজনের আকুল কান্নার স্বরে উপস্থিত শ'পাঁচেক মানুষ কেউই চোখের জল সংবরণ করতে পারেননি। ঝাপসা চোখেই তাঁরা শেষ বিদায় জানান তাঁদের প্রিয় সচিবকে।

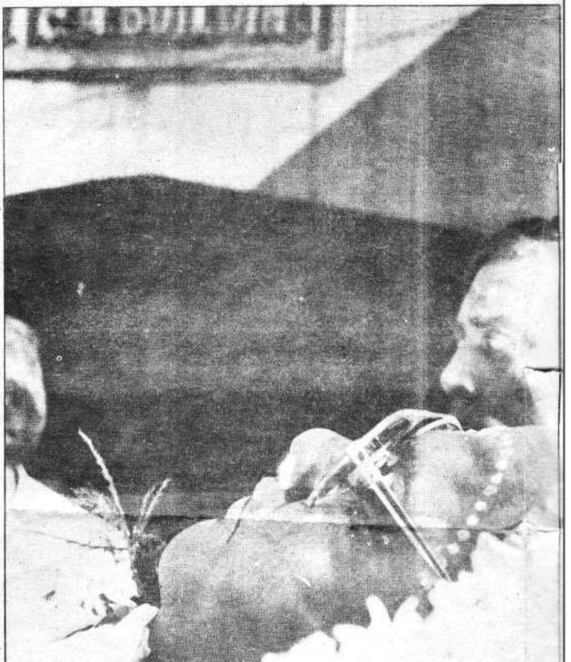

আই এফ এ অফিসে শেষবারের মত প্রদ্যোৎ দত্ত

ছবি : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এদিন সকালে অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়ি থেকে প্রদ্যোৎ দত্তের শেষ যাত্রা শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে। সকাল এগারোটায় শেষ যাত্রা শুরু হবার কথা থাকলেও তা শুরু হয় প্রায় বারোটায়। অপূর্ব মিত্র রোডের এই বাড়িতেই এদিন সকাল থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যান—চুনী গোস্বামী, শান্ত মিত্র, মানস মুখার্জি, অশোক ঘোষ, অঞ্জন মিত্র, শঙ্কর ভৌমিক, প্রসুন ব্যানার্জি, রঘুনাথ দে, মিলন দত্ত, হারাধন ব্যানার্জি, চন্দ্রনাথ চাটার্জি মমতা ব্যানার্জি প্রমুখ। চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি যুবনেত্রী মমতা। প্রদ্যোৎ দত্ত তাঁর বড় কাছের মানুষ ছিলেন। মমতা জানালেন, বুধবার বহরমপুরে জনসভায় প্রদ্যোৎ দত্তের মৃত্যুর খবরটা পেয়ে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। বিশ্বাস করার পরও তাঁর পক্ষে ওই মুহূর্তে কলকাতায় ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। রাতে কলকাতায় ফিরেই তিনি প্রদ্যোৎ দত্তের বাসভবনে চলে আসেন শেষশ্রদ্ধা জানাতে। অশ্রুরুদ্ধ মমতা আরও বললেন, ১৮ নভেম্বর তাঁর দিল্লি গিয়ে প্রদ্যোৎবাবুকে দেখতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু প্রদ্যোৎবাবু তাঁকে সেই সুযোগ আর দিলেন না। বেলা বারোটা নাগাদ অপূর্ব মিত্র রোডের বাড়ি থেকে শেষ যাত্রা শুরু হয়ে প্রথমে তা যায় ভবানীপুরে তাঁর আদি বাসভবনে। সেখানে থেকেই শোকমিছিল রওনা হয় শিয়ালদহে জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের দিকে।

আই এফ এ অফিস থেকে বিশাল মিছিলটা চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হয়ে রানী রাসমণি রোড দিয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বি ও এবং এ আই এফ এফ অফিসে হাজির হয়। এখানে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রদ্যোৎ দত্তকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, অশোক ঘোষ, তরুন দত্ত, ভোলানাথ ঘোষ, বাবলু দে, নীন মিত্র, অমিয় নন্দী, স্বপন চক্রবর্তী সহ বহু কর্মকর্তা। এখান থেকে শোকমিছিল এগিয়ে যায় সি এ বি'র দিকে। সেখানে প্রয়াত আই এফ এ সচিবকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সি এ বি'র কার্যকরী সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া সচিবদ্বয় বিক্রম মিত্র, প্রবীর মুখার্জি, সি এ বি থেকে গোষ্টপাল সরণী ধরে প্রদ্যোৎবাবুর শবযাত্রা থামে মোহনবাগান তাঁবুর সামনে। সেখানে একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শৈলেন মান্না, প্রসুন ব্যানার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, অঞ্জন মিত্র, বলরাম চৌধুরীরা। মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গল। এবার শোকমিছিলে সামিল সুব্রত, প্রসুন, শৈলেন মান্না সহ বহু মোহনবাগানী। ইস্টবেঙ্গল তরফ থেকে মাল্যদান করেন ক্লাব সভাপতি ডাঃ বি আর সেনগুপ্ত সহসচিব পল্টু দাস। ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম কর্তা স্বপন বল প্রদ্যোৎবাবুর দেহ লাল-হলুদ পতাকায় মুড়ে দেন। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের থেকেও প্রদ্যোৎবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপারে এগিয়ে গেল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অসুস্থ ক্লাব সচিব মীর মহম্মদ ওমরের উপস্থিতিতে বেশ কিছু ফুটবলার খেলার পুরো পোশাক পরে প্রদ্যোৎ দত্ত অমর রহে, অমর রহে, ব্যানার নিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। ফুটবলার প্রশান্ত চক্রবর্তী ক্লাবের পক্ষ থেকে মালা দেন। শোকমিছিলে যোগ দেন ওমর। মহামেডান থেকে বেড়িয়ে শোকযাত্রা জর্জটেলিগ্রাফ, কালিকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন, অল এয়ারলাইন্স ক্লাব ছুঁয়ে রওনা হয়ে যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানের পথে।

প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে কার্যনির্বাহী সম্পাদক স্বপন বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলকাতা -১০

The Telegraph

18th November, 1994

IFA looking out for a new boss

BY A STAFF REPORTER

Calcutta, Nov. 17: The search is on for a suitable man. The death of Indian Football Association (IFA) secretary Prodyut Dutta has send feelers flailing for a replacement, and there are some names already floating around for consideration.

Prodyut Dutta's term was to have ended in March 1995. According to the association' constitution, its governing body will now have to meet soon to nominate someone for the interim period, from within the association, or even without.

The names doing the rounds range from former president Ajit Sengupta to senior assistant secretary Ranjit Gupta, to even former secretary Ashoke Ghosh. The problem with Mr Sengupta, a retired high court judge, is a matter of protocol. It is heard that one would not be too interested in paying his respects to a man of such stature any more, in case Mr Sengupta decides to adorn the secretary's chair after having spent eventful years as president.

Similar is the case with Mr Ghosh. Which leaves Mr Gupta for the job. But Messrs Sengupta and Ghosh could go in for the president's post as well, in which case Mr Raghunath Dey will have to tender his resignation. Which, again, is not unlikely, however strange that may seem.

Overall, though, one sees the strengthening of the hands of the big clubs, who had been kept on a rather tight leash so far. Their contention that the IFA is because of them and not vice-versa, will receive the benefit of new, improved muscle. The selection of the interim secretary will bring much of the latent lobby strengths into focus.

All this becomes important, what with the IFA Shield starting off, and a general level of administration necessary.

The cremation: Meanwhile, the mortal remains of Prodyut Dutta were consigned to the flames at the Keoratala crematorium here today after being taken around the Maidan in a procession for the football lovers to pay their homage.

Dutta's last journey began from his house in Kalighat where former IFA president, Mr Ajit Sengupta, noted footballer Prasun Banerjee along with Congress (I) MP Mamata Banerjee paid floral tributes.

The body was then taken in a procession to the IFA office via the George Telegraph Institute in Sealdah. Senior IFA officials including the four joint secretaries laid wreaths on the body, which arrived in the city late in the evening yesterday.

The BHA office remained closed today as a mark of respect to Dutta.

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৪

শেষযাত্রায় প্রদ্যোতের সঙ্গী কলকাতার গোটা ময়দান

সংবাদ প্রতিদিন

১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৪

শোকসভা কবে, ঠিক করেনি আই এফ এ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রদোত দত্তর শোকসভা কবে হবে, তা নিয়ে আই এফ এ এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। আগামী সপ্তাহের প্রথমদিকেই আই এফ এ-র সভাপতি রঘুনাথ দে এক্সিকিউটিভ কমিটির মিডিঙ ডাকছেন। সেখানেই ঠিক হবে কবে শোকসভা হবে।

এদিকে সচিব ছাড়া আই এফ এ কিভাবে চলবে তা নিয়ে সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা এখনই কিছু ভাবতে চাইছেন না। সবাই আপাতত শোকসভার ব্যাপারেই ভাবছেন। তবে আই এফ এ কিছু না ভাবলেও বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন বৃহস্পতিবার বন্ধ ছিল। এবং তাদের পক্ষ থেকে শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটেয় নিজস্ব অফিসে প্রদোত দত্তের শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রদ্যোৎ দত্তের মৃত্যুতে শুধু যে ক্রীড়ামহল শোকহত তা নয়। মন্ত্রীমহলকেও ব্যাপারটা নাড়া দিয়েছে। বুধবার বিমানবন্দরেই প্রদ্যোৎ দত্তের মরদেহে ফুলের মালা দেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। আর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর প্রতিনিধি প্রদোৎ দত্তর মরদেহে মালা দেন।

প্রদ্যোতের মৃত্যুতে শিলিগুড়িতে শোক

বি বাৎসব, শিলিগুড়ি : আই এফ এ সচিব প্রদ্যাৎ দত্তের অকাল প্রয়াণে শিলিগুড়ি ক্রিড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর আত্মার প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। পরিষদের পক্ষে এখানকার স্টেডিয়াম কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার প্রয়াত প্রদ্যোৎবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর পরিবারের প্রতি একটি শোক বার্তাও পরিষদের তরফে পাঠানো হয়েছে। পরিষদের সভাপতি পীযূষ কান্তি বোস বলেছেন যতদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থাকবে, ততদিন প্রয়াত দত্তের প্রচেষ্টায় এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। শিলিগুড়ির মেয়র তথা স্টেডিয়াম কমিটির সম্পাদক বিকাশ ঘোষ বলেছেন, দেশ হারালো এক দক্ষ ক্রীড়া সংগঠককে এবং তিনি হারালেন তাঁর এক ব্যক্তিগত বন্ধুকে। এই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম তার শিলিগুড়িকে ভালবাসার প্রতীক। অন্যদিকে প্রয়াত দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। এটি থাকবে তিনদিন।

সংবাদ প্রতিদিন

১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৪

প্রদ্যোত দশক

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৮৫ সালের ৪ এপ্রিল ১৯৯৪ সালের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত টানা দশ বছর আই এফ এ সচিব পদে থেকে প্রদ্যোত দত্ত বাংলার ফুটবলে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালিয়েছেন। হয়তো তাঁর সব পদক্ষেপ সঠিক হয়নি, সব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি তবুও বাংলার ফুটবলের জন্য তিনি যা যা করে গেছেন তার তালিকাটা কম নয়। তাঁর নেওয়া সেরা পদক্ষেপগুলি হল :

● ১৯৮৫ সালে সচিব হবার পরই তিনি 'আই এফ এর আর্থিক তহবিল মজবুত করার জন্য ডোনার মেম্বারশিপ চালু করেন। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সি এ বি-র) অনুকরণে তিনিও আই এফ এতে ডোনার মেম্বার নেওয়া শুরু করেন। এই ডোনার মেম্বাররা সারা বাংলায় সব জায়গাতেই বিনা মূল্যে ফুটবল ম্যাচ দেখার সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। প্রায় পাঁচ হাজার ডোনার মেম্বার নেওয়ায় আই এফ এর তহবিল মজবুত হয়।

● ১৯৮৭তে অসদাচরণের জন্য কলকাতার তিনপ্রধানের এক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে একবছর সাসপেন্ড করে প্রমাণ করেছিলেন তিনি কতোটা কড়া ধাতের ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্তা।

● ১৯৮৭ থেকেই তিনি চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন কিভাবে ফুটবলকে জেলার মাঠেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই চিন্তাভাবনার ফসলই ১৯৮৮তে নেহরু গোল্ড কাপ শিলিগুড়িতে করা। এই শিলিগুড়িতে এতোবড় টুর্নামেন্ট করতে তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

● কলকাতার ফুটবল লিগকে আরও বর্ণময় করে তুলতে তিনি সুপার ডিভিসন প্রবর্তন করেন।

● লিগে গট-আপ রুখতে ম্যাচ জিতলে তিন পয়েন্ট ও ড্র করলে এক পয়েন্ট দেবার ব্যবস্থা তাঁর আমলেই হয়।

● সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর উদ্যোগেই প্রথম ১৯৯৩ থেকে মেয়েদের ফুটবল লিগ শুরু হয়। ১৯৯৪-এ মহিলা রেফারি ম্যাচ পরিচালনা করাও শুরু করেন।

"অপূরণীয় ক্ষতি আপোষহীন চরিত্র"

বিশ্বনাথ দত্ত : আই এফ এর কোষাধ্যক্ষ এবং পরে সংস্থার সচিব এবং এ আই এফ এফ কর্মসমিতির সদস্য প্রদ্যোত দত্তর অকাল প্রয়াণে ভারত তথা বাংলার ফুটবলের প্রশাসনিক মহলে একটি গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হল। বাংলার ফুটবলের জন্য প্রদ্যোত দত্তর অবদান এখানকার ফুটবল অনুরাগীরা চিরকাল মনে রাখবেন। প্রয়াত প্রদ্যোত দত্তর আপোষহীন মনোভাব, আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। তাঁর বলিষ্ঠ মানসিকতা বাংলার ফুটবলে একটা নতুন দিগন্তের ঘর খুলে দিয়েছিল। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি : প্রদ্যোত দত্তের মৃত্যুতে শুধু আই এফ এ-র নয়, এ আই এফ এফের বিরাট ক্ষতি হল। বলা যায়, বাংলার ফুটবল প্রশাসনের এক স্তম্ভ চলে গেলেন। ফুটবলে তাঁর অবদান দেশের ফুটবলপ্রেমীরা চিরদিন মনে রাখবেন।

অশোক ঘোষ : প্রদ্যোতকে আমি কখনও ওর নাম ধরে ডাকিনি। ডাকতাম দুলু বলে। ওর মৃত্যুতে বলতে পারেন, আমি খেলার জগতের ছোট ভাইকে হারালাম। পঁচাশিতে আমি যখন আই এফ এর সভাপতি হই, তখন দুলু ছিল সচিব পদে। কোনওদিন ওকে আপসের পথে যেতে দেখিনি। হার না মানা মনোভাবটিই ছিল ওর প্লাস পয়েন্ট।

টুটু বসু : খবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিশ্বাস না করার মতই খবর। আই এফ এর শতবার্ষিকীতে এরকম একটা খবর শুনবো আশা করিনি। প্রদ্যোতদার মৃত্যুতে বাংলার ফুটবল মহলে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হল।

পল্টু দাস : আই এফ এতে প্রদ্যোত দত্তের মতো ব্যক্তিত্ব আর আসবে না। সাড়া জাগিয়ে সচিব পদে আসার পর প্রথম তিন বছর নানা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিলেও পরে সহযোগী বাছার কাজটা ভালভাবে করে উঠতে পারেননি। ফলে, আই এফ এ সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। তবে, তাঁর মত ব্যক্তিত্ব এদেশে বিরল।

মন্টু ঘোষ : ১৯৮২ সালে প্রদ্যোতবাবু যখন আই এফ এর কোষাধ্যক্ষ পদে এলেন আমি তখন সহসচিব। দীর্ঘদিন এরপর আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি। তবে কাজ করতে গেলেই মতের অমিল হয়। আমার সঙ্গেও প্রদ্যোত দত্তের সেই মতবিরোধ শুরু হয় গতবছর থেকে। মতবিরোধ হওয়ার জন্য ময়দানে আমাকে অনেকেই প্রদ্যোত দত্ত বিরোধী বলে মনে করেন। প্রদ্যোত দত্তের বিভিন্ন কাজে আমার মতবিরোধিতা থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও সংঘাত ছিল না। তাঁর মৃত্যু সংবাদটা আমার কাছে ভ্রাতৃবিয়োগের মতোই দুঃখজনক।

রবিন লোধ রায় (সচিব সোনালী শিবির) : প্রদ্যোত দত্তের অকাল মৃত্যুর সংবাদে আমি এবং সোনালী শিবিরের সমস্ত সদস্য অত্যন্ত মর্মাহত। ব্যক্তি প্রদ্যোত দত্তের সঙ্গে আমার দুভাবে পরিচয়. ৭০-এর দশকে তাঁর অগ্রজ বিশ্বনাথ দত্তের নেতৃত্বে বাংলার ফুটবলকে দুষ্টচক্রের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইতে সামিল হয়েছিলাম। আবার '৮৬ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমার লড়াই ছিল তাঁর নেতৃত্বাধীন আই এফ এ-র বিরুদ্ধে। তবে অবশ্যই এই লড়াই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে নয়। আমরা লড়েছিলাম বাংলার ফুটবলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।

নিমাই গোস্বামী (প্রাক্তন ফুটবলার, কোচ) : বিরাট আঘাত। অন্তত আমার কাছে। উনি আমার জন্য যা করেছেন তা অকল্পনীয়। '৮৩ সালে আমি তখন সদ্য লন্ডন থেকে কোচিং ডিগ্রি নিয়ে এসেছি। প্রদ্যোত দত্ত এরিয়ান্সের সচিব নন্টু মিত্রকে বলে আমাকে প্রথম 'ব্রেক' দেন। শুধু তাই নয়, এরপর '৮৬ সালে, প্রদ্যোতদা তখন সবে আই এফ এ-র সচিব হয়েছেন। আমাকে ডেকে বাংলার দায়িত্ব দিলেন। আমি তখন একেবারে আনকোরা। ভরসা পাচ্ছিলাম না। উনি আমায় বলেন, 'চিন্তা করিস না। এই দল নিয়েই জিতবি।' হলও তাই। আমরাই চাম্পিয়ন হলাম। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

শিশির : বাংলার ফুটবলে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

সত্যজিৎ : বাংলার ফুটবল একটা বড় ধাক্কা খেল।

কৃশানু : প্রদ্যোতদা নেই ভাবতেই পারছি না।

কালো ব্যাজ পরে মাঠে নামলেন বিজয়ন, অলোকরা

স্টাফ রিপোর্টার, বাঙ্গালোর, ১৬ নভেম্বর : জিরশক্রকে হারিয়েও জয়ের আনন্দ করতে পারল না মোহনবাগান। আই এফ এ সচিব প্রদ্যোত দত্ত গতকাল রাতে মারা যাওয়ার খবর এখানে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভেবেছিলেন দুই প্রধানের ম্যাচ হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি। মাঠে লাউড স্পিকারে বেশ জোরেই গান হচ্ছিল। মোহনবাগান কর্তারা সংগঠকদের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন, গান বন্ধ করতে। সংগঠকরাও অবশ্য তা বন্ধ করে দেন। মোহনবাগান ফুটবলার ও কর্মকর্তারা প্রত্যেকেই কালো ব্যাজ পরেছিলেন। খেলার আগে সংগঠকদের তরফে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মোহনবাগান হিসাবরক্ষক কলকাতায় ফিরছেন প্রদ্যোত দত্তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্য। স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে তিনি বলে গেলেন আমি কাল ফিরছি। আনন্দ করা গেল না। ফাইনালে জিতলে দুটো আনন্দ একসঙ্গে করা হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৪

প্রদ্যোত দত্ত নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর— আই এফ এ সচিব প্রদ্যোত দত্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর মঙ্গলবার গভীর রাতে পরলোকগমন করেন। এখানকার ইস্ট অব কৈলাসে, ন্যাশনাল হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গত পয়লা নভেম্বর থেকে ভর্তি ছিলেন প্রদ্যোতবাবু। রাত দুটো নাগাদ তিনি ফের হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তাররা প্রচণ্ড চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি তাঁকে।

প্রদ্যোত দত্ত মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে। আই এফ এ সচিবের মৃত্যুর খবর তাঁর আত্মীয়দের জানানো হয় দু'ঘণ্টা পরে, ভোর চারটে নাগাদ। সকাল সাড়ে এগারোটায় মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এ আই এফ এফ প্রেসিডেন্ট প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি দিল্লির ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট, সচিবকে নিয়ে। আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রও। বলেন, "আমি আমার দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধুকে হারালাম।"

প্রদ্যোত দত্ত অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এখানে ছিলেন। দশই সেপ্টেম্বর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফেরার পর আবার অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায় তাঁর হৃদযন্ত্রে। ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। সুস্থ হয়ে প্রদ্যোতবাবু দিল্লির বাড়িতে ফেরেন। দোসরা নভেম্বর, কালীপুজোর দিন তাঁর কলকাতা ফেরার কথা ছিল। ৩১ অক্টোবর রুটিন চেক আপ করতে গিয়ে আবার অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ে তাঁর হৃদযন্ত্রে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি করে নেওয়া হয়। পাঁচই নভেম্বর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি হয়। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধে এবং আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তবু মাঝে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলতে পারছিলেন বলে আশা জেগেছিল। আজ ভোররাতে বড় ধরনের হৃদরোগে সব শেষ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: ছেলেবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি প্রচণ্ড টান। ময়দানে বড় দলের খেলা দেখতে যাওয়ার পথে, শিয়ালদহে নীলরতন সরকার হাসপাতালের কাছে ট্রামে কাটা পড়ে ডান পা চিরদিনের মতো হারান প্রদ্যোত। ওই দুর্ঘটনা তাঁর জেদ, ফুটবল প্রেম কমাতে পারেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম কম প্রদ্যোত ৭৪ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের দায়িত্ব নেন। ওই সময় থেকেই ফুটবল প্রশাসনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া। জন্ম ১৯৪৩ সালে। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ দত্তের ছোট ছেলে প্রদ্যোত দাদা বিশ্বনাথ দত্তের মতোই ক্রীড়া প্রশাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন আশির মাঝামাঝি। বিরাশিতে আই এফ এর কোষাধ্যক্ষ। পঁচাশিতে সচিব। আমৃত্যু এই পদে থাকা প্রদ্যোতবাবু এ আই এফ এফ কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কালীঘাট রোটারি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। প্রদ্যোতবাবুর দুটি স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল। এক, এ আই এফ এফের প্রশাসনে আসা। দুই, আই এফ এর শতবর্ষ দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে করা। প্রায়ই বলতেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের শতবর্ষ-হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠান যে রকম বাধাগ্রস্ত হয়েছে, আই এফ এর শতবর্ষে যেন এমন বাধা না পড়ে। সেই শতবর্ষেই চলে গেলেন প্রদ্যোত।

যুগান্তর

JUGANTAR

৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৪

সন্তোষট্রফি নিয়ে চিন্তায় নঈম

স্টফ রিপোর্টার : বোম্বাই, ২৯ নভেম্বর : মুখে তিনি যতই বলুন, রোভার্সে চ্যাম্পিয়ন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কথা নয়, আসলে নঈমুদ্দিন এখন সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ হবার কথা না ভেবে পারছেন না। প্রয়াত আই এফ এ সচিব প্রদ্যোৎ দত্ত বলেছিলেন নঈমুদ্দিনই কোচ। বছর বছর কোচ বদল না করে রীতি ভাঙার কথাও জানিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রয়াত প্রদ্যোৎবাবুর জায়গায় যিনি আসবেন তিনি কী করবেন কেউ বুঝতে পারছেন না। নঈমও নন। বরং বলেই ফেলেছেন, প্রদ্যোৎদার কথা নিশ্চয়ই রাখা উচিত।

বর্তমান

২১শে আগস্ট, ১৯৯৪

এবার শিল্ড চ্যাম্পিয়ন পাবে দু' লক্ষ টাকা

21 Aug 1994

স্টাফ রিপোর্টার : শতবার্ষিকী আই এফ এ শিল্ডের চ্যাম্পিয়ন টিম পাবে দু' লাখ টাকা। রানার্স আপ টিমের জন্য বরাদ্দ এক লাখ টাকা। দুই সেমিফাইনালিস্টই পাবে ৫০ হাজার টাকা। সিজার্স কাপ ছাড়া দেশের আর কোনও টুর্নামেন্টে এত নগদ পুরস্কার দেওয়া হয় না। আই এফ এ শিল্ডের শতবর্ষ বলেই এবার মোটা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। শনিবার প্রদ্যোত দত্তর বাড়িতে আই এফ এ শিল্ড কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শনিবার প্রদ্যোত দত্ত জানান, এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৬৬টি টিম খেলবে। সুপার ডিভিসন, প্রথম ডিভিসন গ্রুপ 'এ' ও 'বি'-র সব টিম প্রতিযোগিতায় খেলবে। তাছাড়া দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে পঞ্চম ডিভিসনের প্রথম চারটি দল শিল্ডে খেলার সুযোগ পাবে। জেলার সেরা চারটি দলও খেলবে এবারের প্রতিযোগিতায়।

শতবর্ষের আই এফ এ শিল্ড হবে চারটি ভাগে। প্রি-ক্লাস্টার, ক্লাস্টার, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ও মূলপর্ব—এই চারটি ভাগে প্রতিযোগিতা হবে। প্রি-ক্লাস্টার ও ক্লাস্টার খেলার জন্য প্রতিটি দল পাবে ৫০০ টাকা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার জন্য টিমগুলি পাবে এক হাজার টাকা।

এবারের প্রতিযোগিতা শুরু হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। পুজোর আগে বাছাই পর্বের খেলা প্রি-কোয়ার্টার পর্যায় পর্যন্ত হয়ে যাবে। বাছাই পর্বের খেলা হবে কলকাতা ও আরও তিনটি জেলায় শিল্ডের মূলপর্বের খেলা হবে ২৯ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর।

মোহন বাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মহমেডান ছাড়াও পুলিশ এবারের শিল্ডে খেলবে। এবং আরও একটি বিদেশি দল কোয়ার্টার ফাইনালে সরাসরি খেলবে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত বাই পাবে দু'টি ভিন্ রাজ্যের দল। ক্লাস্টার থেকে দশটি যোগ্যতা অর্জন করবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত।

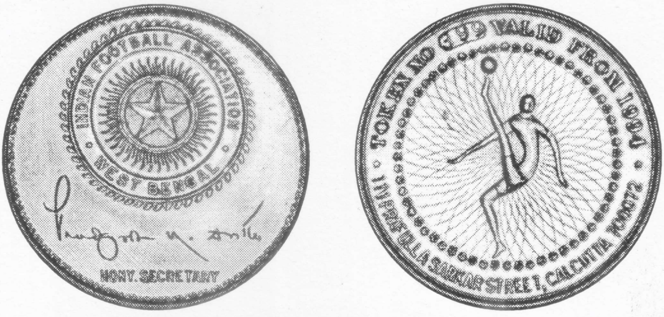

প্রদ্যুত কুমার দত্ত প্রচলিত প্রথম খেলোয়ার হস্তান্তর টোকেন।

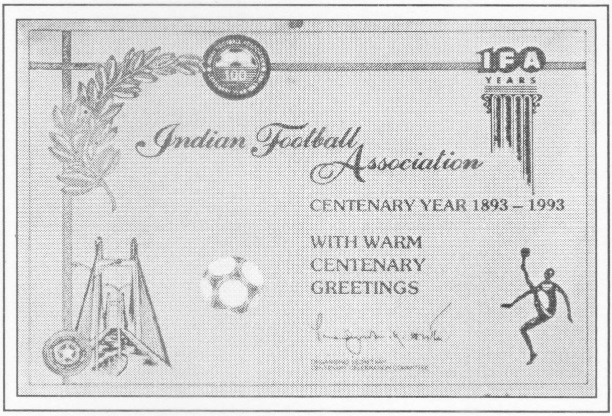

আই এফ এ-এর শতবর্ষ শুভেচ্ছাবার্তা।

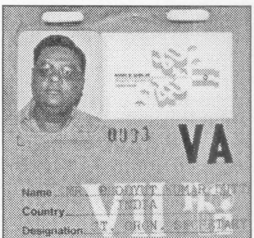

প্রদ্যুত কুমার দত্তর গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচয়পত্র

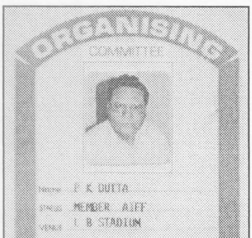

প্রদ্যুত কুমার দত্তর প্রি অলিম্পিক ফুটবলের পরিচয়পত্র

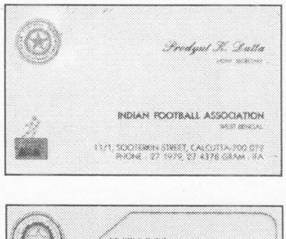

প্রদ্যুত কুমার দত্তর ভিজিটিং কার্ড

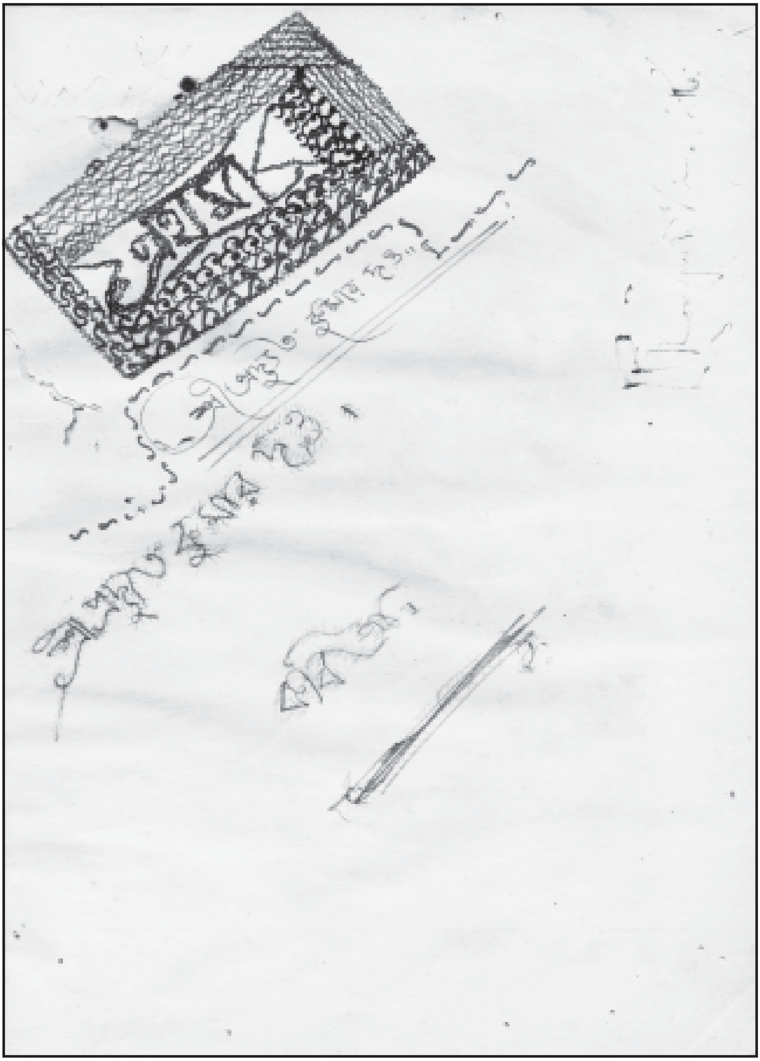

প্রথমা

শ্রী প্রদ্যুত কুমার দত্ত

আসছে মায়ের পুজো

আজ কি শোভা লুটিয়ে পড়ে
দিগন্তেরি অঙ্গনে,
রঙ্গের বাহার রাঙ্গিয়ে দিল
মুক্ত একার প্রাঙ্গণে,
ছড়িয়ে দিল বিশ্ব মাঝে
আজকে কীসের বার্তারে?
ভরিয়ে দিল ভুবন খানি
সৌরভে আর কার তরে।
কার তরে আভা অসীম নীলে
পড়লো ঝরে স্বর্ণরে?
শারদ প্রাতে দিকে দিকে
লাগলো রঙ্গের বর্ণরে!
সময় হল মায়ের পূজার
তাইতো এত জাঁক!
ওই শোনা যায় সুদূর হতে
বাজছে কাঁসর-ঢাক!
সন্নিকারা সাজ করেছে,
নবীন বসন পড়ছে গায়,
পড়লো রূপের হানাহানি,
কে আগে মা'র চরণ পায়।
মায়ের পূজার হল সময়,
আয় রে ছুটে আয়।
কে আর আজ ভিনদেশীয়,
কে আছরে সুদূর গাঁয়ে!

কর্মযোগী

কাস্তে হাতে, নামরে মাঠে,
ভাঙরে অভিমান,
লাঙল নিয়ে, কাটরে মাটি,
জাগুক নবীন প্রাণ।
আয়না সবে হাত মিলিয়ে
মাঠের ধারে আয়,
অঙ্গে লাগা কাদা মাটি
লাগুক ধুলো গায়।
মায়ের ছেলে আমরা সবাই,
মায়ের সেবা তাই—
ঝাঁপিয়ে মোরা পড়ব কাজে
আমরা যে ভাই ভাই।
থাকব না তো আর কারও
মুখের পানে চেয়ে।
আপন হাতে ফলাব ফসল
থাকবো সুখে খেয়ে।
নামরে মাঠে, কোমর বাঁধি,
লাঙল হাতে নিয়ে,
ক্ষেতের মাঠে ফসল কাটি,
কাস্তেখানি দিয়ে।
নামুক বৃষ্টি, থাকুক রৌদ্র,
ঘাটে যেন তলিয়ে।
ফলাব আজ, নতুন ফসল,
বক্ষে ধরিত্রীর।

বিদায়

এই পৃথিবীতে ফুরালো আমার
সুখে দুখে দিন গোনা
তবু কেন জানি যাবার বেলায়
হয়ে যাই আনমনা
আর তো রব না এ ধরার মাঝে
আর তো গাব না গান
সাঁঝের বেলায় পথ চেয়ে আর
উদাস হবে না প্রাণ।
দুদিনের খেলা সাঙ্গ করেছি
সুখে দুখে গান গেয়ে
যাবার বেলায় তবু নামে ব্যথা
মরমের মাঝে চেয়ে
কানে আমার পশিবে না আর
ভোরের পাখির গান
সবুজের পানে মেলিয়া নয়ন
জুরাবে না মোর প্রাণ
আমার পৃথিবী দুদিনের তরে
বেসেছিল মোরে ভালো?
যাই চলে যাই ছিঁড়ে এ বাঁধন
ফুরালো যে মোর আলো।

আক্ষেপ

ওগো ফুল পরী, তুমি সুন্দরী
কেন গো ঝড়িয়া যাও
ক্ষণিকের তরে রূপ শুধা ঢালি
কোথায় চলিয়া যাও।
ফুটিয়া ওঠোরে আপন খেয়ালে
ভোরের মাধুরী নিয়ে
কবির মননে ঢেলে দাও সুধা
নিজের সুরভি দিয়ে
মাতাল করো হে দখিনা মলয়
হৃদয়ের সুধা ঢালি
পূর্ণ করহে কখন জানি না
শূন্য পূজার ডালি
অরূপ তোমারে দিয়েছে যে রূপ
স্বরূপের মধু ঢালি
ক্ষণেকের তরে দিয়ে দেখা তার
কি লাগি যাও চলি
জানোনা তো তুমি কবির মরমে
কেমনে যে বাজে ব্যথা
অসময়ে তুমি নিলে গো বিদায়
ক্ষণিকের দিয়ে দেখা
তাই বুঝি তুমি বিদায়ের আগে
বলেছ কবির কানে
আমি চলে যাই যেথা হতে আসি
কেন মিছে ব্যথা প্রাণে।

এ জীবনে

আমরা সবাই এসেছি হেথায়
গেয়ে যাব দুটি গান
একটি সুখের একটি দুখের
উজার করে এ প্রাণ
সুখের পরশে হঠাৎ হরষে
যদি দুলে উঠে মন
হব না তো হায় দিশেহারা তায়
দুদিনের এ জীবন
আলোর পাশেতে আঁধারের ছায়া
রয়েছে যে চিরদিন
মরণের ছায়া ছেয়ে আসে ওই
জীবনের আলো ক্ষীণ
একটির নদীর দুইকূলে দুই
চলে জীবনের খেলা
একূলে যখন আসে গো জোয়ার
ও কূলে ভাটার বেলা
প্রদীপের শিখা ধীরে ধীরে জ্বলে
নিঃশ্বেসি দেয় আলো
হবে অবসান দীপশিখা তার
নিবিড় হয় যে কালো
ক্ষণিকের মায়া মরীচিকা ময়
জীবন মরুর বুকে
হব না তো মোরা কভু দিশেহারা
মিছে এ মায়ার সুখে।

অরূপ

নেহাতই তোমার অপরূপ রূপ
নয়ন লভেগো যে গভীর সুখ
নিশীথ গগনে যে ছবি গোপনে
এঁকেছে শিল্পী ধরে না নয়নে
নিপুণ তুলিকা ধরেছ টানিয়া
একেছ যে পট মাধুরী মাখিয়া
নদী গিরি মালা পথ পর্বত
সাগরারণ্যে শোভে যত সব
মুক্ত ছড়ানো সবুজের বুকে
তা চিনে প্রভাত তব হাসিমুখে
রবি-শশী-তারা কত মনোহরা
কত রূপে রূপী মেঘকন্যারা
কী খেলা খেলেছ সাঁঝের আকাশে
ছড়ায়েছ রঙ্গ মনের হরষে
হেতা হতে ওই দিগন্তপানে
যত দূর ধরে আমার নয়নে
আপনকে শুধু রূপসুধা হেরি
আনমনে ভাবি এঁকেছ যে ছবি
সে তো ও প্রাণ প্রিয় তোমারি স্বরূপ
কত মনোহর কত অপরূপ।।

তাজমহল

দেখেছি যে আমি প্রেমের স্মৃতিটি
গড়ে গেছে শাজাহান
তারই দুটি কথা শোনা তোমায়
শুধু গেয়ে তার গান
মমতাজ তার প্রেমিকা যেন-গো
শাজাহান তার প্রেমী
প্রেম সম্রাট শাজাহানও যে
প্রেমের শিল্পী তুমি
মমতাজ নেই— আছে আজ সেথা
শূন্য প্রেমের স্মৃতি
নেই সেথা আজ তোমরা দুজনে
আছে শুধু নিভৃতি
তাজমহলের মর্মরে গাথা
আছে দুজনার প্রেম
গানের ভাষায় যতটুকু পারি
গান গেয়ে শোনালেম।

চেতনা

মায়াহীন এই কায়াখানি কেন
মিছে মরে মায়া খুঁজে,
সংসারময় সংশয় তবু
ছোটে আলোর পিছে।

সংসার মরু মরীচিকা শুধু
তবু কেন তার আঁশ
ধূলি মাখা ঘর ধূলির এ ভূধর
ধূলি লয়ে কর বাস।

মিছে ধূলি মেখে গায়ে হাতে মাথে
কেন যে বাড়াও গ্লানি
বৃথা এই প্রেম মায়া খারিচের
বৃথা এই হাতছানি।

দুলনার দুলে দুলিয়া তোমারে
ঘুরাবে চক্রাকারে
দিশাহারা কোন পথিকের মতো
পড়িবে বিপথ ধারে।

সম্বিত ফিরে স্তম্ভিত হয়ে
চাহিয়া নয়ন মেলি
এতদিন তুমি যা কিছু করিলে
মিথ্যা মায়ার কেলি।

যাহা হয়ে গেছে অনুশোচনায়
নেই তার কোনো কাজ
বহু গেছে চলে কিন্তু আছে পরে
তারি তরে কর সাজ।

এখনো বিপথে কর না বিরাজ
জাগাও জ্ঞানের চেতনা
এ বিপুলতার সীমা নাই আর
করহে তাহার সাধনা।

হয়েছে তোমার জীবন সন্ধ্যা
এসেছে যাবার লগ্ন
এখনো রয়োনা মিছে এ মায়ার
বৃথা এ স্বপনে মগ্ন।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সলিটারি রিপার অবলম্বনে

আমি যেথা এই স্কটল্যান্ডের বিস্তৃত প্রান্তরে
একাকী শুধুই রয়েছি বসিয়া নীরবতা প্রাণভরে
মেলিয়া আঁখিরে দিগন্ত পানে কিছু না দেখিতে পাই
নির্জন এই প্রান্তর মোর হৃদয় ভরেছে তাই।

কোথা হতে যেন এলো ভেসে কানে একটি করুণ সুর
বিরহের ব্যথা মাধুরী মাখিয়া ভেসে চলে বহুদূর
চাহিনু আবার ব্যকুল নয়নে কে গাহে এমন গান,
এত ব্যথা নিয়ে কে দিলরে সুরে আকুল করিয়া প্রাণ।

নয়নে আমার ধরা দিল সেযে একটি তন্বী তরুণী—
চারিদিকে তার রয়েছে ঘিরিয়া শস্য শ্যামল ধরণী
একাকিনী ওই বীর যিনি বুঝি প্রান্তর ভূমি মাঝে
করুণ ছাঁচেতে বেঁধেছে যে সুর নীরবে আপন কাজে।

বুঝি নি তো আমি সেদিন গানের কোনই মর্মকথা
আমি পরদেশি তবু মোর প্রাণে হেনেছে বিরহ ব্যথা
হয়তো সে গান তাহার জীবনে ঘটনার স্মৃতিলিপি
হয়তো সে গান স্বদেশি বীরের নিদারুণ বিধিলিপি।

অহেতুক

আমি মরণের হাসি হাসিয়া মরিব
জীবনের যৌবনে
আমি খুশির জোয়ারে দুখের ভাটারে
ডাকিব আপন মনে
ভরা বসন্তে ঝরা বকুলের আমি
নীরব পত্রালিকা
পদতলে পিষি মর্মর ধ্বনি
কাঁদিয়া মরিব একা,
মোর পদরেখা এঁকে দিয়ে যাব
অজানা পথের প্রান্তে
কোথা হল শেষ সেই পথ
পাবেনা তো কেউ জানতে
বেদনার রাতে শেষ তারা হয়ে
হেসে যাব মহা শূন্যে
হঠাৎ বিদারি বিদ্যুৎ বাতি
ঘুচাব তমসা ছুলে
অট্টহাসির তুলিব লহরা
বিগলিত মোর নয়নে
নব বসন্তে রহিব ভূলিয়া
মিলাব আঁধার গগনে।

যাত্রী

আমরা সুদূর যাত্রী,
করেছি রচনা সংসার পথ,
চলিয়াছি দিবা রাত্রি।

জানি না পথের প্রান্ত,
কোনদিন আর হবে কিনা শেষ !
চলিয়াছি অক্লান্ত।

জন্ম লভিয়া আমরা পথিক,
আঁকাবাঁকা পথে চলিয়াছি ঠিক।

জানি না কেন এ যাত্রা
করেছে রচনা অশনি অতীত
আজো নেই যার যাত্রা,

কতশত দল যাত্রী—
কোথা গেল চলে' কোথা আজো চলে!
চলিয়াছি দিবা রাত্রি।

হোক না সে দূর্গম,
যে পথে আমরা করেছি যাত্রা
চলেযাব হরদম্।

হোক না সে আলোময়,
হবে না তো সেথা সহজ, শিথিল,
জানি তার পিছে ভয়!

চলচল দূর যাত্রী,
নির্ভয় পদে, অসীমের পথে,
আসুক প্রস্তর রাত্রি।

ক্ষয়িষ্ণু

আমরা বাঙালি, আমরা বাঙালি,
বাংলা মোদের প্রিয়।
নিস্পেষণের রুদ্র চক্রে
আমরা যে ক্ষত্রিয়।
অশনি অশির ঘাতে,
মোদের নিলয়, লন্ডভন্ড
স্বাধীনতার ওই প্রাতে।
করকাল হাতে, করতাল নিয়ে,
দুর্গম গিরিপথে,
কান্তার মরু, সিন্ধু বিদিত,
ভ্রমি মোরা জয়রথে।
সৌদামিনীর ইঙ্গিতে ওই
বুঝেছি রে নাহি ভয়,
সুতাশয়ন তেজে আমরা পুরাব
জীবনের সংশয়।
উদাটি পরিছে বিটপীর দল,
তাপখান নাহি সয়রে।
আজ মোদের, অন্তরহীনা,
আয় তোরা সবে আয়ত্বে।

নাহি নাহি আর ভয়,
সুরধনি সুধা অঙ্গেলেগেছে,
সুরে মোরা নিশ্চয়।
আয় মোরা সবে আমুরে বাঁধিয়া
সুর পুবে করি গান,
চৈরণ দন্তে দংশন করি
অরাতিরে করি নাশ।
আমরা ছিলাম স্বার্থ ত্যাগের

নির্ভয় পরিচয়
সে ক্ষত বক্ষে কাঁচা রক্তের
গাছ হয়নি লয়।
বসুহীন আজো, বাসহীন মোরা,
পদে পদে সংশয়,
যাদের লাগিয়া তারা আজ করে
আমাদেরি অপচয়।

শতলা শতলা আয়
নিজেরাই লব এবার নিজের
ক্ষুধা তৃষ্ণার ভার।
হে বিধাতা তুমি, দেখিয়াছ জানি,
এদের অত্যাচার,
বাংলার ব্যথা হৃদয় বিদারি
করিতেছে হাহাকারে।
ঘরে ঘরে আজ চাল নাই,
নাই চাল বা আচ্ছাদন,
সকলি দিয়াছি আর কত দিব
গৃহখান ধন জল।
যাদের নয়নে ছিল শুধু জল,
পাষাণে চাপাল বুক,
সে হতভাগার, ফিরেছে চেতনা,
খুলেছে নীরব মুখ।
এবার বুঝিবা সহ্যের সীমা
ঘটাবে বিস্ফোরণ,
সুপ্ত বীরের জানবে না বুঝি
টলবে সিংহাসন।

ওই সপিল যুদ্ধ যাত্রী
সর্ব্বনাশার গুরু গুরু নামে
গুমরি উঠেছে রাত্রি।

অভিশাপের ওই নিঃশ্বাস বেয়ে
নেমে আসে পরে ছায়া,
এই বাংলার বিপ্লবী বীর
অশরীরী যত কায়া
মোদের শোনিতে, তাদের শোনিতে,
মিলেমিশে একাকার,
বিদ্রোহী বীর, উন্নতশির,
বিদ্যুৎ তলোয়ার।
দাঁড়ায়েছে তারা, বক্ষে বেদনা
বাঙালির অপমান,
নিরক্ষিতে শুধু, কেমনে ঘুচাতে
বাঙ্গাল সন্তান।
কাহির কালী, অশনি আঁধারে,
লিখেছে মোদের নাম,
আজিকার রণে, জিতি আর হারি,
দিয়ে শক্ত তারি দাম ।

চীনের প্রান্তে বেজেছে কখন
যুদ্ধের রণ ভেরী,
তাইতো ভ্রাতার লোভাতুর মন
ভারত সীমানা হেরি,
চেয়ে দেখ ওই কঙ্গোর পানে
ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ে ওরা,
চেয়ে দেখ ওই আসামী দাঁড়ায়ে
মেরেছে সে সহোদরা।
আফ্রিকা ঐ মার খেয়ে মরে
নিদারুণ আক্রোশে,
সভ্য জগৎ ফেলে নিঃশ্বাস
অসহায় আফশোসে,
ঘরে ঘরে চলে বাক্ বিতন্ডা,
ঘরে ঘরে চুলোচুলি

সর্বনাশীর ভীষণা মূর্তি
তেরে আসে মুঠি তুলি।
তোমরা বন্ধু পেয়েছ যখন
বিশ্বনেতার স্থান,
লওগো ডাকিয়া সবারে বক্ষে
গাও হে মিলন গান।
তোমরা দেখাও ত্যাগের মহিমা
শান্তির ধূপছায়া।

শ্বেতকপোত

চেয়ে দেখ ওই বিশ্ব আকাশে
উঠেছে অগ্নিশিখা,
লেলিহান ওর জিহ্বা মেলেছে
কী আছে ভাগ্যে লিখা!
শিখা ধীরে ধীরে জানি বেড়ে যাবে
আকাশের বুক ছেয়ে,
বিজ্ঞান আর শয়তান বুঝি
আসে তাই পিছে ধেয়ে?
আগামী দিনের ইতিহাসে জানি
ভরে যাবে বিভীষিকা,
কোথায় মিলাবে রাশিয়া আমার
কোথা রবে আমেরিকা?
হে আমেরিকা বন্ধু আমার
সময় যায়নি চলে,
রাশিয়া, তুমিও শোন এ মিনতি
মানবের গলে গলে,
ক'রোনাক খেলা আগুনেরে নিয়া
হিংসার মহামারি!
বাতাসে বাতাসে বিষ বীজ তার
শুরু হল মারামারি।
তারি অভিশাপে চেয়ে দেখ ওই
দিকে দিকে হানাহানি,
সুখ দুখ নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে আজ
পড়েছে যে টানাটানি।

শুরু

কেউ কোনোদিন দেখছ কি ভেবে
চলি মোরা কোন পানে,
রোজকার এই পথচলা থামে
কবে কোথা কোনখানে।
আজো চলে ছিতো, ঠিক সেই পথে,
সেই চেনা পুরাতন,
সেই অলি, গলি, পথ, ঘাট, মোড়,
সেই গৃহ, অঙ্গন।
তপনের তাপে প্রাতের পরশে, যে দিন,
জাগিয়া ওঠে
কোলাহলময় সংসার মাঝে,
পশ্চিম পানে ছোটে।
আবার, আবার, সেই পুরাতন,
গতানুগতিক তানে,
উঠেছে আবার, ছুটেছে আবার,
মিশেছে আদিকালে।
মহাকাল চলে, ছোট কাল তাই
পরশুর পিছে ধায়।
সময় কোথায়, কে নেবে হিসাব,
খতিয়ান বেড়ে যায়।
নিরর্থক এই অর্থ ফুরানো
চিরপুরাতন পথে,
এক হতে দুই, দুই হতে চার,
চলেছে জীবন রথে।
চলা থেমে যায় তারি রেশ হায়
হয় শুধু অনুগামী
নদী চলে যায় সাগরের পথে,
পিছনে থাকে সে আমি!
শেষের শিয়রে শুরু আছে বসে,
কোথা, কবে, কেবা, থামে?

শেষ হলে পরে, শুরু সেই পথে
নতুন নামেতে-নামে।

তোমরা জাগাও প্রেমের পরশ
জুরাক এ দগ্ধ কায়া।
মতবাদ ছাড়, দেখাও তোমরা
ভ্রাতৃ মিলন দৃশ্য,
সে পথে মিলুক মহামিলনের
বন্ধন ডোরে বিশ্ব।
পুলকে হরষে মিলন বরষে
নিভুক এ অগ্নিশিখা,
নতুন পথের ইঙ্গিত নিয়ে
আসুক এ ভাগ্য লিখা,
যে বিভীষিকার সম্ভাবনায়
শয়তান করে নৃত্য,
মূলেই তাহার হোক না বিনাশ
হরষে ভরুক চিত্ত।
এসো আমেরিকা, রাশিয়া আমার
নিয়ে এসো সেই স্বপ্ন
আমরা ব্যাকুল, আর কতদুর,
মহামিলনের লগ্ন?

কবি

চলেছি যে পথে আমি,
সেথায় কার পদচিহ্ন, হয়নি ক আঁকা।
এ পথ নতুন আমার,
অজানা পরিবেশে, বিচিত্র আঁকাবাঁকা।
তরুণেরা মালা হাতে
চলেছে ফাগুন সাথে
আগুনের পরশেতে বিগলিত শতচিত্র ধারা,
আমি কবি, পথহারা পথিকের মতো
নিত্যনতুন পথে হই দিশেহারা।
আধারের বুক চিরে,
আশার আলোক ঘিরে,
আমার কঠিন পথে বাড়ে জটিলতা।
আলোকের সন্ধানে, নিরালার অন্ধকারে,
জীবনের ছিন্নতার গাহে নীরবতা।
নীড়হারা ক্লান্ত বিহগের মতো শ্রান্ত ডানা
ঝাপটে ঝাপটে,
চলেছি এ পথে আমি নাজানিরে
শেষে মোর, কী আছে যে ঘটে।
ওরে পাখি! কোথা যাস এই অনন্ত পথে
হারায়েরে নীড়?
পাখি তবু নিরুত্তর, আমি শুধু চেয়ে থাকি
নীরব স্থবির।
বুঝেছি, বুঝেছি পাখি,
এপথ তোমার আমার,
নেই কোন তাপ পরিতাপ,
তুমি পাখি নীড়হারা,
আমি কবি পথহারা,
অনন্তে দিয়েছি দোহে ঝাঁপ।
বিজনে কূজন নাই,
আমরা দুজনে ভাই,

দুজনেই দুজনার সাথী।
হারায়েছি ঘর বাড়ি,
পুরাতন পথ ছাড়ি,
হয়েছি দুজনে আত্মঘাতী।

তবুও বিপথে মোর, আছে সুখ,
আছে কিছু নতুন ভাবনা।
হয়তো নিজেরে আমি -
হয়ে এ বিপথগামী,
করেছি কামনা।
ওই বিহঙ্গ জানি, ডানার শক্তি হলে শেষ
এই রাতে আসবে সে ফিরে,
তবুও পেয়েছে স্বাদ হারিয়ে যাবার আজ
আমারি মতন ঘুরে ফিরে।
এ জীবন তুচ্ছ না, তুচ্ছ নয় তাপ পরিতাপ,
তবুও কেমনে করি, তুচ্ছ এই
হারিয়ে যাবার অভিশাপ।
যদি ফিরি রিক্ত হয়ে, সর্বহারা
দিগন্তের শেষে,
ওই বিহঙ্গেরি মতো, ক্লান্ত, শ্রান্ত,
দীন বেশে।
তবু ভালো, পেয়েছি ত এ জীবনে,
হারাবার মতো আকাশ,
চিরদিন রবে সাথী, আর বন্দি রয়ে যাই
এ আকাশ বাতাস।

ধীর পদ— জাত্তার্ন ভারে
ঈষৎ সে অবনত দেহ,
কোন এক সুবিশাল পারস্য প্রাসাদ পাড়ে,
অলিন্দে কর বিচরণ,
ঠিক সেই আগের মতন।

সংসার আসর জেনে,
শুরালয়ে একমনে,
তুমি যেন বিপুল ভাষে করিছ প্রচার।
আয় মোরা এ জীবনে
ছ'দিনের মৌতা টেনে,
চলে যাই মিথ্যে মায়া কাটিয়ে হেমায়।

যদি কেহ বলে পাপ
নেই কোনো পরিতাপ, নেই কোনো ভয়,
পাপ তবে হবে তার
যে জন সৃজিল সরা, সুন্দরী নারী,
মানবের বিচিত্র মন সর্বোপরি।

ওমর খৈয়াম

স্বপ্ন মোরে আলগোছে লয়ে যায় টানি,
খোরাসান প্রদেশের নৈশাপুর গ্রামে।
কত দিন হয়েছে অতীত, পুরানো সে কথা,
তবুও রবে নতুন রবে চিরকাল শুধু নামে।
নীয়াসুদ্দিন—
ইবন্ আবুন—
ফতেহ ওমরবিন—
ইব্রাহিম—
অল্ খৈয়াম।

দেখি আমি মুদিলে নয়ন
তুমি কও কথা, হাসো তুমি, তুমি গাও গান
ঠিক সেই আগের মতন,
ওমর খৈয়াম।
এক হাতে সুরা পাত্র,
অন্য হাতে— কটি বেষ্টিত নারী,
কবির কল্পনা লোকে-
তোমার মুদিত মন সুদূর প্রসারী

তবে কেন মিছে পাপ ভয়,
যুক্তি আর তর্ক অপচয়,

আয় আয় পুরা করে সুরা পাত্র
জীবনের এই মাত্র, যত সুখ লুটে নিবি আয়।

যে আছে কাফের, থাক।
মোল্লা মিয়া, মামিনাক,
এ জীবন দুদিনের তবু কেন সুদিনের
বৃথা অপচয়।

তোমার বিলাসী মন, প্রেয়সীর সবধান
ভাবনার সিন্ধুক নিল লুটে।
আমার নিশার স্বপন,
হয়রান শুধু রোজ, তার পিছু ছুটে।
জোছনা বিছানো রাতে- তুলো পেঁজা মেঘ সাথে
তুমি যেন তারি কোণে, সুরাপাত্র হাতে,
কেমনে চেয়ে আছ, কত কিযে লিখিয়াছ,
ডানহাতে কপ হাতে।
এদৃশ্য দেখে দেখে স্বপ্নের আবেশ মেখে
মন মোর, হারিয়েছে হাল।
তাই এই মোর মন, লেখে কিছু উন্মন,
ওমর খৈয়ামী চালে - করে বানচাল।

এ যেন কি অভিশাপে, আমার রাত্রি কাটে
তোমার বিচিত্র নেশা ভরে।
অবসাদে দেহ ভার, করেছে যে বারবার,
তবুও হয়নি দেখা, হৃদয় ভরে।

মেগাটন

এই পৃথিবীর হৃদ্‌পিন্ডের
প্রাণ সংকেত ধ্বনি,
বিরাম বিহীন সৃষ্টি হতেই
চলেছে প্রহর ধ্বনি,
আমি আজ তার শেষ প্রহরের
বিদায় বার্তা শুনি।
কত কোটি যুগ অযুত বর্ষ
মানবের ইতিহাসে-
লিখে গেছে নাম বিগত দিনের
বিদায়ের আফশোসে।

তাদের হৃদয়ে হিরোসিমা আর
নাগাসাকি আজো জ্বলে,
তারি প্রতিবাদ অযুত কণ্ঠে
কান্নার রোল তোলে।
কিন্তু আমরা ভুলেছি সেদিন,
হিট্‌লার বহুদুর।
তাই পৃথিবীর হৃদ্‌পিন্ডতে
শুনি বিদায়ের সুর।
মহাকাল ছোটে অনন্ত পথে
গতকাল পড়ে ঢাকা,
নবসৃষ্টির উন্মাদনায়
ঘুরেছে কালের চাকা।

মানুষ রচেছে, বাসরশয্যা,
মিলনের মহালগ্নে,
মানুষ গড়েছে শান্তির নীড়—
আগামী দিনের স্বপ্নে।
এই সেই মানুষ রচেছে শ্মশান
বিদায়ের বন্দর,

সর্বনাশীরে নিয়ে এল ডেকে
খুলে দিল গৃহদোর।
(আজ) সে মহাশ্মশানে মিলনশয্যা
প্রস্তুত সবাকার।
শান্তির ধূপ জ্বেলে দিতে বাকি
শঙ্খেতে ফুৎকার।
চলেছি কোথায়, ঠিকানা বিহীন-
কোন পথে মোরা যাত্রী,
একথা কখনো জাগেনাত মনে
এসেছে যে কাল রাত্রি।
প্রহর গোনার পালা হল শেষ
কতটুকু আছে বাকি,
আমি শুধু তাই বিশাল বযে,
কান পেতে দিয়ে থাকি,
বিগত দিনের অভিধান খুলে
খুঁজি মিছে এর মানে,
জীবনমৃত্যু কোলাকুলি করে
বিজয়ার জয় গানে,
কভু হল বুঝি ক্লেশ
মানেহীন মেগাটনে।

ভানুর ভন্ডামি

আজ যে সূর্য ওঠে,
সে নিতান্ত এক দেঁতো হাসি হেসে,
অভিব্যাক্তি বিহীন হয়েই ফোটে,
গলিত স্বর্ণ, কনক বর্ণে রাঙ্গায়না হিয়া মোটে।

আজ যে সূর্য্য ওঠে,
ব্যস্ত ভীষন, সময় মোটেনা জোটে
নিত্যের কাজ ফেলে,
পশ্চিম পানে ছোটে।

আজ যে সূর্য্য ওঠে,
হতে পারে সেই পুরাতন প্রিয় মামা,
কিন্তু তাহার আজ একচোখ কানা,
এক ভাগ্নের ভাগ্য দুয়ার খোলে,
অপর ভাগ্নেরা, জল করে ঘোলা
অনর্থ পাঁক ঘেটে।

মধ্যাহ্নের তীব্র তামাটে শিখা
বুক ফাটা মাঠে,
আক্রোশে মাথা কোটে।

নিরুত্তরের প্রতিবাদে শুধু ছোটে,
পশ্চিম রনপোতে।

আজ যে সূর্য্য ওঠে,
কেবল কর্ম্ম বোধে,
নিস্প্রাণ, নিষ্প্রভ',

হৃদয় ভরে না, তপ্ত আলিঙ্গনে,
নিয়মিত শুধু প্রভাত কল্প লগনে
সপ্তাশ্বের উদয় বার্ত্তা রটে।

আজ যে সূর্য্য ওঠে,
কলাহক তলে আত্মগোপন করে
পলায়ানপর লোক চক্ষুর থেকে,
ভ্রান্ত পথেতে ছোটে
যেথা মেঘাটন প্রচন্ড ক্রোধে ফাটে।

আজ যে সূর্য্য ওঠে,
সপ্তঘোরার রথ ফেলেরেখে
চলে সোজা হাঁটাপথে,
জমিদারি প্রথা হয়েছে বিলোপ
শক্ত সে আইন এঁটে।

কিন্তু কে জানে আড়ালে পাঠালে পাশ,
হঠাৎ ঘোরারে কষাবেকি কষাঘাত।
সরষে ফুলের মতন আকাশ জুড়ে
হাত দেখব ধূলো আর ধূলো ওরে!
হয়ত বা সেই, ঘোড়াদের খুরে খুরে
আমরা তখন কি জানি কেমন
আইন অমান্য চোটে।।

কামনা

আমি এক দুর্বার দুর্নিবার যৌবন
অফুরন্ত উচ্ছ্বল চঞ্চল রক্তের গতি
আবর্তিত, যুবকের দেহে
উদ্দাম কর্ম্ম শক্তি - মিলনের স্বপ্ন
উত্তাল প্রাণ প্রাচুর্য - অমানুষের বিরুদ্ধে মানুষের সাথী

আমি চাই ভেঙে দিতে কারার প্রাচীর
উপড়ে নিতে বিধাতার বাঁকা চোখ
আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন,
U.N.O. ন্যাটো চুরমার করে দিয়ে
ইমারত ফুটপাত একাকার হোক।

আমি দেখি ক্রমওয়েনের হাতদুটো বেয়ে
টপ্ টপ্ শোষকের রক্ত পড়ে ঝরে
চার্লসের রক্তচক্ষু প্রচণ্ড আক্রোশে
অন্ধ হয়ে সিংহাসনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

অযাচিত

আমি যেন এক বিরুদ্ধ যৌবন
কামনা আমার নিরুদ্ধ অনুরাগে,
চিত্ত আমার এমনি শিক্ষাহীন
প্রেয়সীর ভীত রাগে।

আমার ভাবনা বেসামাল নীল-নীলে
কলাহক সাথে ধায়,
নীরহারা পাখি সুদূরের আঙিনায়
শুভ্র সেনানী পাখায়।

মৌন যাত্রী ঠিকানাবিহীন পায়ে
উন্মাদ তাড়নায়
আপন সত্তা সান্ত্বনা বাণী মাঝে
পশ্চাতে রেখে যায়।

আমি সে যাত্রী পথিকের অনুধাবী,
অনুকম্পার কম্পনে শিহরিত
আমি সে নিশার বিদিশার মোহনায়
ক্ষণিকে আচম্বিত।

আমার মিলন স্বপ্ন জানে না গান
তাই তার চোখে চির দিন নিষ্প্রাণ
আঁধার আমার প্রথম কিশোর সাথী
হাতছানি দিয়ে ডাকে,
দৃষ্টি বন্ধু আমার বন্ধু নয়
তাই অলক্ষ্যে থাকে,
চন্দ্রকলার ষোলো কলা কালো মেঘে
অমাবশ্যারই রীতি।

আমার নিটোল কপাল বেড়িয়া ঘোরে
এ মোর ভাগ্য-প্রীতি
কোনোদিন মোর নিমিখ নিমাখি নাই
সেই জানি মোরা নধীশ নিবন্ধন
অকাল যাত্রী অনন্ত রাত হেঁটে
পাবে না উত্তরণ।

আপ্তবাক্য কহেনা তো হিয়া মোটে
তরলমতি এ প্রাণ,
দুর্ভাগ্যের শত নিপীড়ন সয়ে,
তবু গাই সেই যৌবন জয়গান।।

আমি দেখি ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে
দুঃস্বপ্ন ভেঙে জাগে— যজ্ঞ করে
রক্তহীন হাতগুলো রক্ত দিয়ে চায় অধিকার
নির্বিচারে হত্যাকরে, নির্বিরোধ জাগে
আর ক্ষণিকের স্বপ্ন যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

আমি চাই আফ্রিকার ভাঙনে
নিত্য যারা সেচ্ছার স্পর্ধিত পদতলে
পেষে, মানুষের মান, সম্মান আর অধিকার
তাদের বিরুদ্ধে যেন জেগে ওঠে
সর্বহারা লক্ষ প্রাণ, এত দিনের তীব্র অত্যাচারে

যাদের কপাল বেয়ে জল ঝরে পড়ে
কৃষ্ণ দেহ মানুষ নয় এমনি এক বোধে
তারা জাগুক, তারা বলুক আমরাও মানুষ
আমরা বাঁচি, দয়ায় নয়, দায়ে নয়
নিজের অধিকারে।

একই সূর্য তাপে এই বীর্যের উন্মেষ
একই বায়ু লয়ে বাঁচে বিশ্বের প্রাণেশ
একই আকাশ তলে লভি জন্ম হই শেষ।

কংগ্রেস কমিউনিস্ট বড় বড় পার্টি লিস্ট
পড়ে আছে স্বার্থের নীচ দ্বন্দ্ব লয়ে
আমরা মানুষ পার্টি পশু নই
চাই সম অধিকার
বুভুক্ষের রক্তহীন দেহে দিতে হবে রক্তের সঞ্চার
আমরাও মানুষ একথা মনে রবে
এমন একটি — স্বার্থহীন মানব সংসার।

তবু এ প্রতীক্ষা কার

সাগরের মতো যদি সফেল তরঙ্গ তুলে বলে দিতে পারি
কোনোদিনও,
হে নারী, উচ্চকলরবে, তোমার মিলনআশা,
ব্যর্থ শুধু ভালোবাসা
এলোচুলে উপকূলে তুমি বসে।
প্রেয়সীর ভাবনায় উষ্ণতা কবিতার বারবার ছন্দ পতন
হয় যদি, তবু সমীরণ,
প্রবঞ্চিত শিহরনে মিলনের স্বপ্ন আনে
তোমার কাতর নয়নে,
একবিন্দু তপ্ত জল খসে,
জল টস্ টসে্।

এ উপল উপকূলে হৃদয়েরি হিল্লোলে সাগরের কথা
ভেবেছ কি? যুগ যুগ কোটে মাথা।
প্রেমীর পদমূলে শুধু বারবার কীসের আশায়
সৃষ্টি হতে মূকভাষায়,
ব্যর্থ শুধু হয় প্রেম,
অকূলে অনন্ত কাল সাগরীর কাছে যেন কূল ঘেষে চলা
তার সাথে কথা বলা
তরঙ্গিত ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয়ের প্রতি ঘাটে
বাজে সুর ভাঙা সে ললাটে
তবু বলে কি দিলেম,

অনন্ত কাল ধরে শুধুই নিঃসীম ক্রন্দন দেখে
গেছি রেখে,
এততটে, তোমার বিস্মৃত জীবনের গান
আজ তাই পাতে কান
মোর সেই স্মৃতি থেকে।

এত বড় এ আকাশ গোল হয়ে সেটান ধেয়ে গেছে
কখন যে কার কাছে
স্তব্ধ রাত বদ্ধ হয়ে আছে কোন খানে
কি জানি সে কার পানে
সাগরীর আধোমুখ ঢেকে।
নীলজলে মিল আছে হয়তো বা মনের কোথাও
তাই সে হয়েছে উধাও
উদাসী তোমার মন প্রেয়সীর ভাবনায়
দূরে বহু দূরে,
মিলনের স্বপ্ন লয়ে।
সে স্বপ্ন তরঙ্গিত নীল জলে উছালিয়া পড়ে রাতে
অন্ধকার বিদিশাতে,
মিলনের স্বপ্ন ছুটে নামে যদি,
এমনি অন্ধকার!
তবু এ প্রতীক্ষার
হে নারী! প্রবঞ্চিত দক্ষিণা মলয়ে?

যার মুখে ভাষা নেই তার কিন্তু আছে,
হয়তো বা লাল।
সুরহারা ছন্দ গীতিকার আছে
লুপ্ত প্রায় প্রাণ।

অন্ধকার হতে পারে অমাবস্যা তিথি
হতে প্যারে মেঘের আড়াল,
তবুও শুভ্র সেথা আছে সুনিশ্চিত,
হয়তো বন্দিনী সেথা
মুক্তি প্রতীক্ষিত।

ক্লান্তির গান তাই স্ত্রান্তিতে নয়,
আবহমান এই চলাতে।
নিরুপায় হতে পারে ব্যর্থতার গ্ল্যানি,

হতে পারে অর্থহীন এ জীবন,
স্তব্ধ তার রূঢ় সংগীত।

তবুও রাত্রি কাটে স্থবিরতায়।
পদক্ষেপ তাই থেমে থাকে
যদিও এগোয়।।

প্রথম বসন্ত

তোমার সাথে আমার পরিচয়—
এই তো প্রথম,
হে বসন্ত!
আমি তখন বাতায়নে বন্ধ পাখির মতো,
বসে ছিলাম আকাশ পানে চেয়ে,
রুদ্ধ ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে—
হাঁপিয়ে ওঠা মন,
অনেক দূরে হারিয়ে গেছে
নীলাঞ্জনে ডুবে।
এমন সময় তুমি এলে, সবুজ স্বপ্ন নিয়ে,
আমার বাগানে।
ফিরে এলাম সে মন নিয়ে নীল আকাশের নীচে
তোমার নিমন্ত্রণে।
সে যেন এক কিসেরই আশ্বাসে,
বুক ভরে মোর আসে—
কেবল রুদ্র শ্বাসে।
এই তো প্রথম এমন করে
পুলক জেগে ওঠে,
পলাশ ফুলে, রঙিন স্বপ্ন নিয়ে।

প্রিয়া

নিশুতি রাতের বুক ভেঙে নেমে আসে স্নিগ্ধ সুষম
জোৎস্নার আলো।
তারপর? তারপর খোলা জানলার পথে
ঢুকে পড়ে তোমার শয্যাপাশে,
আর অনিমিষ দৃষ্টি দিয়ে শুধু চেয়ে থাকে,
ঘুমন্ত মুখের পানে
অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরে।
নিমীলিত দু নয়ন, শান্ত নিঃশ্বাস,
বক্ষে জড়ানো দুটি হাত,
আর একরাশ সুকোমল চুল।

সবমিলে তোমার অতনু তনু
যেন এক ফুটন্ত ফুল,
ফুটে আছে বিষণ্ণ রাত্রি কোলে
প্রসন্ন হাসির মতন,

এলোচুলে খেলা করে স্নিগ্ধ সমীরণ,
কথাকয় কানে কানে উদাসী স্বপন।

তুমি নয় রূপকথা, দৈত্য প্রহরায়
ঘুমন্ত, দু কাঠি ছোঁয়ায়
অলকার অপ্সয়নেও, কল্পনার ডানা মেলে
পুরতমা পরী হওয়া যায়
তবু জানি তুমি এক সাধারণ মেয়ে।
তবু তার পানে চেয়ে রয়,
চাঁদের সুষমা ঢেলে স্তব্ধ রাত,
তবু তার ডাক শুনে দক্ষিণা মলয়
চঞ্চল হয়ে ওঠে বাতয়নে এসে।
আঁধারের রূপ ছায়া মুখ ঢাকে
ঘোমটার তলে।

রাত জাগা তারাদের দলে
পড়ে কলকলি তোমার রূপের।
এতরূপ প্রকৃতির এত সম্পদ
তোমারে এঁকেছে শিল্পী সুনিপুণ হাতে
সৌভাগ্য জানি তার
যে তোমারে প্রিয়া বলে ডাকে।।

ওগো মৃগনেত্রা

ওগো মৃগনেত্রা ! ওগো সুনয়না নারী !
সুদীপ্তা তোমার নয়ন,
তবু আছে শান্তির ছায়া,
হয়তো এমনে মোর তাই জানে
নিরুদ্ধ নমনীয় মায়া।

নয়নে নয়ন তার নিবদ্ধ করে,
মনে হয় শুধু চেয়ে থাকি।
অনিমিষ তম দৃষ্টি দিয়ে অনন্তকাল,
স্তব্ধ হয়ে থাকে যদি থাক তবে এই পৃথিবী,
সে দৃষ্টি দেখে
স্তব্ধ হোক রাতের আঁধার।

আমি শুধু চেয়ে থাকি
সে নয়ন পানে
এমনি রাতের পরে রাত
আর কিছু নেই প্রয়োজন
যদি মোর শ্রান্তিহীন মন
শান্ত হয়ে আসে
আর তোমার নয়ন যদি এমনি নীরব
দৃষ্টি দিয়ে
আমার নয়ন পানে হাসে।
অনন্ত কাল শুধু স্নিগ্ধ আবেশে।

তার কাছে

বিবশা রাত্রি জেগে থাকে
তার কাছে
মিলনের স্বপ্ন ভাঙা সুর
হয়তো তখন কেউ আনমনা
দিগন্ত হতে
চেয়ে রয় দূর .... বহু দূর।

সবুজ ঘাসের কোলে

সবুজ ঘাসের কাছে
শুয়ে শুয়ে স্মৃতির চারণ
অতীতের কত কথা
কত দীর্ঘশ্বাস
একে একে এলোমেলো
জাল মনে, বহে অশ্রুজল
কখন ও বা ক্ষণিকের সুখ স্বাদ
হাসির মতন
খেলে যায় এ হৃদয়ে
যখন থাকি
সবুজ ঘাসের কাছে শুয়ে
মেরুন সূর্যছায়
গাছের তলায়
ভালো লাগে কথা কওয়া
একা একা কাঁদা
একা একা হাসি
সবুজ ঘাসের কোলে
অতীতের মাঝে
শুয়ে থাকি,
যখন হয়েছে মনে বাস্তব জগতের
নির্দয় ঘাতে
আমি কত একা, কত অসহায়,
তখন সে ম্লান কোন প্রাতে
পেয়েছি একটি স্নিগ্ধ কোল
পেয়েছি যে তার কাছে স্থান
যদিও তখন এই নিঠুর পৃথিবী
শুষ্ক করেছে মোর জীবনের ঘ্রাণ
একা একা রয়ে ছিত শুয়ে

তখন ও সবুজ ঘাসের কাছে
তারপর কখন যে চলে গেছে বেলা
কত দিন হয়েছে এমন
আঁধার নিবিড় হয়ে এসে
ভেঙেছে সে একা একা খেলা।।

ছেঁড়া পাল

পাল তোলা জাহাজের পানে চেয়ে
মনে হয়
আমি যেন ব্যর্থ বণিক।
পণ্য ভরা তরী নিয়ে দিয়েছিনু পাড়ি,
সুদূর দেশের সীমানায়
কখন সে ভরা তরী গেছে ডুবে
ডুবে গেছে বণিক হৃদয়
অনেক কষ্টের সেই অর্জিত ধন
লাভ আর লোকসান দিয়ে
উঠে ছিল গড়ে মোর বাণিজ্য স্বপন।
সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে, সেই তরী ডুবে গেছে,
সেই পাল ছিঁড়ে গেছে
উতাল হাওয়ায়,
পাল তোলা জাহাজের পানে চেয়ে
মনে হয়
তারপর আমার এই অচেতন দেহ নিয়ে
সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
করেছে কি খেলা
নীল কাজলের বুকে
অনেক রাত্রি শেষে
ক্লান্ত কোন বেলা
অবশেষে প্রাণটুকু নিয়ে
আর সব দিয়ে অঞ্জলি
ঠেকে গেছে কোন এক নির্জন দ্বীপে
চেতনা হয়নি জানি কোনোদিন আর
নিগূঢ় অর্থ খুঁজে ব্যর্থ চেতনায়
বিকৃত অচেতন, চেতনার বশে
নিঃসাড় দেহটা শুধু হামাগুড়ি দিয়ে
আশ্রয় খুঁজেছিল নির্জন দ্বীপে।।

কলকাতা

সৃষ্টির সেদিন থেকেই
কলকাতা তুমি ছিলে
জলে অথবা জঙ্গলে।
ধীরে ধীরে সব কিছু দুরে ঠেলে
আমরা তোমার কাছে এলাম।
পূর্বপুরুষের পদচিহ্নে
তোমার গভীর প্রেম পেলাম।
তোমাকে সাজালাম, নানান সাজ সরঞ্জামে।
নিত্য নতুন অলংকরণে।
আধুনিক আরো আধুনিক
রূপে-রসে-রঙে তিলে তিলে।
তোমাকে ঘিরে গর্বিত হলাম।
গর্বিত হল আমাদের সত্তা ও অহংকার।
তোমার যৌবন-ভার-অবনত দেহ
তিন তিনটে শতবর্ষ পার করে
আজও অনন্যা।
তবু মনে হয়,
একী তোমার যৌবন উত্তরণের পূর্বমুহূর্ত?
অথবা, সমস্ত সুন্দর মুহূর্তের উত্তরণের সময় এখন!
দিনের আলোয় ভালো করে চোখ চেয়ে দেখি,
তোমার সৌন্দর্য আক্রান্ত কয়েকটি বলিরেখায়,
অথবা, আমাদেরই স্বার্থপর নখের আঁচড়ে
ভয়াবহ কয়েকটি ক্ষতস্থানে ফুটে ওঠে
সরাসরি আমাদেরই মুখ।
কত রাত কত দিন বিশ্রামবিহীন,
ক্লান্ত করে রেখেছি তোমায়।
অগোচরে, তুমি হয়েছ উপেক্ষিতা।
জগৎসভার জমাট আসরে,
তুমি দিন দিন দীপ্তিহীন, ক্ষীণ হয়ে আছ।
তোমার অনাদর অনাদৃত করেছে, আমাদের,

তাই কি রাতারাতি ফেরাতে চেয়েছি দৃষ্টিকোণ;
তোমার আকাশে—বাতাসে—পাতালে,
সাবধানী প্লাস্টিক সার্জারির সংযোজন বিভাজন
সযত্নে বাইপাস দিয়ে রক্ত সঞ্চালন,
কথা দাও,
তুমি আবার সুস্থ হয়ে আসবে ফিরে,
আর একবার দেবে অধিকার—
তোমাকে নতুন করে সাজাবার।
আরও অনেক শতসহস্র বর্ষ ধরে,
কথা দাও,
কলকাতা তুমি থাকবে,
থাকবে কল্লোলিনী হয়ে।

ছড়া

রাজীব গান্ধি ওলট পালট
হাতছাড়া রাজধানী,
'আম্বানি'—'আম্বানি'
এখন জ্যোতিবাবুর বন্ধু হয়ে
ঠিক রাখি আমদানি

ফাইন দিয়ে পঁচাশ হাজার
সুব্রত আজ রজার মিলার।'
শিশির বলে—হে আই এফ এ
লক্ষ টাকা নাও,
পাওলো রোসি হবই আমি
খেলার সুযোগ দাও।

সবাই বলেন—কে বানাল স্ট্যাচু?
উত্তম নয়, মুখটা যেন ঘেঁচু।
শিল্পী বলেন, বানিয়েছিলাম ঠিকই,
মস্ত বড় অভিনেতা,
পোজ মেরেছেন মেকি